রবীন্দ্রনাথ এবং চীন

ড. সরোজমোহন মিত্র

রবীন্দ্রনাথ এবং চীন

অধ্যাপক সরোজমোহন মিত্র

এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট
বনফুল শতবার্ষিকী পুরস্কার
এবং
শরৎচন্দ্র-গবেষণা পুরস্কার প্রাপক

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৫৬এ, বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫০

রবীন্দ্রনাথ এবং চীন

ড: সরোজমোহন মিত্র

RABINDRANATH AND CHINA

by

Dr. Sarojmohan Mitra

ISBN No. : 81-86438-95-5

প্রকাশ : ৮ মে, ২০১০

প্রকাশক : কর্মসচিব
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
মরকতকুঞ্জ প্রাঙ্গণ, ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলকাতা ৭০০০৫০

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজী

মুদ্রক : শ্যামল সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস □ ২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা

পুরোবাক্

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ চীন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখন সান ইয়াত সেনের আমল। সঙ্গী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, এলম্‌হার্স্ট, কালিদাস নাগ এবং আমেরিকান মহিলা গ্রীন। সাংহাই, নানকিং হয়ে বেইজিং পৌঁছানোর পর ৮ই মে কবির চৌষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দনসভা আয়োজন হলে লিয়াং ছি চাও কবিকে 'জু চোন দান' এই চীনা নামে অভিহিত করেন। 'তিয়ান জু' পুরোনো চীনা ভাষায় ভারতের নাম। 'দান' শব্দের অর্থ সূর্যোদয়। এইভাবে ভারতের রবির উদয়কে সেদিনের চীন স্বাগত জানায়। চীনা পোষাক পরে প্রতিভাষণ দান ও রাত্রিতে 'চিত্রা' অভিনয় কবিকে নিশ্চয় আহ্লাদিত করেছিল। ১৯৪১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই আনন্দের স্মৃতি রোমন্থন সূত্রে লিখিত হয় 'ধরিনু চীনের নাম' কবিতাটি। কবি তাতে বললেন—

'একদা গিয়েছি চীনদেশে,/অচেনা যাহারা /ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে। .... অভাবিত পরিচয়ে / আনন্দের বাঁধ দিল খুলে। / ধরিনু চীনের নাম, পরিনু চীনের বেশবাস। /এ কথা বুঝিনু মনে, / যেখানেই বন্ধু পাই, সেখানেই নবজন্ম ঘটে।'

কবির পঞ্চাশ দিনব্যাপী চীনভ্রমণের অভিজ্ঞতার রেখা অবশ্যই উজ্জ্বল ছিল। যেমন, ১০ই মে 'সত্যের নিয়ম' শীর্ষক বক্তৃতার সময় ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে আধুনিক বস্তুসভ্যতার বিরোধী ও সামন্ততন্ত্রের সমর্থক ভেবে প্রতিবাদী প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল। অতীত-অভিমুখী, ভাববাদী অধ্যাত্মপরায়ণ বলেও তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। মর্মাহত কবি পরবর্তী বক্তৃতাগুলি বাতিল করলেও ১২ই মে যুবকযুবতিদের বৃহৎ সমাবেশ এবং ১৮ই মে বেইজিং-এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য আবেদন করে প্রমাণ করে, সমগ্র যুবসমাজ তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করতে ভুল করেনি। ১৯মে বেইজিং অপেরার শিল্পী মেই লান ফাং কবির সম্মানে 'লুপ্ত নদীর দেবী' অভিনয় করেন। ২৫শে মে হান কৌ-তে এক সভায় আবার যুবকদের প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়তে হয় কবিকে। ২৯শে মে সাংহাই-এর বিদায়সভায় এইসব বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেও রবীন্দ্রনাথ চীনে তাঁর প্রীতিময় স্মৃতির কথাই বলেন। চীন সম্পর্কে তাঁর সহমর্মিতায় কখনও টান পড়েনি। দেশে ফিরে চীনা প্রথায় চা-চক্র আয়োজন থেকে অল্পকালের মধ্যে শান্তিনিকেতনে চীনাভবন প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ।

সেদিনের অস্থির সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে চীনের মুক্তিকামী যুবসমাজের একাংশ রবীন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে না পারলেও পরবর্তী কাল প্রমাণ করেছে, রবীন্দ্রনাথ কালক্রমে চীনে কতদূর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কবির ৭০তম জন্মবর্ষে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে Golden Book of Tagore প্রকাশিত হয়, সেখানে চীনের পক্ষ থেকে কনসাল জেনারেল চাং মিং যা লেখেন তার অর্থ—

'সূর্য-চন্দ্রের গতির মতো আপনার জীবন চিরায়ত হোক। দীর্ঘ হোক দক্ষিণের পর্বতসমান। সাইপ্রেস-পাইন তুল্য কুসুমিত হোক।' কবির চীন ভ্রমণকালে ফে-ইয়েন মন্দিরে তাঁর সংবর্ধনা উপলক্ষে লিউ ইয়েন হোন-এর লেখা কবিতার কথাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। Golden Book-এ বিধৃত ইংরাজি অনুবাদে কবিতাটি থেকে বোঝা যায়, কী গভীর শ্রদ্ধায় কবিকে সেখানে বরণ করেছিলেন চীনের বুদ্ধপ্রিয় মানুষরা।

'He comes from the glorious India, queen of peacocks, which gave him the splendour of spirit. He comes from our holy place, the mother-land of Buddha and the Bodhi trees provided him with supreme intelligence.

He breathed the cloud-kissed air of the Himalayas and washed his body in the sacred river Ganges. His touch revived the soul of India. The Vedas, Upanisads and Brahmanas stood by him.

Our dream in a dark night ends thus on a sudden. Truth shines forth and man says, 'It is I'. Thus do scented flowers open up in the air, and freely do the swimming fishes run to and fro; a thousand rivers flow gently to the ocean and tides ebb and flow between the East and the West.

The east has its rebirth through our poet-seer. May he live for ever.'

সেদিনের এই ঋষিপ্রতিম কবির মধ্যে প্রাচ্যের পুনরুত্থান প্রত্যক্ষ করেছিলেন চীনের কবি লিউ ইয়েন হোন। পরবর্তীকালে চীনে রবীন্দ্রচর্চা বহুধা বিস্তৃত হয়েছে। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দং ইউ চেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চীনদেশ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'চীনা জনগণের মাঝে তিনি প্রিয়তম কবি ও মহান বন্ধু। চীনা পাঠকরা তাঁর সাহিত্য ভালবাসে। রবীন্দ্ররচনাবলী প্রায় সবই চীনা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। দুহাজার এক সালে প্রথম তাঁর সম্পূর্ণ লেখা নিয়ে রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে হেবেই শিক্ষা প্রকাশনালয় হতে। দুহাজার পাঁচ সালে তাঁর উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে ঘ্যাওয়েন প্রকাশনালয় হতে।... এই সমগ্র উপন্যাস ও গল্পের অনুবাদ হয়েছিল মূল বাংলা হতে....।.... দুহাজার সাত সালে বেইজিং বিদেশী ভাষা শিক্ষাদান ও গবেষণা প্রকাশনালয় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত করেছে। মোট ছয়টি খণ্ড।.... পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ সুবিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক জি শিয়েলিন এই বইগুলির নাম লিখেছেন।' এইসব অনুবাদ ও সম্পাদনায় অগ্রণী ভূমিকায় অংশগ্রহণ ছাড়াও অধ্যাপক চেন সচিত্র বিস্তারিত রবীন্দ্রজীবনী রচনা করে কবিকে চীনা জনগণের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। চীনা আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাও অধ্যাপক চেন লিখেছেন। যেমন, গুয়োমোরো, শিয় বিংসিং, ছু জি ছিং, জেং জেন দুও, ওয়াদ দেং জাও, ইয়ে শেং থাও, গু শাও সকলেই রবীন্দ্রপ্রভাবিত সাহিত্যিক। তাঁদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে রবিচ্ছায়া স্পষ্ট।

চীন-ভারত সাংস্কৃতিক-সারস্বত মৈত্রীর হাজার বছরের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে নবযুগের অগ্রপথিক। তাঁর চীনভ্রমণ নিয়ে অধ্যাপক ড. সরোজমোহন মিত্র 'রবীন্দ্রনাথ এবং চীন' নামে যে গবেষণামূলক তথ্যবহুল গ্রন্থটি লিখেছিলেন, তার প্রথম প্রকাশের সব কপি বহুদিন আগে নিঃশেষ হয়েছে। অথচ চীন নিয়ে নতুন শতাব্দীতে আমাদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মদিনে গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাগ্রহে অগ্রসর হয়েছে। আশা করি, উদ্যোগটি পাঠকসমাজের প্রশ্রয় ও সমর্থন লাভ করবে। ইতি

২৫শে বৈশাখ, ১৪১৭
৮ই মে, ২০১০
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিনীত
করুণাসিন্ধু দাস
উপাচার্য

লেখকের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ :

চলমান চীন (ভ্রমণ কাহিনী)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য (লেজ ৬ষ্ঠ সংস্করণ)
চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ)
রবীন্দ্র উপন্যাস — শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ,
শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা (৩য় সংস্করণ)
নতুন আলোতে শরৎচন্দ্র
বাঙলায় গল্প ও ছোটগল্প
সুকান্তের জীবন ও কাব্য
ভারতসংস্কারক রাজা রামমোহন
একাঙ্ক নাটক
Manik Bandyopadhyay
(সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী—ভারতের সব ভাষায় অনূদিত)
বনফুল সাহিত্য ও জীবন
বনফুলের ছোটগল্প (২য় সংস্করণ)
পথের দাবী : স্বতন্ত্রপাঠ
তারাশঙ্কর : ব্যক্তিমানস ও সৃষ্টি প্রভৃতি

ভূমিকা

ভারত এবং চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। নানা রাজনৈতিক টালমাটাল সত্ত্বেও দুই দেশের জনগণ এখনো অতি যত্নের সঙ্গে অতীতের সেই স্মৃতিকে লালন পালন করেন।

রবীন্দ্রনাথেরও চীনের প্রতি একটি কোমল দুর্বলতা ছিল। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা আধুনিক যুগে প্রথম প্রাচ্যদেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যতদূর জানা যায় রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ১৮৭৫ সালে চীনদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বহু যুগের আত্মীয়, প্রতিবেশী দেশের লাঞ্ছনায় স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রচিত্ত প্রথম ব্যথিত হয়েছিল। সেজন্য তাঁর জন্মের পূর্বে চীনের আফিম ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে চীনের মানুষদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর যে আফিম যুদ্ধ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে কেন্দ্র করেই প্রথম 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামে প্রবন্ধ লেখেন। তারপরেও চীনের নানা ঘটনায় আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে আমরা বারবার বিচলিত এবং উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখি।

চীনের জনগণ অতীতের স্মৃতি নিয়ে ভারতীয় জনগণের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী। তার উপর তাঁদের জীবনে নানা ভয়ঙ্কর দুর্যোগে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন সোচ্চার বিবেকী বন্ধু হিসেবে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি চীনের বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ খুবই শ্রদ্ধাপ্রবণ।

চীন ভ্রমণের সময় চীনের সর্বস্তরের মানুষের ভারতীয় জনগণ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের উষ্ণ অনুভব প্রকাশ করতে দেখেছি। ভারতবাসীদের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ নিকট আত্মীয়ের মতই।

জাপান এবং আমেরিকা যাওয়ার পথে একাধিকবার চীনের মাটি স্পর্শ করলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ একবারই ব্যাপকভাবে দেড় মাসের উপর চীন ভ্রমণ এবং চীনের মানুষ ও প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেষট্টি বৎসর এবং চীনের জনগণের কাছে তখন ঘোর সঙ্কটের কাল। তখন চীনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে

গিয়েছে। চীনের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বা যুদ্ধবাজ প্রশাসকদের সঙ্গে দেশকে প্রগতির পক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প বামপন্থী বিরাট যুব সমাজের ব্যাপক লড়াই চলছিল। এই বিবদমান গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে এবং বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর জীবনদর্শনকে সমভাবে গ্রহণ করার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। বাস্তবে তা সম্ভবও হয় নি।

ফলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর চীন ভ্রমণকালে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্র জীবনদর্শনের বিশালতা এবং বৈচিত্র্যকে সকলের পক্ষে সমানভাবে গ্রহণ করা আমাদের দেশেও সম্ভব হয়নি, হচ্ছে না এবং কখনো হবে না। চীনের মাটিতেও সেই বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। কোন মানুষ বা কোন চিন্তাই বিতর্কের ঊর্ধ্বে কিনা বলা কঠিন। নয় বলাই সমীচীন।

কিন্তু বিতর্কই বড় কথা নয়। একজন মানুষের অবস্থান বা কোন চিন্তার বাস্তবতার বিচার করতে গেলে তাকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করেই বিচার করা উচিত। তা ছাড়া তাকে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে, পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করে, কোন খণ্ডিত রূপের মধ্যে নয়। অংশত বা খণ্ডিত বিচার একদেশদর্শিতার অভিযোগে দুষ্ট হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে যে আলোচনার ঝড় উঠেছে তাতে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ বামপন্থীদের দ্বারা কঠোর সমালোচিত হয়েছিল বলে কার্যত ব্যর্থ এবং তিনি চীনের মানুষের কাছে এক বিতর্কিত অতিথি।

এই সমালোচনা ঐতিহাসিক ঘটনার অসত্যতা নয়। তবে বাস্তব দৃষ্টিতে বাষট্টি বৎসর পরে সেটিই একমাত্র সত্য নয়। চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চীনের সর্বস্তরের মানুষের মনোভাব জানতে এবং বুঝতে হলে সামগ্রিকভাবেই চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বহু লেখা এবং উক্তি, এবং চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের নানা ভাষণ এবং পরবর্তীকালে চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং মনোভাব বুঝতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চীনবাসীদের আগ্রহ এবং অনুভূতিরও সন্ধান রাখতে হবে।

১৯৮৬ সালে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা এবং আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। সেই বিতর্কের উৎস সন্ধানে রত হয়ে সামগ্রিকভাবে চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকেই জানতে হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি কোন বিতর্কের জবাব নয়। নতুন কোন বিতর্ক সৃষ্টির অবতারণা নয়। অনেক বন্ধু এ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। সেজন্য আমি সামগ্রিকভাবে চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যা কিছু বক্তব্য, মন্তব্য, ভাষণ এবং চিঠিপত্র আছে সবগুলোকেই একত্রে পাঠকের সামনে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছি। যাতে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্তত চীনের প্রশ্নে একটা অখণ্ডিত ধারণা সৃষ্টি করা যায়। এ কাজ করতে গিয়ে আমি

রবীন্দ্রনাথের চীন সম্পর্কিত সব প্রবন্ধ, কবিতা এমনকি চীনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণগুলো দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের চীনে আমন্ত্রকরা রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে যে সব ভাষণ এবং মন্তব্য করেছেন সেগুলো যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছি।

এ সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ 'Talks in China' যাতে চীনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলো সংকলিত হয়েছে তার প্রয়োজনীয় অংশ বাংলা করে দিয়েছি। এই গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের সেই ভাষণগুলোর একটা বাংলা তর্জমা প্রথম পাওয়া যাবে। তবে সামগ্রিক অনুবাদের কোন চেষ্টা করিনি।

রবীন্দ্রনাথের Talks in China নামে গ্রন্থটি দুবার মুদ্রিত হয়েছিল। একটিতে প্রকাশের কোন তারিখ নেই। আরেকটিতে প্রকাশের তারিখ আছে। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫। P.C.M. অর্থাৎ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের একটি নোট আছে। তাতে তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের চীনে প্রদত্ত ভাষণগুলো একত্রে প্রকাশ করা হোল। শিশির দাস এই সংস্করণকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে P.C.M. ১ম সংস্করণের কোন উল্লেখ না করেই ভাষণগুলো নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছেন এটা ভাবা যায় না। দুই সংস্করণে বিষয় বিন্যাসে পার্থক্য আছে। একটি সংস্করণে বিষয়গুলোকে ভূমিকা, আত্মজীবনীমূলক, অতিথিদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে, বিদায় বেলায়, সভ্যতা ও প্রগতি, সত্যম্ এভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই সংস্করণেই প্রকাশকের নোট হিসেবে P.C.M. এর বক্তব্য আছে। আরেকটি সংস্করণে ষোলটি বক্তৃতা যেমন 'সাংহাইতে প্রথম ভাষণ', 'হ্যাং চৌতে ছাত্রদের কাছে', 'নানচিঙে ছাত্রদের কাছে' এভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শিশির দাস পরে উল্লেখিত সংস্করণকে বলেছেন প্রথম সংস্করণ এবং প্রকাশকের নোট সহ সংস্করণকে বলেছেন দ্বিতীয় সংস্করণ। আমার মনে হচ্ছে বিপরীত। P.C.M.-এর সংকলন হবে প্রথম এবং সেভাবেই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। দুই সংস্করণের মধ্যে গ্রহণ বর্জনও আছে। পরিশিষ্টে দুইটি সংস্করণের বিষয় তালিকা দেওয়া হোল।

এই গ্রন্থ রচনায় বহু গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৪ খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী এবং নেপাল মজুমদারের ৬ খণ্ডে 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থগুলি থেকে বহু সাহায্য গ্রহণ করেছি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিতর্কিত অতিথি' গ্রন্থ থেকেও অনেক সাহায্য নিয়েছি। নেপাল মজুমদারের গ্রন্থটির নাম অনেক বড় তা সংক্ষেপিত করে 'ভারতে জাতীয়তা' বলে উল্লেখ করেছি। স্টীফান হে-র বইটি এ ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সমরকার বিস্তৃত তথ্য ঐ গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থকে সংক্ষেপে 'হে' বা 'Hay' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরি, দিল্লীর সাহিত্য অকাদেমি লাইব্রেরি, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগার থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছি। এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। যাদের

সাহায্য এবং পরামর্শ পেয়েছি তাদের তালিকা দীর্ঘ বলে ব্যক্তিগতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি বলে দুঃখিত।

সংযোজন

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অনেক বছর আগে (১৯৮৭)। বর্তমানে গ্রন্থটির প্রকাশ হচ্ছে বিশ্বকবি ও চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের দেড়শত জন্মবার্ষিকী পালনের আয়োজনে।

এর মধ্যে ভারত-চীনের সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা সার্থক হয়েছে। এই বছরেই ভারত সরকার এবং চীনের গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার নিজ নিজ দেশে চীন-উৎসব এবং ভারত উৎসব পালন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উপলক্ষে বর্তমান গ্রন্থটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

আমি বাঙলায় গল্প ও ছোটগল্প নিয়ে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছিলাম। তখন উপাচার্য ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বর্তমান উপাচার্য বন্ধুবর ডঃ করুণাসিন্ধু দাসের আগ্রহে এবং অনুমোদনে এই গ্রন্থ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব ডঃ তপতী মুখোপাধ্যায়ের সহায়তাও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক মৈত্রী আন্দোলনের প্রধান উদ্যোগী মনীষী ছিলেন। আমিও দীর্ঘকাল এই মৈত্রী আন্দোলনকে সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আশা করি এই গ্রন্থ প্রকাশ সেই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করবে। সেজন্য আমি সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই প্রচেষ্টা তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইতি

আই. এ. ২২, সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০ ০৯৭
৮ই মে, ২০১০

সরোজমোহন মিত্র

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

চীন ভ্রমণের পূর্বে

জীবন-সায়াহ্নে আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি পৃথিবীর কবি।" সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী রবীন্দ্রনাথ যেন এই পরিচয়কেই সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরসাধক। রামমোহন রায়-ই আমাদের দেশের প্রথম সার্থক আন্তর্জাতিক মানুষ, বিশ্বের ভাবনাকে যিনি আত্মস্থ করে নিতে পেরেছেন। ভারত-পথিক রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার রামমোহনের এই মহান পরিচয়কেই বড়ো করে তুলেছেন।

রামমোহনের পরে রবীন্দ্রনাথকেই যথার্থভাবে আন্তর্জাতিক প্রাণপুরুষ বলা যায়। তিনি আমাদের দেশীয় চিত্তের নবজাগরণের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠলেও আন্তর্জাতিক উদারতার মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে পেরেছিলেন। সেজন্য দেশাতীত জগতের নানা সমস্যার প্রতি স্বাভাবিকভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হত।

চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা দুর্বলতা ছিল। তাঁর জীবনের প্রায় প্রথম পর্বের লেখা থেকে আমৃত্যু নানা লেখায় বারে বারে চীন প্রসঙ্গ এসেছে। ভারততীর্থ কবিতায় মাতৃ অভিষেকের জন্য সকলকে আহ্বান করার সময়ও চীনের প্রসঙ্গ এসেছে। "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—/ শক হূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

পৃথিবীর কবি হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের খবর রাখতেন। তিনি জানতেন দরিদ্র চীনবাসীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে কী নির্যাতন চলছে। জোর করে আফিম খাইয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা একটা জাতিকে পঙ্গু করে রেখেছে। মানবিকতার গভীর বোধে উদ্বুদ্ধ কবির কাছে হয়ত তা ছিল অসীম যন্ত্রণার কারণ। মানুষের দেবতাকে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে ব্যঙ্গ করে তাকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই ক্ষমা করতে পারেন নি।

তখন ভারতবর্ষও ছিল পরাধীন। বোধ হয় তার চেয়েও বেশি উৎপীড়িত হচ্ছিল চীনারা। বারে বারে তারা সেই অত্যাচার এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যত তারা বিদ্রোহ করেছে তত তাদের রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চীনের ইতিহাস সেই রক্তাক্ত ইতিহাস। এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল।

আফিম যুদ্ধ এবং বক্সার বিদ্রোহের সমর্থনে

চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখার নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারতী পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। তার আগে রবীন্দ্রনাথ বিলেত ঘুরে এসেছেন। তিনি একজন জার্মান পাদরি থিয়োডোর খ্রিস্টলীব লিখিত "The Indo-British Opium Trade" নামে একটি পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ পড়েন। এই পুস্তক পাঠের ফলে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার ফলে তিনি ভারতী পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

তার আগে চীনে দু'বার আফিম যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তৎকালে ব্রিটেনই ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ। ভারতবর্ষে তার ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৃষি কুটিরশিল্পপ্রধান চীন দেশের প্রতি তাদের লোভের হাত বাড়িয়ে দেয়। অবক্ষয়ী সামন্ততান্ত্রিক চীনের দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারীদের ঘুষ খাইয়ে তারা ক্রমশ বেশি বেশি করে জাহাজ ভর্তি আফিম চীনে পাঠাতে লাগল। ১৮২০ সালে চীনে যেখানে চার হাজার বাক্স আফিম পাঠিয়েছিল সেখানে ১৮৪০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চল্লিশ হাজার বাক্স। ফলে আফিম খোরের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। চীনের সামন্ত শাসকগোষ্ঠী আরো দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে চীনের তৎকালীন সম্রাট নিজের ক্ষমতা রাখতে পারবেন কিনা তা নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আফিম আমদানির প্রধান বন্দর ক্যান্টন বা গুয়াংচুতে আফিমের ব্যবসা বন্ধ করে দেবার হুকুম পাঠালেন। ব্যবসায়ীদের রক্ষা করার নাম করে ব্রিটেন ১৮৪০ সালে আফিম যুদ্ধ শুরু করে দিল। ফলে চীন সরকার আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৮৫৭ সালে দ্বিতীয়বার আফিম যুদ্ধ হল এবং চীনের চিং সরকার আফিম ব্যবসায়কে আইনী বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন।

অস্ত্রের জোরে ব্রিটিশ সরকার চীনে এই সর্বনাশা নীতি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারলেও বিশ্বের বিবেকবান মানুষের কাছে তারা ধিকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সেই ধিক্কারই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি ইংরাজের কূট অভিসন্ধির তীব্র সমালোচনা করে লিখেছিলেন :

"একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বিষপান করানো হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল,—'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরেজ বণিক কহিল, "সে কি হয়?" চীনের হাত দুইটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল—'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরেজরা চীনে এই অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন।"

ইংরেজরা ভারতবর্ষেও আফিমের চাষ প্রবর্তন করে, আফিমের ব্যবসা করে দেশের সর্বনাশ করছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

এরপর ঔপনিবেশিকবাদী ব্রিটিশ সরকার তার উনিশ শত উপনিবেশ নিয়েও সন্তুষ্ট

থাকতে না পেরে তারা তাদের উপনিবেশবাদকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট—দুটি বুয়র সাধারণতন্ত্রকে গ্রাস করার জন্য ১৮৯৯-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি আগ্রাসন যুদ্ধ চালায়। এই বুয়র যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সর্বপ্রথম পৃথিবীর প্রত্যেক প্রগতিশীল মহল থেকে ঘৃণা ও ধিক্কার কুড়িয়েছিল।

প্রায় একই সময়ে আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়া, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালী এবং অস্ট্রিয়া একটি গোষ্ঠী গঠন করে চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের নেতৃত্বে দুই হাজার সৈন্য নিয়ে তারা দাগুকাউ এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তিয়ানজিন ও পেইচিং এর দিকে অগ্রসর হয়। পরে তারা তিনটি শহরই দখল করে নেয়। সেখানে তারা ব্যাপক লুঠতরাজ, ধর্ষণ ও অত্যাচার চালায়। রবীন্দ্রনাথ পরে চীনে গিয়ে সেইসব ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বহু বছর পরে রাশিয়ার চিঠিতে তার উল্লেখ করে লিখেছিলেন, "য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্ত প্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহুযুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কি রকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনদিন তৈরী হতেই পারবে না।"

রবীন্দ্রচিত্তে এই সব ঘটনায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি এই সময়ে 'নৈবেদ্য' নামে এক শত কবিতা রচনায় রত। তিনি দেশের ও জগতের সকল আন্দোলন ও আলোচনার সংবাদ রাখতেন। কোথাও অন্যায় এবং অবিচার দেখলে অত্যন্ত পীড়া বোধ করতেন। নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৬৪ নং কবিতায় আছে তারই এক ক্ষোভের প্রকাশ—

'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ির-গীতি।'

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজভেদ' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আষাঢ়) প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন, "সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত

করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমন্দির হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনের পশুবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"

য়ুরোপের এই অন্তর্বিদ্বেষ কী তা রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমরা যখন য়ুরোপের শিক্ষা প্রথম পাইলাম তখন 'মানুষে মানুষে অভেদ' এই ধুয়াটিই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম।" কিন্তু পরে দেখতে পেলেন এই শিক্ষা তাদের আসল কথা নয়। তারা বললেন, "পূর্ব-পশ্চিমে এমন ভেদ যে সে তাহা লঙ্ঘন করিবার জো নাই।" সেজন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই গালাগালি-গোলাগুলির আদান প্রদান শুরু হল। চীনের উপর পাশ্চাত্য শক্তিগুলির আক্রমণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মিশনারিদের প্রতি চীনবাসীদের আক্রমণ হইতে চীনে বর্তমান বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। য়ুরোপ একথা সহজেই মনে করিতে পারে যে, ধর্মপ্রচার বা শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য চীনের বর্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। মিশনারি তো চীন রাজত্ব জয় করিতে যায় নাই।

এইখানে পূর্ব-পশ্চিমে ভেদ আছে এবং সেই ভেদ য়ুরোপ শ্রদ্ধার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করে না, কারণ তাহার গায়ের জোর আছে।

চীনের রাজত্ব চীনের রাজার। যদি কেহ রাজা আক্রমণ করে তবে রাজায় রাজায় লড়াই বাধে, তাহাতে প্রজাদের যে ক্ষতি হয় তাহা সাংঘাতিক নহে। কিন্তু য়ুরোপের রাজত্ব রাজার নহে, তাহা সমস্ত রাজ্যের। পলিটিক্সই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর; এই কলেবরটিকে আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না..."

"পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিকস সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে। ... শিথিল রাজশক্তি বিপুল চীনের সর্বত্র আপনাকে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না।"

"কিন্তু বিপুল চীনদেশ রাজশাসনে সংযত হইয়া নাই, ধর্মশাসনেই সে নিয়মিত। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনী স্বামী-স্ত্রী প্রতিবেশী-পল্লীবাসী রাজাপ্রজা যাজক যজমানকে লইয়া এই ধর্ম। বাহিরে যতই বিপ্লব হউক, রাজাসনে যে কেহই অধিরোহণ করুক, এই ধর্ম বিপুল চীনদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া অখণ্ড নিয়মে এই প্রকাণ্ড জনসমাজকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। তখন কে তাহাকে ঠেকাইবে। তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে। তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি জাগ্রত হইয়া উঠে।"

এখানে একটু চীনের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে

'শতদিনের সংস্কার আন্দোলন' ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে চীনের বিভাজন যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল তখন চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৫) বিধ্বস্ত মেহনতী মানুষ বিশেষ করে কৃষকরা অস্ত্র হাতে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। রাশিয়া, জাপান, জার্মানি এবং ব্রিটেনের শোষণ এবং অত্যাচারে বহু কৃষক এবং কুটিরশিল্পীরা কর্মহীন এবং গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। তার উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আগ্রাসনের যন্ত্র হিসেবে ধর্মকেও ব্যবহার করেছিল। ঊনিশ শতকের শেষদিকে চীনে পাদ্রীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৩০০-র বেশি এবং চীনে ধর্মান্তরিত মানুষের সংখ্যা হয়েছিল আট লক্ষের বেশি। একমাত্র শানতুং প্রদেশেই এক হাজারের উপর গির্জা ছিল এবং আশি হাজারের বেশি মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এই সব পাদ্রীরা স্থানীয় সমাজবিরোধীদের সাহায্যে জনসাধারণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করত। এমন কি তারা প্রায়ই হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হতো মানুষ হত্যাও করত। কোন বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসন পাদ্রীদেরই পক্ষ অবলম্বন করত। এই অবস্থায় গ্রামের কৃষক, কারিগর, নৌকার মাঝি প্রভৃতি মানুষদের মধ্যে পাদ্রী-বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই বিক্ষোভ ইহ্‌তুয়ান (Yihetuan) বা মিলিশা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৮৯৯ সালে শানতুং প্রদেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রথম প্রথম শানতুং এবং হেবেই প্রদেশে কৃষকদের এই সংগ্রাম চিং বিরোধী গোপন সংগঠন হিসেবে কাজ করেছিল। তখন চীনে ছিল চিং সরকার। এই সরকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে দেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তারা একের পর এক চুক্তি করে দেশের কিছু অংশ বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। বিদেশীদের আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেজন্য চিং সরকার কৃষকদের কাছে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সেজন্য তাদের আন্দোলন প্রথমে এই সরকারের বিরুদ্ধেই সংগঠিত হয়েছিল। তারা প্রতিক্রিয়াশীল চিং সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসনকে তীব্র করে তুলেছিল সেজন্য মিলিশাদের সংগ্রাম পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের গোপন সংগঠন প্রকাশ্য হয়ে পড়ল। ন্যায় এবং ঐক্যের জন্য কৃষকদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে পরিণত হল। তারা গির্জা পুড়িয়ে দিল, পাদ্রীদের তাড়া করল এবং দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসক এবং তাদের স্থানীয় ভাড়াটে গুণ্ডাদের শাস্তি দিল। যে চিং বাহিনী তাদের দমন করতে গেল তাদের প্রতিরোধবাহিনী বারবার পরাস্ত করত। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তারা তিয়েনজিন এবং পেইচিং-এর দিকে এগিয়ে গেল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তারা দেশের রাজধানী পেইচিং দখল করে নিল। ইতিমধ্যে কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হল। কৃষকরা যেহেতু নির্মমভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের আঘাত করেছিল সেজন্য সাম্রাজ্যবাদীরা একযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

কৃষকদের ন্যায় এবং ঐক্যের জন্য আন্দোলন যখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তখন চিং

সরকার কৃষকদের এই পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করল। সেজন্য তারা এই আন্দোলনকে বৈধ ঘোষণা করল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন রক্তাক্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে ভীষণ অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ড শুরু করল এবং ক্রমে তারা পেইচিং দখল করে নিল তখন চিং সরকার শিয়ানে পালিয়ে গিয়ে ঘোষণা করল ইহতুয়ান-এর লোকেরা দাঙ্গাবাজ। তারা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে বিদেশী আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘোষণা করল এবং দাঙ্গাবাজদের ধ্বংস করার জন্য অনুরোধ জানাল।

এইভাবে কৃষকদের সেই সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে কৃষকদের এই পাশ্চাত্যবিরোধী আন্দোলনেরই উল্লেখ করেছেন। এই আন্দোলন প্রথম সংগঠিত হয়েছিল দু'জন বক্সিং ওস্তাদের নেতৃত্বে। সেজন্য ইংরেজিতে একে বক্সার বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিল বক্সিং এবং সামরিক অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিরা। এই আন্দোলনের প্রকৃত তথ্য এ দেশে না পাওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের বুদ্ধিভঙ্গিতেই চীনবাসীদের সমর্থনে লিখেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ লগ্নে এবং বিশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই অত্যাচার উৎপীড়ন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় কবির 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায়।

৬৪ নং কবিতায় তিনি লিখেছেন,

> একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
> দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
> স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
> তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
> আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
> জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
> বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
> ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
> বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

তাঁর অধ্যাত্মবোধ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জন্য প্রার্থনা করেছেন ঃ

> ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
> হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
> তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
> সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
> তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান

> তাহার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
> অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। (৭০ নং)

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' রচনা শেষ হয়। এই সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনে ব্যস্ত, বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী, প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ আধুনিক জীবনে প্রয়োগপ্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত।

চীনেম্যানের চিঠি ও ইউরোপীয়দের মিথ্যাচার

এই সময়ে বিলাত থেকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে Letter of John Chinaman নামে একখানি বই পাঠিয়ে দেন। বইখানির গ্রন্থকার ইংরেজ লেখক Lowes Dickinson। গ্রন্থে লেখকের নাম ছিল না। লেখক নিজেকে একজন চীনাম্যান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল ইংলন্ডে বসবাস করেছেন বলে ইংরাজদের আচার অনুষ্ঠান রীতির সঙ্গে তুলনা করে চীনের মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। এতে আছে ইংরাজকে সম্বোধন করে কয়েকখানি চিঠি। এগুলোর মধ্যে তিনি ইংরাজদের সভ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাষ্ট্রতন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করে ইংরাজদের চোখধাঁধানো নানা ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে যে কত ফাঁকি আছে তাকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তুলনায় নিজেদের সভ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে যে একটা মহত্ত্ব এবং স্থিরতা আছে তাকে বিস্তারিত করেছেন।

আত্মপরিচয়ে লেখক লিখেছেন, "চীনেম্যান সর্বত্রই সর্বদাই চীনেম্যানই থাকে, এবং কোনো কোনো বিশেষ দিক হইতে বিলাতী সভ্যতাকে আমি যতই পছন্দ করি না কেন, এখনো ইহার মধ্যে এমন কিছু দেখি নাই যাহাতে পূর্বদেশের মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ হইতে পারে।"

এই গ্রন্থের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ 'চীনেম্যানের চিঠি' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৩০৯ আষাঢ়) লিখেছেন ঃ

"এই ছোটো বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও বল পাইয়াছি। ইহা হইতে দেখিয়াছি, এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য আছে। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণের মিল দেখিয়া আমাদের প্রাণে যেন বল বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, এশিয়া যে চিরকাল য়ুরোপের আদালতেই আসামী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিচারকেই বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য করিবে, স্বীকার করিবে যে আমাদের সমাজে বারো আনা অংশকেই একেবারে ভিতশুদ্ধ নির্মূল করিয়া বিলাতি এঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান অনুসারে বিলাতী ইঁটকাঠ দিয়া গড়াই আমাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়, এই কথাটি ঠিক

নহে—আমাদের বিদ্যালয়ে য়ুরোপকে খাড়া করিয়া তাহারও মাবাত্মক অনেকগুলি গলদ আলোচনা করিয়া দেখিবার আছে, এই বইখানি হইতে সেই ধারণা আমাদের মনে একটু বিশেষ জোর পায়। প্রথমত ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য লাভ করিয়াছে ইহাতেও আমাদের বল; দ্বিতীয়ত এশিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।"

ইংরেজ আগমনের পরে ইংরেজির মাধ্যমে আমরা যা জেনেছি তাতে পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ প্রবল হয়েছিল। পাশ্চাত্যের তুলনায় নিজেদের বড় ছোটো বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে আমাদের সংঘাত যত তীব্র হয়েছে তত স্বদেশকে জানবার এবং পাওয়ার একটা ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। এটা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই সত্য না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "য়ুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এশিয়াকেই সজাগ করিয়াছে।" পরের অনুকরণ নয়, নিজেকে জানো—সেখানেই মুক্তির উপায়। রবীন্দ্রনাথ যখন এই বোধ চীনে এবং জাপানেও প্রসারিত হতে দেখেন তখন ভারতবাসী হিসেবে তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তিনি বলেন তখন আমাদের দীনতার অগৌরব দূর হয়, আমাদের ধনভাণ্ডার কোনখানে তাহা বুঝিতে পারি।"

চীনেম্যানের চিঠি কেন রবীন্দ্রনাথের কাছে এক বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে তিনি এই প্রবন্ধেই স্পষ্ট করে লিখেছেন, "য়ুরোপের বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়াছে, তাই আজ সভ্য এশিয়া আপনার পুরাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত। প্রাচ্য সভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেখানে তাহার বল সেইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্মে, তাহার বল সমাজে। তাহার ধর্ম ও তাহার সমাজ যদি আপনাকে ঠেকাইতে না পারে, তবে সে মরিল। য়ুরোপের প্রাণ বাণিজ্যে, পলিটিক্সে, আমাদের প্রাণ অন্যত্র। সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এশিয়া উত্তরোত্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। এইখানে আমরা একাকী নহি, সমস্ত এশিয়ার সহিত আমাদের যোগ রহিয়াছে। চীনেম্যানের চিঠিগুলো তাহারই প্রমাণ করিতেছে।"

চীনেম্যান এই পত্রগুলির মধ্যে চীনদেশের স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব নানা পত্রে নানা বিষয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তি এবং বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্যগৌরবকেই যেন নতুন করে উজ্জীবিত করল। তিনি প্রাচ্যদেশীয় পরম্পরের প্রতি একটা ঐক্য উপলব্ধি করে বিশেষ আনন্দ বোধ করলেন। চীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মধ্যে ভারতবর্ষেরও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করলেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ধর্ম এবং ন্যায়বিচারের নামে কপটতা এবং শঠতা আছে; রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে তার বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন। য়ুরোপীয়রা যে ধর্মবোধের বড়াই করে তা যে কতটা কপট এবং ঘৃণ্য ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' নামক এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। একজন ইংরেজ অধ্যাপক এদেশে জুরির বিচার সম্বন্ধে আলোচনাকালে মন্তব্য করেছিলেন যে এদেশের অধিকাংশ লোক

প্রাণের মাহাত্ম্য বোঝে না সেজন্য তাদের হাতে জুরি-বিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায়।

এই উক্তি যে কতটা প্রবঞ্চনাকর এবং ভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে তা এই প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে চীনের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

"য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। গ্ল্যাডস্টোনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কঙ্গো প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।"

য়ুরোপীয়দের মিথ্যা ভাষণের উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে চীনের উল্লেখ এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ চীনের উপর য়ুরোপীয়দের অত্যাচারকে কী ঘৃণার চোখে দেখতেন। অপরদিকে এখানে চীন ও চীনবাসীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

নৈবেদ্য রচনার পূর্বে সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতায় (১৩০০ বঙ্গাব্দ) কবি যখন বসুন্ধরার সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিলেন তখন মনে মনে কবি সকলের ঘরে জন্মলাভ করার ইচ্ছা পোষণ করতে গিয়ে "প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান কর্ম অনুরত" তাদের কথাও স্মরণ করেছেন।

চীনে আমেরিকার পণ্যদ্রব্য বয়কট এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ

১৮৯৪ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে দুর্বল চীনের পরাজয় হয় এবং জাপান জয়ী হয়। এই পরাজয়ের ধাক্কায় চীনে নব জাগরণের সূচনা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় "চীনে ছাত্র আন্দোলন" শীর্ষক এক রচনায় লিখেছেন, "১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের সূত্রপাত হয়। কালের মহালীলায় তাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখা নিভে গিয়েছিল। তাই আবার যুগ-ভেরীর মহানিনাদে তাকে চীনের জনে জনে জ্বালবার জন্য তার মহাপ্রাণ সাড়া দিয়ে উঠল। জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুন্নত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্দল পাকাতে শুরু করল। জাপান তখন নববলে বলীয়ান। নূতন শক্তির শিহরণ তার প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করতে লাগল। জড়তার মোহ কাটিয়ে কেবল সে টাটকা জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে—এমন সময় চীনের সঞ্চিত শক্তি পরীক্ষা করে নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগলো। চীনের অবস্থা তখন মুমূর্ষু। থাকবার মধ্যে ছিল তার মান্ধাতার আমলের কতকগুলি সংস্কার, আর 'অচল ফ্যাশন'। এতে চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা খেল। জাপান ইচ্ছামত কামান দাগিয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং কয়টি বন্দর ও

পোতাশ্রয় দখল করে নিল। চীনের সীমারেখা আস্তে আস্তে কমতে লাগল। অবশেষে সে ফর্মোজা দ্বীপটি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

'তার পরেই এলো আসল কথা—চীনের যুব আন্দোলন—যাকে দিয়ে চীন আপনার নিজস্ব সত্তাকে ফিরিয়ে পেয়েছে। রুশ জাপান যুদ্ধের পর চীনের তরুণ তাপসগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে লাগল। তারা তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো। দেখলো তাদের জননী জন্মভূমি তাদের দিকে করুণ ও ম্লান আঁখি দিয়ে চেয়ে রয়েছেন। দেশের পরাজয় ও দুর্নামের প্রতিকারকল্পে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে বসল, এবং যে জাপান তাদের এমন আঘাত দিয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র নিতে প্রস্তুত হলো —এক নয়, দুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান-সাধনার জন্য জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে একেবারে ছুটেই চললো। তাদের উদ্দেশ্য জাপানের শিক্ষা, জাপানের কর্মধারা চীনের প্রতি শহরে, প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা।..

"দেশের বন্ধন মোচন করাই তাদের 'জীবন-বিসর্জনের' কারণ হওয়ায় তারা জ্ঞান-সাধনার পরবর্তী জীবনে দেশের কাজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত করলো। দেশে ফিরে তারা চীনকে এই বাণীকে শুনালো—জাপান যাহা পারবে, পেরেছে—চীনও তাহাই পারবে এবং পারাই তার চাই। এ-নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে দেশের কাজে তারা নামলো—নামলোই মত ক'রে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে চীনের নব জাগরণের একটা চিত্র পাওয়া যাবে বলে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। চীনের ইতিহাস থেকেও জানা যায় ১৮৯৫ সালে চীন জাপান যুদ্ধের অবসানের পর একদিকে চীনকে কব্জা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় অন্যদিকে জাতীয় মুক্তির জন্য চীনের নিজস্ব কলকারখানা গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এর ফলে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে বস্ত্র শিল্প, সিল্ক শিল্প, ময়দার কল, জাহাজ শিল্প, কয়লা খনি প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের নাম "শতদিনের সংস্কার আন্দোলন"। সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে সেই আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর কৃষকদের ইহেতুয়ান আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে চিং সরকার ১৯০১ সালে ১১টি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে অপমানকর চুক্তি করে। এর আগেই আমেরিকা সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনকে মুক্ত দ্বার নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। তারপর থেকে ব্যাপকভাবে চীনের উপর আমেরিকার আগ্রাসন চলতে থাকে।

ফলে চীনে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ সানইয়াৎ সেন। ১৯০৫ সালে ছাত্ররা ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এবং তারা আমেরিকার পণ্যদ্রব্য বয়কট করে। আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় তার ব্যাপক প্রচার হয়।

১৯০৫ সালে ৭ই আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলাদেশেও ঐতিহাসিক বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলনের উপরে চীনের বয়কট আন্দোলনের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"...boycott of British goods was publicly started–by whom I cannot say–by several, I think, at once and at the same time. It first found expression at public meeting in the district of Pabna, and it was repeated at public meetings held in other mofussil towns; and the successful boycott of American goods by the Chinese was proclaimed throughout Asia and reproduced by the Indian newspapers." (S. N. Banerjee–Nation in Making.)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধ বা পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন। এই সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"আমাদের নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাবমোচন ও কর্তব্য সাধন আমরা নিজেরা করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে।" এই সমাজের অন্যতম শর্ত ছিল—"স্বদেশীয় দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।" এই শর্ত বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলনেরই সমগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার ও চীনে প্রতিক্রিয়া

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সারা বিশ্বে বিরাট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষের মানুষ এমন কি বাঙালিরা পর্যন্ত হঠাৎ যেন একটা বিশেষ মর্যাদায় আসীন বলে মনে করেছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র এশিয়াবাসী রবীন্দ্রনাথের এই সম্মানে নিজেদের সম্মানিত বোধ করলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ নাম।

চীনবাসীদের মধ্যেও এর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় অনেকেই উল্লসিত বোধ করলেন। সমগ্র এশিয়ায় তখন রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব। তিনিই যে এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে একদম হয় নি তা নয়। গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। কবিতা হিসাবেও এগুলি খুব উৎকৃষ্ট একথাও কিছু সমালোচক মনে করেন নি। তবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার সমালোচকের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

চীনদেশে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার অনুবাদ হোল। রবীন্দ্রনাথের Crescent

Moon প্রকাশিত হওয়ার পরে সেখানে চীনা কবিতায় ক্রিসেন্ট মুন স্কুল গড়ে উঠল। জাপানে এবং পাশ্চাত্যে যে সব চীনা ছাত্র পড়তেন তারা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীতে অনূদিত কবিতা এবং রবীন্দ্রখ্যাতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা 'গীতাঞ্জলি' এবং 'ক্রিসেন্ট মুন' পড়েছেন। ১৯১৯ সালের পরবর্তীকালের বামপন্থী আন্দোলনের প্রধান নায়ক এবং চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক চেন তু শিউ এবং আরও কয়েকজন মিলে 'নতুন যৌবন' বা 'শিন ছিন নিয়েন' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তাতে চেন গীতাঞ্জলির চারটি কবিতা—আমারে তুমি অশেষ করেছ, তুমি যখন গান গাহিতে বল, মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসে এবং চিত্ত যেথা ভয় শূন্য 'বন্দনা গান' নামে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ভারতীয় যুবকদের পথপ্রদর্শক এবং অধ্যাত্মবাদের প্রবক্তা।

জাপান যাওয়ার পথে

১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকার একটি বক্তৃতা কোম্পানী রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মনও কোথাও যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। সুতরাং তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এবার তিনি জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে আমেরিকা যাবার সুযোগ পেলেন। এই সুযোগে তিনি জাপানও দেখে যেতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে ৩রা মে ১৯১৬ কোলকাতা থেকে জাপানী জাহাজ 'তোসামারু'তে জাপান হয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন। সেদিন ছিল ২০শে বৈশাখ, ১৩২৩। ৯ই জ্যৈষ্ঠ তিনি হংকং এ পৌঁছলেন। সেখানে জাহাজ দুদিন ছিল। সেই দু'দিন রবীন্দ্রনাথ জাহাজেই রয়ে গেলেন। জাহাজে বসেই তাঁর চোখে পড়ল নানা ধরনের চীনা শ্রমিক এবং মাঝিদের। তাদের সম্পর্কে তিনি 'জাপান যাত্রী' গ্রন্থে লিখেছেন :

"প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখিনি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখাতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর, তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে

তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। একথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না, কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁত সংগতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীন মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে স্নান করছিল; মানুষের শরীরের যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন করে আর কোনোদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণ পরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। যে সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলআনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না, সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্ছে—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে; কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোনো শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যেসব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়।...

"আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করছে এবং কাজ করছে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়, বণিকদানব যদি মানুষের ঘর করণা স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তুলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব?"

চীনের সাধারণ মানুষকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম দেখলেন। এর আগে কাগজপত্রে তিনি তাদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। উৎপীড়িত মানবজাতি হিসেবে তাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবরই একটা গভীর সহানুভূতি ছিল। এই মানুষদের কাজের মূর্তি দেখে তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ

ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এই কাজের জোরেই একদিন চীন মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারা যখন আধুনিক কালের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবে তখন তাদের অপ্রতিহত শক্তিকে বাধা দেবার মত শক্তি থাকবে না।

চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে যন্ত্রবিদ্যা, পারমাণবিক বিদ্যা অধিগত করে চীন এখন পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শক্তি। এই শক্তিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা এখন কারুর নেই।

এই লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তুলনায় ভারতবর্ষের জন্যও খেদ প্রকাশ করেছেন। একদিন ছিল যখন চীন ভারতবর্ষ থেকেও অনেক বিষয়ে এমনকি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে ছিল। বর্তমান ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে এবং উন্নয়নমূলক প্রতিযোগিতায় চীন বিশ্বের কাছে উন্নত মস্তকে দৃপ্ত ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ভারতবর্ষে এখনো "চারিদিকে কেবলই জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচার-ধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব।"

রবীন্দ্রনাথ জাপানে প্রায় তিন মাস ছিলেন। এই সময় তিনি জাপানকে দেখবার ও গভীরভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জাপান সম্পর্কে কবির দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। একদিকে জাপানের চিত্রাঙ্কন, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি জাপানের সাংস্কৃতিক জীবনের সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল অন্যদিকে আধুনিক জাপানের সাম্রাজ্যলালসা ও উগ্র জাতীয়তা তাঁকে তীব্র পীড়া দিয়েছিল। তাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন নি। তিনি তাঁর 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থেই লিখেছেন :

"জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেইজন্যে এই প্রকাশ মনুষ্যকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই জন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল।"

"বলা বাহুল্য পারে, জাপান ইউরোপের নিকট হইতে বিজ্ঞান ও অস্ত্রের দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথমে তাহা প্রয়োগ করে চীনের উপর। ১৮৯৪-৯৫ সালে জাপান চীনের ওপর আক্রমণ শুরু করিল। এই যুদ্ধে চীন জাপানের নিকট পরাজিত হয়। ফলে কোরিয়ার উপর হইতে চীনের আধিপত্যের অবসান হয় এবং ঐ সালে চীন জাপানকে ফরমোজা দ্বীপটিও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিবার পর জাপানের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতালিপ্সা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। অতঃপর মহাযুদ্ধ আসিয়া পড়িল। জাপান এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া) পক্ষ অবলম্বন করিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জাপান চীন হইতে জার্মানদের বিতাড়িত করিয়া কিয়াচো ও শিয়াটাঙ প্রদেশ দখল করিয়া লইল।

জাপানের উদ্দেশ্য হইল, এই যুদ্ধের সুযোগে চীনে নিজের আধিপত্য বিস্তার করা এবং যুদ্ধের পরে এশিয়ার জার্মানীর সাম্রাজ্যটি দখল করা। জার্মানী চীন হইতে বিতাড়িত হইলে জাপানকে তাহার সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য চীন অনুরোধ জানাইল। জাপান যুদ্ধ-জনিত পরিস্থিতির অজুহাতে চীনের দাবি অগ্রাহ্য করিল। এই সময়ে চীনের কর্তৃত্ব ছিল ক্ষমতালোভী প্রেসিডেন্ট ইয়ান সি-কাই-এর হাতে। জাপানের অনুগ্রহের উপরেই ইয়ান সি-কাই-এর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল ছিল। জাপান সুযোগ বুঝিয়া চীনের নিকট 'একুশ দফা'র এক দাবি পেশ করিল (১৯১৫)। এই দাবিগুলি মানিয়া লইলে চীন আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া জাপানের আজ্ঞাবহ একটি ভৃত্যদেশে পরিণত হইবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানের বেয়নেটের মুখে চীন দাবিগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। ফলে সে জাপানের অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত হয়।

"রবীন্দ্রনাথ জাপানে পৌঁছিয়াই সর্বত্রই জাপানের এই উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সা ও যুদ্ধোন্মাদনার আয়োজন দেখিলেন। এই উদ্দেশ্যে জাপান সমগ্র দেশটিকে জাতীয়তাবাদের মদ্য পান করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহা গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।"

'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখলেন :

"জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। ...জাপানি সভ্যতার সৌধ এক মহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারের সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্ছে কৃতকর্মতা; সেখানকার মন্দিরে সবচেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জার্মানির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে। নীট্‌শের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কি না, এবং ধর্মটা কী।"

স্বাভাবিকভাবে জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব রবীন্দ্রনাথের নির্ভীক কণ্ঠে এই কঠিন তিরস্কারকে হজম করতে পারে নি। জাপানে বসেই জাপানের বিরুদ্ধে এ রকম কঠোর সমালোচনায় জাপান সরকার অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিল। সারা দেশব্যাপী সেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "জাপানে আসিবার সময় যাঁহাকে সমগ্র জাতি অভ্যর্থনা করিয়াছিল—তাঁহাকে বিদায় দিবার ক্ষণে জাহাজঘাটে কোনো জনতার ভিড় হয় নাই—একমাত্র হারাসান তাঁহার অতিথিকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত হন। জাপান সরকারের অন্তর টিপুনিতে সমস্ত দেশ কবির প্রতি বিমুখ হইয়াছিল।..."

বাতায়নিকের পত্রে চীন প্রসঙ্গ

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'বিশ্বভারতী' কল্পনার উদয় হয়। যুদ্ধের হিংস্র তাণ্ডবলীলায় রবীন্দ্রনাথের হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। এই দানবীয় হিংস্রতা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেই চিন্তায় কবি ভাবিত। অপরদিকে দেশের ভিতরকার রাজনৈতিকেও বিশেষ করে গান্ধীজীর সঙ্গে অন্যান্য নেতাদের মতবিরোধে কবি চিন্তিত। ভারতীয় জাতীয় সাধনা এবং বিশ্বমানবতার আন্তর্জাতিক সমন্বয় সাধনা এই চিন্তা থেকেই বিশ্বভারতীর কল্পনা। যুদ্ধের শেষে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত ও কলিকাতা ঘুরে এসে শান্তিনিকেতন থেকে 'সবুজপত্রের' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে পর পর যে পাঁচটি পত্র লিখেন সেটিই 'বাতায়নিকের পত্র' (সবুজপত্র—আষাঢ়, ১৩২৬) নামে সুপরিচিত। এই পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারত এবং বিশ্বের নানা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাই-শহরে জয়ীপুঞ্জের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিল। সেই আলোচনার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে রাষ্ট্রগুলি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বরং রাজ্য-ভাগাভাগি নিয়ে নানা রকম ফন্দি চলছিল। রবীন্দ্রনাথ তাতে ব্যথিত বোধ করে লিখেছেন :

"যুদ্ধে এ পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথা কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানা ঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ বস্তু বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

লাভের বখরা নিয়ে নানা বৈঠককে রবীন্দ্রনাথ ভাল চোখে দেখেননি। তখন পাশ্চাত্যে পীত সংকট নিয়ে ভয়ংকর আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। এই আতঙ্কের মধ্যে চীন প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সকলেই জানেন, কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীত সংকট নাম দিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-একদিন প্রবল বাধা পায়।...যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট—এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী দেশের বিখ্যাত লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের রচনার

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আনাতোল ফ্রাঁস পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের 'Yellow Peril' -এর তীব্র বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির স্বরূপকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছেন। আনাতোল ফ্রাঁস লিখেছেন :—

"It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Qurberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i.e., the right of trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. ...The army of the great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver survice of the Elysee."

চীন জাপানকে নিয়ে পাশ্চাত্যে পীত আতঙ্ক হলেও চীনদেশে কিন্তু কোন লোভের তাড়া ছিল না। বরং ইতিহাস বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। রবীন্দ্রনাথ আবার আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা উদ্ধৃত করে চীনদেশের সঙ্গে য়ুরোপের যে লুঠেরার সম্পর্ক সেই ইতিহাস দেখিয়েছেন। আনাতোল ফ্রাঁস উনিশ শতকের শেষ দিকের সেই ঘটনাগুলিই উল্লেখ করেছেন :

"In our own times, the Christians acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility. ...In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide amoung themselves."

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পীকিনে যে তাণ্ডব লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা পাওয়া এবং লজ্জা দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অনুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে লিখেছেন, "দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়—নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য

আদর্শ। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য। অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ঙ্কর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এত রকমের সংগত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্ছি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্যমান, এবং যেটা অসংগত সেটা তাঁর কৌতুকস্মৃতিতে মুহূর্তে ধরা পড়ে; পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনো দিন ঘটে নি। চীনেদের কথাই চলছে—

"They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in forest, brought down with his rifle the mother of a gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. "I was powerless," says Mr. Du Chaillu, "to correct its evil nature.""

রবীন্দ্রনাথের লেখায় ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির বস্তুতন্ত্রতা এবং লোভ-রিপুর তাড়নার প্রতি কঠোর বিদ্রূপ ও সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বাতায়নিকের পত্র লিখছেন প্রায় সেই সময়েই পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তাতে ভীষণ ক্ষুব্ধ। এই সময়ে ইউরোপে রমাঁ রোলাঁ, অঁরি বারবুস প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বে "চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী (Declaration of Independence of Thought)" নামে একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্কে রমাঁ রলাঁ তাঁর "I will not Rest" গ্রন্থে লিখেছেন, "যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যে-শান্তি আসিল তাহা শাশ্বত চিরন্তন যুদ্ধেরই বেদী রচনা করিল মাত্র; কারণ যুদ্ধ যাহারা জিতিল পরাজিতের প্রতি হিংস্র আক্রোশে বিদীর্ণ, বিক্ষত, বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর বুকে যে কৃত্রিম শান্তির গুরুভার তাহারা চাপাইয়া দিল তাহাতে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।"

এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সংখ্যায় অল্প হলেও একদল বুদ্ধিজীবীদের দেখা গেল তারা সত্যের নবীকে সর্বপ্রকার আঘাত থেকে রক্ষা করতে সঙ্কল্পবদ্ধ। রমাঁ রলাঁ এই বুদ্ধিজীবী সৈনিক বাহিনীকে সম্মিলিত হবার আহ্বান জানিয়ে উপরোক্ত চিন্তার স্বাধীনতাবাণী রচনা করেছিলেন। এই ঘোষণাপত্রে ক্রোচে, আইনস্টাইন, বারবুস, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ পৃথিবীর বহু মনীষী স্বাক্ষর করেছিলেন। রমাঁ রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের

জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে চীন, জাপান ভারতবর্ষ থেকে আরও কিছু নাম সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘোষণাপত্র এদেশের দুই একটি পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ঐ ঘোষণাপত্রে একমাত্র আনন্দকুমার স্বামী স্বাক্ষর করেছিলেন। আর কেউ এই আন্তর্জাতিক বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা অনুভব করলেন না।

চীন যাত্রার পূর্বে

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে ব্যস্ত তখনই ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে পেইচিং এর লেকচার এসোসিয়েশন রবীন্দ্রনাথকে চীনে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

১৯১১ সালে সানইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনা বিপ্লবী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চীনের সাহিত্যিক মহলেও নানা সাড়া পড়ে যায়। নানা সাহিত্য সমিতি গড়ে ওঠে। তারা নানা সশস্ত্র বিদ্রোহের সমর্থন করে পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। ১৯১৯ সালে ৪ঠা মে-র ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের পরে যথার্থভাবে চীনের আধুনিক সাহিত্যের সূচনা হয়। অবশ্য এর আরম্ভ বলা চলে ১৯১৫ সাল থেকে, তখন চেন তু শিউ এবং লি তাচাও 'নতুন যৌবন' নামক পত্রিকায় সামন্তবিরোধী সংস্কৃতি সৃষ্টির আহ্বান জানান। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত সামন্ত অভিজাত সাহিত্যের পরিবর্তে নতুন বাস্তব এবং জনপ্রিয় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির দাবী করেন। ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া লেখক এবং পণ্ডিত হুশি ভাষা এবং সাহিত্যে সংস্কারের সুপারিশ করেন। ৪ঠা মে-র আন্দোলন এই প্রগতি চিন্তাকেই ব্যাপকতা দান করে।

পেইচিং এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এক নতুন চিন্তার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এতে তিনজন ছিলেন প্রধান। উপাচার্য Tsai Yuanpei, ডীন চেন তু শিউ এবং হু শি এরা তিনজনই ছিলেন চীনের বাইরে থেকে উচ্চ শিক্ষিত, ক্লাসিক্যাল কনফুসিয়াস প্রথার শিক্ষা-বিরোধী। এদের সঙ্গে আরেকজন মানুষ ছিলেন লিয়াঙ চি-চাও। তিনি ১৯১১-এর বিপ্লবের পরে ন্যায় এবং অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে চীনের যোগদানের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। লিয়াং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত ১৯২০ সালে পেইচিং লেকচার এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন যাতে বিদেশী পণ্ডিতরা চীনে এসে চীনের পণ্ডিতদের সঙ্গে জ্ঞানের আদান প্রদান করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই লেকচার এসোসিয়েশন রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমেরিকা থেকে জন ডিউই (John Dewey), ইংলণ্ড থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল এবং জার্মানী থেকে Hans Driesch কে চীনে আমন্ত্রণ করে আনেন যেমন রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন সিলভাঁ লেভি, মরিজ উইনটারনিৎস এবং লেসনিকে।

১৯১৭ সালে যখন চীনে সাহিত্যে বিপ্লব শুরু হয় তখন পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি চরমে। চীনের আধুনিক কবিরা ঐতিহ্যবাহী ক্লাসিক্যাল প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইংরেজি জানা জগতের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। সেখানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই জনপ্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই চীনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল। ১৯২৪ সালের পূর্বেই চীনে রবীন্দ্রনাথের ক্রিসেন্ট মুন, স্ট্রে বার্ডস, দি গার্ডেনার এবং গীতাঞ্জলির সম্পূর্ণ বা অংশত অনুবাদ হয়েছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মুক্ত ছন্দের অনুসরণে 'মুক্ত কবিতা' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য বিপ্লবের উদ্গাতা হু শি সাহিত্যকে 'সমৃদ্ধ বিষয়' 'তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ', 'গভীর চিন্তা' এবং 'জটিল আবেগে'র প্রকাশ বলে অভিহিত করেছিলেন। তার মধ্যে শেষ দুটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যের দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা চীনাদের কল্পনায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

১৯২৩ সালেও রবীন্দ্রনাথ চীনে খুব জনপ্রিয়। তাঁর গুণমুগ্ধ মহিলা কবি Ping Hsin রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ বৎসরই তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ The Stars (Fun Hsing) এবং Spring Waters (Chun Shui) প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে চীনের বিখ্যাত লেখক কুয়ো মোরো রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতা লিখেছিলেন। ১৯২১ সালে পেইচিং-এ মাও তুন প্রমুখ লেখকদের উদ্যোগে সাহিত্য গবেষণা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। তাদের প্রধান প্রকাশনা ছিল 'মাসিক ছোটগল্প'। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ এমন উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল যে এই মাসিক ছোটগল্প সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এবং আলোচনা নিয়ে দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল।

চীনে তখন ব্যাপক আলোড়ন চলছিল। ১৯১২ সালের নববর্ষের দিনে চিং রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে যে চীনের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাও এক মাস পরেই অবসিত হয়। শেষ চিং সম্রাট পালিয়ে যান এবং ইউয়ান সি কাই অস্থায়ী সভাপতি হন। সান ইয়াৎ সেন বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। তখন থেকে চীনে উত্তরের যুদ্ধবাজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের জনগণ অবশ্য এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করছিলেন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সান ইয়াৎ সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা সোভিয়েত বিপ্লবের দ্বারা গভীর প্রভাবিত হন। যুদ্ধের ফলে চীনেও ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার হয়। সেখানে বিরাট শ্রমিক শ্রেণী (২০ লক্ষের উপর) গড়ে উঠে। ১৯২১ সালে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। চেন তু শিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে শাংহাইতে এসে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। সান ইয়াৎ সেন সোভিয়েতের পরামর্শে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করে ১৯২৪ সালে কুয়াংচৌতে হুয়াংপু মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

চীনের সাহিত্য আন্দোলনেও এর গভীর প্রভাব পড়ে। ১৯১৮ সালেই লু শুন তাঁর

প্রথম গল্প 'একটি পাগল মানুষের ডায়েরি' প্রকাশ করেন। সাহিত্য গবেষণা সমিতি জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন শুরু করেছিল। লু শুন, কুয়ো মোরো, মাও তুন, বা জিন, লাও সে, কাও ইউ প্রমুখ অনেক বিপ্লবী লেখক তখন সমকালীন বিদ্রোহ ও বিপ্লবে তাঁদের লেখার দ্বারা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন।

দি লিটারারি রিসার্চ সোসাইটি ছাড়াও তখন ক্রিয়েশন সোসাইটি, ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটি, দি টাটলার সোসাইটি প্রভৃতি অনেক সাহিত্য সমিতি ছিল।

রবীন্দ্রনাথের চীনে যাওয়ার আগেই লু শুনের 'কল টু আর্মস' নামে চৌদ্দটি গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কুয়ো মোরোর কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়াও যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ লেখক ছিলেন তাঁরা হলেন ইয়ে শেং তাও, ইউ, দাফু, শু শিচিং, পিং শিন।

রবীন্দ্রনাথ চীনে যাওয়ার আগেই তাঁর সমালোচনা শুরু হয়েছিল। একজন আধুনিক কবি ওয়েন ই-তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সাংহাই-এর এক প্রভাবশালী পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ওয়েন ই তু একজন বিশিষ্ট কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন 'টেগোরের লেখায় কোন বাস্তবতা নেই।' তাঁর মতে সাহিত্য হবে জীবনের প্রতিফলন এমন কি মেটাফিজিক্যাল কবিতাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। তিনি আরও তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন, "Artistically Tagore is far from perfect. ... He may be a poet, but he is not an artist. His poetry is formless...Not only it is formless, but one might even say it has no limits. It is because of this that it is characterised by monotony. If we read all his poems, from begining to end, they seem like formless, characterless amoebas." তিনি তাঁর আলোচনার শেষে বলেছেন, চীনের কবিতায় টেগোর রীতির অনেক আধিক্য ঘটেছে; এখন সময় এসেছে এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার। আমাদের টেগোর সম্পর্কে একটা বস্তুগত এবং অনাগ্রহী মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। তিনি লিখেছেন, "If we appraise Tagore's art from this basis, we will certainly develop a new understanding of this poet's work. Now-a-days our new poetry is quite vapid, effete, philosophical and formless enough. If we have more of Tagore's influence it will be even worse, and we will be beyond cure. I hope our artists will take note of this." (Wen : 1923 : 279)

অথচ এই ওয়েন ই তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুকরণে যে ক্রিসেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর সঙ্গে সুচি মো-ও যুক্ত ছিলেন। তিনি কবি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ও অনুবাদক ছিলেন।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথ চীনের এই সব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেজন্য চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধা দেখা দেয়। সেই দ্বিধার কথা তিনি রোমা রঁলাকেও জানিয়েছিলেন— 'in the meantime I go to China, in what

capacity, I do not know, Is it as a poet or as a bearer of good advice and sound common sense?" (Hay P. 144)

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টকে ১৯২৩ সালে নিউইয়র্কে যাওয়ার পথে চীন ঘুরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। চীনের অবস্থা উপলব্ধি করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এলমহার্স্টও সে অনুযায়ী চীন হয়ে আমেরিকা যান। তিনি চীনে সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। সান রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন, বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

মনে হয়, এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথকে চীন সম্পর্কে অনুকূল রিপোর্টই দিয়েছিলেন। যাই হোক, সব দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের মনে চীনদেশ ভ্রমণের কল্পনা বহুকালের।" চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ে আগ্রহের কথা আমরা আলোচনা করেছি। জানা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ, জাপানের বিখ্যাত শিল্পী ওকাকুরা, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কেরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। "১৯০৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদ ও সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করিবার পরিকল্পনা করেন। ঐ সময় জগদীশচন্দ্র কবিকে এক পত্র লেখেন,

"তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে হইবে।...

"যবদ্বীপ ত সতীশ যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কপি সংগ্রহ অতি সত্বর করিতে হইবে।

"একজনকে চীন ভাষায় বিশেষজ্ঞ করিতে এখনও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি Preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে।

"আমার plan এই।

"এখন একজন সংস্কৃত ও ইংরাজীবিদ্ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Society তে বুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে Tibet এর mss ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Hory কে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী পুঁথির কপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। আর খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্যে হোরির সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীন দেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।" (ভারতে জাতীয়তা ইত্যাদি)

বিশ্বভারতীর প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এসে শান্তিনিকেতনে চীনা ও তিব্বতি ভাষা চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করে যান। তা ছাড়া চীন দেশের অনুবাদের মাধ্যমে

বৌদ্ধ শাস্ত্রের অমূল্য রত্নসমূহ গচ্ছিত আছে জেনেও চীনদেশে পরিভ্রমণের ইচ্ছা কবির মনে প্রবল হয়।

চীনদেশেও কবির ভ্রমণ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। পেইচিং লেকচার এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ওয়াং তুঙ চাও (Wang T'ung-Chao) লিখেছিলেন, "Now we await the light of 'love' which Tagore is bringing to us from his Indian forest, carrying it in person to our sinking, dispirited midst. We must not greet this world famous poet-philosopher with routine courtsey, rather we must truly understand his philosophy of life which is limitless vitality and creative love." শাংহাই-এর একজন শিক্ষক Wang Hsi-Ho "An outline of Tagore's theory" নামক প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "a pioneer of the Eastern spirit."

সু-চি-মো সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ এ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "Never before has a single writer, Eastern or Western, excited so much genuine interst in the heart of our Young Nation, and few, not even our ancient sages, perhaps, have gifted us with such a vivid and immense inspiration as you have done. Your presence will lend comfort and joy to this age of gloom and doubt and agitation, a presence which will further strengthen our faith and hope in the longer things of life, which you have helped to instill into our minds." (Hay. P 194)

অর্থাৎ চীনের কবি ও পণ্ডিতমহলের একাংশে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দিককেই বড় করে দেখেছিলেন এবং তাঁকে সেই যুগের একজন মহৎ চিন্তানায়ক রূপে অভিহিত করে তাঁর দর্শন ও ভাষণ শোনার প্রবল আগ্রহ জানিয়েছিলেন।

অতএব চীন দেশে বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণ পেয়ে চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের যে প্রবল ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল তার একটি অপূর্ব সুযোগ এল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ে চীনে যেতে চান নি, চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর একজন প্রতিনিধিরূপে যেতে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সানন্দে সেই রকমই ব্যবস্থা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের পরিকল্পনার কথা শুনে বিখ্যাত ধনপতি যুগলকিশোর বিড়লা ভারতের পক্ষ থেকে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি কবির সহযাত্রী হলে তিনি তাঁদের খরচার বহনের জন্য কবিকে এককালীন এগার হাজার টাকা দান করেন। স্থির হোল, বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এবং নন্দলাল বসু কবির সঙ্গে যাবেন। এবং এলমহার্স্ট কবির চীন সফরে সেক্রেটারির কাজ করবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ কালিদাস নাগকে তাদের প্রতিনিধি করে কবির সঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেন। এ ছাড়া এ দলের সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিকেতনের মিস গ্রীন। রবীন্দ্রনাথ চীন থেকে

আমেরিকা যাবেন। মিস গ্রীনও এই পথে দেশে ফিরবেন।

চীন যাত্রা উপলক্ষে বিদায়ের পূর্বে শান্তিনিকেতনে উপাসনাকালে (৫ চৈত্র ১৩৩০) রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দেশের গণ্ডির মধ্যে আশ্রমের পরিচয় যতই মনোরম হোক, তার যথার্থ যে বড়ো চেহারা, তার ভিতরকার বড়ো শক্তির পরিচয় নেই। যদি শান্তিনিকেতনের দূত হয়ে ভারতবর্ষের বাহিরে এখনকার বাণী বহন করে যেতে পারি, যদি কোনও বিশ্ববাণীকে অন্তরে বহন করে আনতে পারি, তবে আশ্রমের বড়ো পরিচয়টি পাব।" (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)

কলিকাতায় ও বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের উদ্যোগে এক বিদায় সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় পাঁচশর উপর নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবির চীন ভ্রমণ

কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের নিয়ে 'ইথিওপিয়া' জাহাজে ২১ মার্চ ১৯২৪ রওনা হলেন। ২৪ মার্চ জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছল। জাহাজঘাটে কবিকে স্বাগত জানাবার জন্য ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, বর্মী, চীনা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে মার্চ কেমেনডাইন চীনা স্কুলে কবিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ লিন্ ও চিয়াংগ (Dr. Lin Wo Chiang) ছিলেন তার উদ্যোক্তা। ১৯২৫ সালে ডঃ চিয়াংগ শান্তিনিকেতনে চীনভাষার অধ্যাপকরূপে আসেন এবং কয়েক বৎসর থাকেন। রেঙ্গুনেই চীনাদের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় হোল।

৭ই এপ্রিল সিঙ্গাপুরে জাহাজ পরিবর্তন করে জাপানী জাহাজ 'আৎসুতা মারু' তে কবিকে হংকং এর দিকে যাত্রা করতে হোল। সিঙ্গাপুরে কবিকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হোল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন একজন চীনা ব্যবসায়ী।

১০ই এপ্রিল, ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ হংকং পৌঁছলেন। হংকং ইংরেজ অধিকৃত একটি দ্বীপ হলেও এক হিসাবে এটাই চীনের প্রথম বন্দর। কবির চীন ভ্রমণের সংবাদে সমগ্র চীনেই একটা সাড়া পড়ে যায়। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন দূতের হাতে চিঠি পাঠিয়ে কবিকে ক্যান্টনে (গুয়াংচৌ) আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন লিখেছিলেন ঃ—

Canton 7th April, 1924

Dear Mr. Tagore,

I should greatly wish to have the privilege of personally welcoming you on your arrival in China. It is an ancient way of ours to show honour to the Scholar; But in you we shall greet not only a writer who has added lustre to Indian letters but a rare worker in those fields of endeavour wherein lie the seeds of man's future welfare and spiritual triumps.

May I then have the pleasure of inviting you to Canton?

Yours sincerely,
(Sd.) Sun Yat Sen

রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে যান, তখন চীনের শাসনব্যবস্থা ছিল দুটি ভাবে বিভক্ত। উত্তর চীনের সরকার এবং দক্ষিণ চীনের সরকার। দক্ষিণ চীনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে

রিপাবলিকান সরকার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ভাবধারার বাহক ছিল। এই সরকারের রাজধানী ছিল ক্যান্টন।

আর উত্তর-চীনে ছিল যুদ্ধবাজদের সরকার। সেখানে ছোট-বড় বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা তুচুনেরা ক্ষমতা দখল করে ছিল। তাদের রাজধানী ছিল নিজ নিজ প্রদেশে। কবি যখন চীনে পৌঁছলেন তখন চীনের জাতীয় সরকারের প্রধান ছিলেন মার্শাল Tsao Kun। তিনি ১৯১৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত চিহ্‌লি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। অক্টোবর ১৯২৩ মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট হন এবং নভেম্বর ১৯২৪ পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বিখ্যাত সমর নায়ক Wu Pei Fu. এই তুচুনরা ছিল জাপান ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের ক্রীড়নক। তারা উত্তর চীনে অরাজকতা ও প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভার্সাই সন্ধির নামে চীনে জাপান সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বজায় রইল। এই চুক্তির বিরুদ্ধে চীনে বিরাট ছাত্র বিক্ষোভের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ঐ বিক্ষোভ ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। ফলে জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট ও স্থানে স্থানে জাপানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতে লাগল। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটনে বৃহৎ চতুঃশক্তি এক চুক্তি আলোচনায় জাপানকে চীনের শান্টুং প্রদেশ ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু কার্যত জাপান সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে।

এদিকে রাশিয়ায় সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। জারের আমলে রাশিয়া চীনে অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল। নতুন বিপ্লবী সরকার সেই সব সুযোগ নাকচ করে দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে উত্তর চীনের যুদ্ধবাজ সরকারে এবং দক্ষিণ চীনের সান ইয়াৎ সেন সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হোল। ১৯২৪ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শুধু তাই নয়, ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সরকার আর্থিক সংকট এবং বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ায় রাশিয়া সেই সরকারকে সাহায্য করেছিল। এই উপলক্ষে রাশিয়ার বিখ্যাত বলশেভিক নেতা 'বরোদিন' চীনে এসেছিলেন। এই ভাবে রাশিয়া থেকে কেবল বস্তুগত সাহায্যই আসে নি, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারের আদর্শে চীনের যুবচিত্তে বিরাট সাড়া পড়েছিল। চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা প্রসার লাভ করল। ফলে চীনের মধ্যে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী চিন্তাধারা ব্যাপ্তি লাভ করল। ক্যান্টনের সরকার এই বিচারে ছিল বামপন্থী। তারা প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে অভ্যর্থনা জানাল আর অপর দক্ষিণপন্থীদল প্রাচীন ও প্রতিক্রিয়াকে আঁকড়ে রইল।

রবীন্দ্রনাথ এই পরিপ্রেক্ষিতে চীন যাওয়ার মুখে সান ইয়াৎ সেনের আমন্ত্রণ পেয়ে তার একান্ত সচিবকে বলেছিলেন যে, তিনি উত্তর-চীন ভ্রমণ শেষ করে ফিরবার পথে ক্যান্টনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষাৎকার হয় নি। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে (৩য় খণ্ড) লিখেছেন, "কবির সঙ্গীরা ও হংকঙের হিতাকাঙ্ক্ষীরা বোধ হয় কবিকে বুঝাইলেন

যে তিনি পিকিঙবাসীদের নিমন্ত্রণে উত্তর-চীনে যাইতেছেন; ক্যান্টনে যে রিপাবলিক চীন সরকার গঠিত হইয়াছে, তাহা পেকিঙ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নহে, উহা চীনের বিদ্রোহী গভর্নমেন্ট। মোটামুটি ভাবে কবি বুঝিলেন বা তাঁহাকে বুঝানো হইল যে উত্তর চীন ও দক্ষিণ-চীনে সদ্ভাব নাই—ক্যান্টনের রিপাবলিক সরকার পেকিঙ সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত, এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়াই উচিত।"

১৯২৫ এর গোড়াতেই সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে যান তখন সেখানে অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করছিল। তবে এ শান্তি বেশিদিন টেকেনি। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পরে সেখানে আবার গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল।

চীনের নানা শহরে

চীনের সঙ্গে হংকং এর রাজনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও এখান থেকে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রা শুরু হয়। ব্যবসা এবং চাকুরির জন্য বহু ভারতীয় সেখানে বাস করলেও হংকং চীনা অধ্যুষিত শহর। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলর কবি ও তাঁর সঙ্গীদের আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পূর্ব ব্যবস্থামত সুরাতি মুসলমান বণিক নেমাজির বাড়িতে উঠেছিলেন। আময় (Amoy) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর Dr. Lim Bong Keng স্বয়ং এসে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় যাবার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ জানান।

"সময়াভাবে হংকঙে বেশিক্ষণ থাকা হইল না। তখনকার দৈনিক China Mail (10 April, 1924) লিখিল, রবীন্দ্রনাথ উত্তর-চীনে যাইতেছেন, ইহাতে আমাদের ঔৎসুক্য ও ঈর্ষা হইতেছে ; উত্তর-চীন ভাগ্যবান। কিন্তু কবির বাণী প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র দক্ষিণ-চীন। হংকংবাসীরা আশা করে যে, ফিরতিপথে তাহারা কবিকে তাহাদের মধ্যে পাইবে। দুঃখের বিষয় সে-সুযোগ কোনো পক্ষের আর হয় নাই।" (র.জী.)

হংকং থেকে রবীন্দ্রনাথ ১২ এপ্রিল চীনের প্রধান বন্দর সাংহাই পৌঁছলেন। পেইচিং যাবার আগে সেখানে কবিকে কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল।

সাংহাই বন্দরে স্বাগত জানাবার জন্য পেইচিং থেকে কবি ও আধুনিক চীনের লেখক সুই-চি-মো এবং National Institute of self Government-এর Dean S. Y. Ch'a এসেছিলেন। সুই চি-মো ছিলেন চিকেয়াং এর অধিবাসী। তিনি বিলাতে সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। তিনি পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিং হুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধ এবং অনুবাদ আছে। তিনি দো-ভাষী ও সঙ্গী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণে ছিলেন। ১৯৩১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবি ও সঙ্গীরা সাংহাই-এর বার্লিংটন হোটেলে উঠেন।

সাংহাই-এ কবির প্রথম সম্বর্ধনা হয় শিখ গুরুদ্বারে (১৩ই)। মীরাবাই-এর ভজন সঙ্গীত নিয়ে ভারতীয় নারীরা সভা আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় বাংলায় বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন তা হিন্দিতে ভাবানুবাদ করেন।

সেদিন সকালে মিঃ হারদুন (S. A. Hardoon) নামে এক ধনী ইহুদী বণিক কবি ও সঙ্গীদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। হারদুন এক চীনা মহিলাকে বিবাহ করে চীনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে নেন। তিনি ১৯২২ সালে বিশ্বভারতীতে সমগ্র চীনা ত্রিপিটক দান করেন। পরে তাঁর চেষ্টায় চক্বিশ রাজবংশের বিরাট ইতিহাস গ্রন্থও বিশ্বভারতী পায়। তখনো চীনা ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সিলভাঁ লেভি চীনা ভাষায় সবে মাত্র অধ্যাপনা শুরু করেছেন।

সেদিন বিকেলে মিঃ কার্সন চ্যাঙের উদ্যানবাটিকায় "সাংহাই-এর শ খানেক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কবি চা-পানে মিলিত হলেন। মিঃ চ্যাং একজন খ্যাতনামা দার্শনিক, তিনি জার্মানীর দার্শনিক রুডলফ অয়কেনের সহকর্মী ছিলেন। এই স্বাগত সভায় মিঃ সুই-চি-মো যুবচীনের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আজকের দিন আমার কাছে আনন্দের কারণ, এশিয়ার এক দূর প্রান্তের লোক হয়েও তোমাদের দেশে আমন্ত্রিত হয়েছি। তোমাদের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। আমার কাছে তোমরা কি প্রত্যাশা কর।

হাঁ, জাগরণের সময় কবির সাহায্য প্রয়োজন। কারণ তিনি না জেনেও ঘোষণা করতে পারেন, বসন্ত আসতে আরম্ভ করেছে, শীত তার সঙ্কীর্ণ সীমা নিয়ে চলে গিয়েছে। এতদিন মানুষ শীতের প্রকোপে বন্ধ ঘরে আবদ্ধ ছিল। এখন সেই দুয়ার খুলে গিয়েছে। বসন্ত এসেছে। আমার বিশ্বাস ছিল তোমাদের আমন্ত্রণ সেই বসন্ত সমীরণের আমন্ত্রণ।

কবির জীবনের উদ্দেশ্য হল বাতাসের অস্পষ্ট স্বরকে আকর্ষণ করা। হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ণ ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা, পতনশীল পৃথিবীতে না ফোটা ফুল ফুটিয়ে তোলা। বর্তমানে অনেকে তা বিশ্বাস করেন না, তারা জানেন না ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস থেকেই তার জন্ম হয়। যারা সন্দেহপ্রবণ তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু চিরন্তন শিশু যে স্বপ্ন দেখে, যে মানুষের সরল বিশ্বাস তারাই মহাসভ্যতা সৃষ্টি করেছে।

আমরা এমন যুগে জন্ম গ্রহণ করেছি যখন জাতিগুলি কাছাকাছি এসেছে। রক্তপাত এবং কৃপণতা চিরকাল চলতে পারে না। বিশৃঙ্খলা এবং প্রতিযোগিতায় আমরা আমাদের আত্মাকে দেখতে পাই না। তোমরা যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ তাতেই প্রমাণ যে নূতন যুগ এসেছে।

কত শতাব্দী ধরে তোমরা বণিক সৈন্য এবং অপরকে আহ্বান জানিয়েছ কিন্তু এই মুহূর্তের আগে কোন কবিকে আমন্ত্রণ করো নি। এটা কি একটা বড় ঘটনা নয়?

তোমরা আমাকে, তোমাদের জীবনের আনন্দের অংশভাগী হতে দাও। আমি দার্শনিক নই, সেইজন্য সভার মঞ্চে আসন না দিয়ে তোমাদের হৃদয়ে একটু স্থান দিও। আমি

তোমাদের হৃদয় জয় করতে চাই। তোমাদের মধ্যে আমি অহেতুক জাতিবোধ বা ঐতিহ্যগত পার্থক্যের কথা মনে করি না বরং আমার মনে পড়ে সেই দিনের কথা যখন ভারতবর্ষ তোমাদের ভাই বলে দাবী করেছে এবং তার ভালবাসা পাঠিয়েছে। সেই সম্পর্ক আমার মনে হয় এখনও আমাদের সকলের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে। সেই পথ হয়তো শতাব্দীর ঘাসে ঢাকা পড়েছে কিন্তু আমরা তার সন্ধান করে নেবো। আমি আশাকরি তোমাদের মধ্য থেকে এক স্বপ্ন দেখা মানুষের আবির্ভাব হবে যে যুগ যুগ ধরে সব ব্যবধান মুছে দিয়ে প্রেমের বার্তা প্রচার করবে। যুগ যুগ ধরে এশিয়ার মহান স্বপ্ন দেখা মানুষেরা পৃথিবীতে প্রেমের পুষ্পবৃষ্টি করেছে। এশিয়া অপেক্ষা করছে যে আবার স্বপ্ন দেখা মানুষ আসবে এবং যুদ্ধ নয়, ব্যবসা নয়, আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।" (Talks in China)

রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, "কবির আগমণে পূর্ব এশিয়ায় নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভারতবর্ষ তো কখনো অকারণে বাহিরের সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ইতিপূর্বে বাহিরে আসে নাই; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই সফরের উদ্দেশ্য কী। এই লইয়া নানাপ্রকার গবেষণা শুরু হইল। কেহ মনে করিল, নিখিল-এশিয়ার (Pan-Asianism) যে স্বপ্ন লোকে দেখিতেছে—ইহা কি তাহারই সূচনা—না, আর কিছু। কবিই তাহার উত্তর দিলেন পর-দিনের বক্তৃতায়; তিনি বলিলেন, প্রাচীন ভারতের সহিত চীনের যে সম্বন্ধ ছিল, যাহার ক্ষীণধারা বিস্মৃতির অন্তরালে প্রায় বিলীন, তিনি সেই ধারা পুনর্প্রবাহিত করিবার সংকল্প লইয়া এদেশে আসিয়াছেন। এই সংযোগ কোনো রাজনৈতিক সুবিধাদি সংগ্রহের জন্য নহে, কেবল প্রেম ও মৈত্রীর জন্য "disinterested human love and for nothing else"—আর মানুষের সহিত মানুষের যে সহজ সম্বন্ধ আছে তাহাকে আবিষ্কার ও প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।"

সাংহাই থাকতে থাকতেই চেকিয়াং প্রদেশের প্রধান শহর 'হ্যাংচৌ' থেকে কবির নিমন্ত্রণ আসে। পূর্ব চীনের চেকিয়াং প্রদেশের তৎকালীন রাজধানী হাঙ চৌ চীনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সুন্দর এবং ধনী শহর। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে মার্কোপোলো এই শহর ভ্রমণ করে বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে অবিসংবাদিত সুন্দর এবং মহৎ শহর। এর সিল্ক উৎপাদন এবং ব্যবসাবাণিজ্য, নদী পর্বত সমুদ্র, সুন্দরতম পথঘাট সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হাঙচৌ-র মসজিদ, অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতির জন্য এই শহর বিখ্যাত। বহু শতাব্দী ধরে এটা সুঙ রাজবংশের রাজধানী ছিল। পেইচিং-এর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড ক্যানেল দিয়ে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। হাঙচৌ-র সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ওয়েস্ট লেক। এর কাছেই আছে ১৫০ ফিট উঁচু খাড়াখাড়িক প্যাগোডা বা একচূড় মন্দির।

রবীন্দ্রনাথ হাঙ চৌ-এর এই বিখ্যাত ওয়েস্ট লেকের ধারে নববর্ষ (১৩৩১) কাটালেন। তিনি এখানে ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল তিন দিন ছিলেন। এখানকার অন্যতম গুহামন্দিরে

ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু বোধিজ্ঞান দীর্ঘকাল সাধনা করেন। (ওয়েস্ট লেক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখকের 'চলমান চীন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

হাঙ চৌ-র Provincial Educational Society রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য এক জনসমাবেশের আয়োজন করেছিলেন ১৫ই এপ্রিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সভায় ভারতীয় ঋষি বোধিজ্ঞানের কথা বলেন। তিনি চীনের সংস্কৃতির সঙ্গে আপনার সাধনা যুক্ত করে যে সম্পদ চীনকে দিয়েছিলেন চীন তা আজও বিস্মৃত হয় নি। কবি বলেন ঃ

"তোমাদের একটা মন্দির আছে যেখানে পাথরে খোদাই এক ভারতীয় সাধুর চিত্র আছে যিনি বহু শতাব্দী আগে এই দেশে এসেছিলেন। যিনি এখানে নিজ মাতৃভূমি সদৃশ পাহাড় দেখতে পেয়েছিলেন। কথিত হয় যে এই পাহাড় ভারতবর্ষ থেকে এখানে উড়ে এসেছে। কিন্তু আসল ঘটনা হল তিনি তাঁর দেশে গৃধ্র শৃঙ্গ দেখেছিলেন। এখানে সেই রকম পাহাড় দেখে তিনি আনন্দে সেই নাম দিয়ে দিলেন।

আমি এখানে তোমাদের সুন্দর লেক্ ও পাহাড় দেখেছি। তারা কোন নতুন নয়। কারণ তোমাদের পাহাড়, আমাদের পাহাড়ের মত, তোমাদের লেকের হাসি, আমাদের লেকের মত, তোমাদের গাছের চেহারা আমাদের গাছের চেহারার মত, সেইজন্য তোমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভিন্ন দেশে এসেও আমি এক বাহ্যিক ঐক্য লক্ষ্য করি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষের কোন এক ভাষা নেই যা দিয়ে তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে। তবে একটা সুবিধে আছে, অপরিচিত হিসাবে একে অন্যের প্রীতি লাভের জন্য সচেষ্ট হই। প্রকৃত প্রেমের ধর্মই হল উভয়ের মধ্যে ব্যবধানকে ছাড়িয়ে ফেলা।

যিনি বহু শতাব্দী আগে এই দেশে এসেছিলেন তিনি কেবল দুই দেশের পাহাড়ের মধ্যেই সাদৃশ্য দেখেন নি, তিনি দু দেশের মানুষের হৃদয়ের ঐক্য অনুভব করেছিলেন। একটি ছবিতে আছে চীনেরা তাকে খাদ্য দিচ্ছে—একটি সুন্দর প্রতীকী দৃশ্য। আমি সেই পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকারী তোমাদের হাত থেকে মানসিক দয়ার খাদ্য দাবী করছি।

আমি জানি তোমাদের অনেকেই আমাকে বুঝতে পারছো না। কিন্তু কোন কারণে তোমরা আমাকে দেখতে এসেছ। সেই কারণ হোল সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতে ভারতবর্ষ এইদেশে বণিক বা সৈন্য পাঠায় নি, পাঠিয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রেমের দূত হিসাবে। তাঁরা সমুদ্র এবং মরুভূমি অতিক্রম করে তার দান নিয়ে এসেছিল।

অতীতে ভারতবর্ষের এটাই ছিল মহান কাজ, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে পথ তৈরী করা। মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হল এই পথ তৈরি করা, কোন লাভ বা শক্তির জন্য নয়, যে পথ দিয়ে মানুষের হৃদয়ে বিভিন্নদেশে তাদের ভাইয়ের কাছে যেতে পারে। আজকাল সময় এমন এসেছে যে মানুষ ঘটনাক্রমে শারীরিকভাবে সহজেই কাছাকাছি আসতে পারে কিন্তু বাহ্যিক এই অনায়াসের জন্য মানবজাতির পক্ষে পরস্পরকে জানা সবাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে আমাদের অধিকাংশই পর্যটক। আমরা আসি এবং উপর উপর জীবনকে দেখি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা আমাদের চারিদিকে বর্ম গড়ে তুলেছি তাতেই আরও বিপদ হয়েছে। অনেক দূর দেশে গিয়েও আমরা আমাদের পরিচিত খাদ্য পাই, আরামের ঘর পাই; এই আরাম সেই দেশের মানুষের সঙ্গে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা বড় হোটেলে ঢুকি এবং যে দেশে আসি তার থেকে দূরে সরে যাই।

ভারতবর্ষ থেকে তিনি এখানে বাস করতে এসে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন তিনি তাঁর আনীত দান যারা গ্রহণ করেছিল তাঁদের মধ্যেই বাস করেছেন; তিনি কোন জাত্যাভিমান বা ধর্মীয় অভিমান নিয়ে আসেননি, তিনি এসেছিলেন প্রেমের বার্তা নিয়ে; সেজন্য তিনি নিজের দেশ ত্যাগ করে এসেছিলেন। তিনি যে অকল্পনীয় বিপদ এবং অসুবিধের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন তা আমরা আজ অনুভব করতেও পারি না। বিজ্ঞান বিভিন্ন জাতিকে ঘনিষ্ঠ হতে সহজ করে দিয়েছে কিন্তু পরস্পরকে হত্যা করতে এবং শোষণ করতেও সহজ করে দিয়েছে।

আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়া এখন একটা বাহ্যিক ঘটনা যার জন্য মানবজাতির গর্বের কিছু নেই। আমরা যখন কাছাকাছি আসি তখন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে তবু আমরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করি না। আমরা জনতা তৈরি করি সমাজ করি না। সময় এসেছে যখন আমরা এই লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।

বন্ধুগণ। আমি এসেছি যোগাযোগের সেই পথ পুনরায় খুলে দিতে যে পথ আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পড়লেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে। আমি আমার এই ভ্রমণকে সার্থক মনে করব যদি এর ফলে ভারত চীনের এবং চীন ভারতের কাছাকাছি আসে। কোন রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়, নিছক মানবপ্রীতির জন্য।

মানুষ হিসাবে আমি তোমাদের জানতে চাই। আমরা যখন এই একতা অনুভব করব ভাল হোক মন্দ হোক তখন মানবজগতের সব ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে আমি তোমাদের সাহায্য কামনা করি। আমরা ভারতে একটি পরাজিত জাতি। আমাদের রাজনৈতিক, সামরিক বা বাণিজ্যিক কোন ক্ষমতাই নেই। আমরা জানি না তোমাদের কিভাবে সাহায্য বা ক্ষতি করব। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমরা অতিথি হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, ভাই হিসেবে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি, আমি তাই কামনা করি।

তোমরা যেমন আমাকে আমন্ত্রণ করেছ আমিও তেমনি তোমাদের আমন্ত্রণ জানাই। আমার দেশে আমি যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি আমি জানি না তোমরা তার সম্পর্কে শুনেছ কি না। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হোল ভারতবর্ষ যেন সমস্ত পৃথিবীকে তার হৃদয়ে স্বাগত জানাতে পারে। যা বাধা মনে হচ্ছে সেটাই যেন আমাদের মিলিত হবার পথ হয়ে উঠতে পারে। আমরা সকল বৈষম্যের মধ্যে যেন মিলতে পারি। বৈষম্য বা স্বতন্ত্রতাকে কখনো মুছে ফেলা যাবে না। এটা ছাড়া জীবনই দরিদ্র হয়ে পড়বে। প্রত্যেক মানবজাতি তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে একত্রিত হউক, সমতা নয়, একতাই জীবন্ত।" (Talks in China)

বাদলা পরিবেশ সত্ত্বেও এই সভায় কয়েক হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। মিঃ সুই যখন রবীন্দ্রনাথের এক একটি অংশ অনুবাদ করছিলেন তখন প্রচণ্ড হাততালিতে জনতা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

হাঙ চৌ-এর তৎকালে প্রবীণতম কবি চেন সান লি (Chen San-Li) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গভীর অভিভূত হন এবং করমর্দন করেন।

মিঃ চেনের উদ্যানে বাটিকায় চা পান সভার পরে রবীন্দ্রনাথ চীনের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত শুনেছিলেন। ওয়েস্ট লেকের সৌন্দর্য এবং চীনাবাসীদের সহৃদয় সম্বর্ধনায় কবি অভিভূত। তিনি দেশে সেই কথা লিখে জানিয়েছেন, "Kindness from everybody here. I feel that very cordial relations will soon be established." (Hay-P. 151)

১৭ই এপ্রিল কবি সাংহাই ফিরে আসেন। সেদিনই সাংহাই-এর জাপানীরা এক সভায় কবিকে সংবর্ধিত করেন। সাংহাইতে তখন ব্যবসায়ী, শিল্পী, ধনিক, বণিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বহু জাপানীর ভীড়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই জাপানীদের প্রতি শ্রদ্ধামুগ্ধ, তবু তিনি তাদের উগ্র জাতিপ্রেম ও পররাজ্যগ্রহণপ্রবৃত্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন জাপানী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন :

"এই শহরে জাপানী সম্প্রদায়ের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে আমি আপনাদের দেশে মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। স্বভাব বা শিক্ষায় আমি বক্তা নই, তা ছাড়া ইংরাজী আমার মাতৃভাষা নয় সেজন্য এই ভাষায় কোন বড় সভায় বলতে আমি ভয় পাই।

আমার মনে হয় টোকিওতে আমি যে অভাবিত অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সেখানে ছিলেন। আমি আপনাদের মানুষকে নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি।

সেই সুখস্মৃতিই আমাকে এই সভায় নিয়ে এসেছে। আপনারা আমাকে কবি হিসেবে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। আমি একে কোন ব্যক্তিগত উৎকর্ষ মনে করি না। কারণ আমি জানি প্রাচ্যে কবির স্থান উচ্চে এমন কি উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়েছে। আপনারা অনেকেই আমার কবিতা জানেন না, কেউ কেউ অনুবাদে কিছু পড়েছেন তবু আপনারা আমাকে কবি বলে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। এতে আমি গর্বিত অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে নয়, আপনাদের সভ্যতার মধ্যেই এই হৃদয়ের শ্রদ্ধা আছে।

প্রাচ্যে কবিদের ভালোবাসে এবং ঋষিদের পাথর দিয়ে মেরে ফেলে না, সেজন্যই যারা ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন তাঁরা আপনাদের হৃদয়ে প্রেম এবং সত্যের বাণী নিয়ে এসেছেন। তাঁদের জন্য আপনাদের দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাদের মতে, আতিথেয়তার মাঝেই সভ্যতা। আমি জানি এখনো প্রাচ্যে সেই আদর্শ বিরাজ করছে, যদিও বর্তমান পৃথিবী জুড়ি দৌড়াদৌড়ি এবং বণিকবৃত্তিতে বিব্রত হয়ে উঠেছে।

আমি যখন আপনাদের দেশে গিয়েছিলাম তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক জাপানকে দেখেছি। তারা রাজনৈতিক শক্তি এবং লাভের বশবর্তী হয়ে মানবিকতা হারিয়ে ফেলছে। এটা কেবল জাপানে নয়, অন্যদেশেও যেখানে যান্ত্রিকতা মানবিকতাকে নষ্ট করে ফেলেছে সেখানেও এই ঘটনা ঘটেছে।

রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক জাপানই আসল জাপান নয়। নিউইয়র্ক, কলকাতা সাংহাই, হংকং-এও যান্ত্রিকতা জীবনকে নষ্ট করে ফেলছে। সেজন্য আপনাদের রাজনৈতিক শক্তি যদি আমাকে আতিথেয়তা না জানায় তাহলে আমি বিস্মিত হব না। ইংলণ্ড আমেরিকা এবং অন্যত্র হলেও আমি বিস্মিত হব না। এই কারণে একদিন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। আদর্শবাদীদের প্রতি এইরকম ব্যবহারই করা হয়।

আমি দেখেছি পশ্চিমে কোন বক্সার বা সিনেমা অভিনেত্রী বা কোন লক্ষপতিকে দেখলে কী দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠে। আমরা প্রাচ্যের মানুষ সেই অশ্লীলতা থেকে মুক্ত।

যা কিছু ভয়ঙ্কর এবং শক্তিমান আদিম যুগে তার প্রতি একটা মোহ ছিল। কারণ তাদের মধ্যে একটা ত্রাস ছিল। আজও পৃথিবীতে শক্তিই সর্বব্যাপী; অর্থ, মেশিনগান এবং বোমানিক্ষেপকারী বিমানের শক্তিই সব। এই সাংহাই শহরেও আপনারা সেই দানবকে দেখতে পাবেন যে দানবের লোভের কাছে একদিন মানুষ নরবলিও দিয়েছিল।

কিন্তু একটা সময় এসেছিল যখন মানবজাতি আধ্যাত্মিক ধর্মে উন্নীত হয়েছে। নৈতিক আদর্শে বলীয়ান হয়ে এই দানবকে জয় করেছে। আজও আমরা সেই রকম নৈতিক আদর্শের পুনর্জাগরণ কামনা করি।

অতএব বন্ধুগণ, কেবল আমি কৃতকার্য হয়েছি বলে অপনারা শুধু কথার অভ্যর্থনা জানাবেন না, যদি অপনারা মনে করেন এই প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে কবির একটি মিশন আছে তাহলে আপনাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা কবির প্রতি জ্ঞাপন করবেন, আমি বিনীতভাবে তাকে গ্রহণ করব।" (Talks in China)

কবির এই বক্তৃতায় কেউ খুশী হতে পারল না। পাশ্চাত্য জাতি শক্তিবাদী, তারা বিজ্ঞানলব্ধ শক্তির উপাসক এবং নবীন চীনের তরুণ দলও পাশ্চাত্যের সেই আদিম শক্তি অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর। ঠিক এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের মত একজন মহৎ ব্যক্তির কাছ থেকে সেই একান্ত স্বজাতিপ্রেমের বিরোধী মত প্রচার তাদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হল। যারা পাশ্চাত্য ভাবধারায় বা বিদেশে শিক্ষিত তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে এরূপ তীব্র মত পেশ করতে দেখে উত্তেজিত। তাদের সন্দেহ চীন যে পশ্চিমকে প্রতিহত করবার জন্য উদ্যত, এই মত যে শ্রেণীর লোকের স্বার্থ-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ তাদেরই বার্তাবাহক।

"অপরদিকে ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাসমূহ রবীন্দ্রনাথের মতের এই আদর্শের ব্যাপক সমালোচনায় প্রবৃত্ত। তাহাদের আশঙ্কা অন্যপ্রকারের। একজন বলিতেছেন, য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ধ্বংসোন্মুখ তাহা তাহাদের নানা উপসর্গে আজ স্পষ্ট— The great war (1) was only a symptom of a disease, which is destroying the social organism. তবে তাহাদের প্রশ্ন, কবি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সরাসরি নিন্দা এবং প্রাচ্য

সংস্কৃতির জয়গান করিলেন, তাহার বিশ্লেষণ শেষে কোন্ সত্য উদ্ঘাটিত হইবে। পূর্ব ও পশ্চিমকে সরাসরি আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক বলিয়া সূচিত করা যায় না। য়ুরোপের ইতিহাসে মহৎবাণী ও মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আবার প্রাচ্য দেশসমূহের ইতিহাসে রক্তলিখিত বীভৎস কাহিনীর উদাহরণ অল্প নহে। এশিয়া শক্তিমত্তার জন্য য়ুরোপের গায়ে কালি ছুঁড়িতে পারে না, য়ুরোপও সে বিষয়ে এশিয়াকে নিন্দা করিতে অপারগ। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ যদি আধ্যাত্মিক মিলনাদর্শের কথা প্রচার করিতে চান, তবে কেন তিনি এশিয়ার race pride ও prejudice কে এমনভাবে অতিরঞ্জিত আকারে ব্যাখ্যা করিতেছেন? এইরূপে তাঁহার মহৎ আদর্শ সফল হইবে কি? (Europe needs all the spiritual inspiration which it can get from Asia, but it will not be helped by abuse. Might not Tagore spend some of his time in warning peoples of Asia of the demoralising influences of sloth and of disregard of their own resources! (B. V. Bulettin P. 10) ইংরেজ লেখক কবুল করিলেন যে পাশ্চাত্য দেশের ধনৈশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক কর্মের জন্য নিয়োজিত হয় নাই। তবে পূর্ব দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে পশ্চিমকে লজ্জিত হইতে হইবে না। পূর্ব দেশের ধনীরা তাজমহল ও পেইচিঙের প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমের ধনে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, হাইডেলবের্গ, ভিয়েনার বিদ্যায়তন সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বদেশে ইহার সমকক্ষ কী আছে! (Surely Tagore cannot class these products of our civilization as evidences of our lust and worship of power." (র. জী. (৩) পৃ. ১৫১)

২৪ এপ্রিল ১৯২৪ তারিখের The Peking Leader রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের সমালোচনা করে লিখেছিলেন, "Dr. Tagore unquestionably is one of the foremost international figures to-day and equally unquestionably he has made and still is making important literary, educational and philosophical contributions to the development of the civilization of the world...Unquestionably Dr. Tagore has no desire to stir up racial antogonism in making a contrast between the spiritualism of the East and the materialism of the West, his purpose undoubtedly was simply to call attention to the many worthwhile elements in Eastern thought and civilization. So as to counteract a possible tendency to a blind and uncritical acceptance of everything Western to the neglect of the fine things of The East. But this purpose can be achieved without adding fuel to the fire of racial bitterness which already is burning far too brightly...Materialism and spiritualism are all mixed up together in the West as they are in the East and as they are in the lives of most men. ... If the world needs anything to-day, it needs emphasis not on the differences between peoples and races but on those things which all peoples have in common. Each people has its own peculiar contribution

to make to the development of a newer and finer civilization of the world as a whole. In dicussing the need for greater spirituality in modern life, therefore can not Dr. Tagore speak of the spiritual element in Western civilization as well as of those in the civilization of the East and, if he speaks of materialism at all, give recognition to the fact that the east also have the unspiritual side?"

সাংহাই-এর জাপানীদের সংবাদপত্র 'Shun Tien Shih Pao' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমালোচনা করে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদের উপর জোর দেওয়া জাপানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, "Dare Japan make any boast as to spiritual growth during the years in which Europe was engaged in its horrible death struggle?"

সাংহাইতে আর একদিন কবি কাদুরির গৃহে ইহুদী সংঘ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানায়। কবি কাদুরি সেখানে রবীন্দ্রনাথকে "Light of Asia" বলে অভিহিত করে বলেন, "Dr Tagore is a man of rare nobility of soul a man who has climbed heaven and wrested for us some glimpse of visions which are a delight and a feast to the eye. He is indeed the king of Oriental Poetry."

কয়েক বছর আগে তিনি "The Wedding of Death" নামে এক কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুভয় কাটিয়ে উঠতে হবে; কারণ, মৃত্যু আরেকটি জীবনের জন্ম। একজন সমালোচক এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখতে পেয়েছিলেন। এই সমালোচনার পরে তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়ে এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেন। তিনি সেদিন রবীন্দ্রকবিতার পরিবেশ, বর্তমান ইহুদী প্রজন্মের উপর তাঁর কবিতার প্রভাব এবং প্রাচ্য জাতিগুলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বাণী এই তিন বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সেদিন রবীন্দ্রকবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা বলেছিলেন তা হোল ঃ

"To my mind I find his practical works based on the purity, beauty and sanctity of life."

"To read his Gitanjali is to have the universe transformed in one's eyes into the temple of God."

"To read of Dr. Tagore's Poetry is sufficient to fill one's heart with a great love for all norms of life."

"The greatness of Tagore is not due to the heights of beauty which dwell in him, or to the sweetness of the music and rythm contained in his songs. It is due to the holy atmosphere which you find throughout his verses. In these you will find not only an aesthetic joy, but also a nobility of outlook on life. You will find yourself in the presence of a modern Psalmist who draws the same spiritual music as David drew when he played upon the harp." (V. B. Qly 1924)

এ সভায় রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায় না।

সাংহাই ত্যাগ করবার পূর্বে ১৮ই এপ্রিল মহানগরীর পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশন প্রতিষ্ঠান কমার্শিয়াল প্রেসের প্রেক্ষাগৃহে কবিকে সম্মিলিত সম্বর্ধনা জানানো হোল। এই বিরাট জনসভায় বারশতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কবি চীন ও প্রাচ্যদেশসমূহ সম্বন্ধে তাঁর আশা ও ভরসার কথা প্রাণস্পর্শী ভাবাবেগের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। "পশ্চিমের মনস্বিতা ও অর্থসাচ্ছল্য পূর্ব দেশসমূহের জীবনযাত্রাকে না মহৎ, না বৃহৎ করিয়াছে, অথচ প্রতীচ্যের যন্ত্রদানব এই মহাদেশের রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজনীতিকে যে ভাবে গ্রাস করিতেছে তাহা ভাবিলে আতঙ্ক হয়।" (The North China Standard, 25.4.1924)। হাঙ চৌ-র মত রবীন্দ্রনাথ এখানেও বললেন যে তিনি পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চীন দেশে আসেননি।

বাণিজ্যিক প্রেক্ষাগৃহের এই বক্তৃতার পর সাংহাই-এর নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদেরা রবীন্দ্রনাথকে নৈশভোজের জন্য Kung Peh Lin ভেজিটেবিল রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন সেখানে তিনি চীনা সঙ্গীত শুনলেন। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গীদের Ti-I-Tai (I) থিয়েটারে একটি চীনা অপেরা দেখাতে নিয়ে গেলেন।

নানচিঙে রবীন্দ্রনাথ

সাংহাই থেকে ইয়াংসি নদীপথে কবি নানচিং-এ পৌঁছলেন। এই নদীপথের সৌন্দর্য শোভা কবির খুব ভালো লেগেছিল। নানচিং-ও সুন্দর শহর। একদিকে ইয়াংসি নদী অন্যদিকে বহু প্রাচীন হুয়ান উ' লেক। রাজরাজড়াদের আমলে এই লেক তৈরি। তাদের বিলাস বিশ্রামের সুন্দর জায়গা। পরে চিয়াংকাইশেক নানচিং-এ চীনের রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

"মহানগরীতে বাসকালে সিভিল গভর্ণর Han-Tze-Sue এর সহিত কবি পরিচিত হন; ইঁহার মনের শান্তি ও অন্তরের অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া কবি আশ্চর্য হইয়া গেলেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কার্যকলাপ ও মতামত সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। প্রদেশপাল দুঃখ করিয়া বলিলেন, কবির বাণী সাধারণ শিক্ষিত যুবকেরা বুঝিবে না, এবং হয়তো ভুলই বুঝিবে। কিন্তু দুই চারজন যাঁহারা বৌদ্ধ শাস্ত্র জানেন ও মহৎ আদর্শের স্থান জীবনে দিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কবির বাণী সহজবোধ্য হইবে।" (র. জী)

নানচিঙের সমর-তুচুন জেনারেল Che-She-Yuan-এর সঙ্গে কবির সমসাময়িক চীনের অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। চীনের গৃহবিবাদ কবিকে কীভাবে পীড়িত করছে তা কবি বলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর সব অমর কীর্তি— সাহিত্য, কলা, সংগীত জাতির জীবনে শান্তি না থাকলে প্রকাশ পায় না। সেজন্য চীনের এই আত্মঘাতী সংঘাত বন্ধ করা প্রয়োজন। এই আলোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে এলমহার্স্ট লিখেছেন... "He

expressed an earnest desire that the Tuchun should do his best to prevent internal dissensions and violence of all kinds which was growing daily in tensity, adding that China had a great responsibility because here was a great civilisation, and to menace this with internal discord and war was a crime that would never be forgiven in the history of the world. Before it is too late the Tuchun should try to stop all this for the sake not only of China but of Asia and all humanity."
(V. B. Bulletin–June, 1924. P. 24)

সমর নায়কেরই অধীন প্রদেশপাল রবীন্দ্রনাথকে বললেন, ভারত এবং চীনের মধ্যে ছাত্র বিনিময়ে উৎসাহদানে তার পক্ষে যা সম্ভব তা তিনি করবেন।

নানচিঙের জাতীয় দক্ষিণ পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০শে এপ্রিল বিকেলে কবির সম্বর্ধনা ও বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল। কবির বক্তৃতা শুনতে অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। হাজারের উপর আধুনিক যুগের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ভীড়ের চাপে ব্যালকনি ভেঙ্গে যাওয়ার মত হয়। কবির ইংরেজী ভাষণের তর্জমা করে শোনান সুই চি মো। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তোমরা যারা যুবক তাদের বিবেককে পরিচালিত করতে পুঁথির মৃত পাতার কোন উপদেশের প্রয়োজন নেই। আনন্দের সূর্যালোক কিংবা জীবনের বসন্ত থেকে তোমাদের আত্মা স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারে, তা-ই বীজকে অঙ্কুরিত হতে বা কুসুমকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। তোমাদের দেশের ভবিষ্যতের অনাগত দিনের আশায় তোমাদের যৌবন সকালের তারার মত জ্বলজ্বল করুক। আমি এখানে তোমাদের কবি, যৌবনের কবি, তোমাদের প্রশংসায় গান গাই।

সারা পৃথিবীতে পরিচিত যৌবনের রূপকথার সেই গল্প তোমরা জান। এক নিষ্ঠুর দস্যু সুন্দরী রাজকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে, যুবক রাজপুত্র তাকে সেই বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে আনতে যাত্রা করেছে। বাল্যকালে যখন এই গল্প শুনেছি তখন আমরা রাজপুত্রের ছদ্মবেশে সমস্ত বাধা এবং প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সেই রাজকুমারীকে মুক্ত করে আনতে যাত্রা করতাম। অবশেষে তাকে মুক্ত করে আনতাম। বর্তমানে মানবাত্মাকে দানব যন্ত্র বন্দী করে রেখেছে। আমার যুবক রাজপুত্রদের আহ্বান করি মানবাত্মাকে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আনতে তোমাদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার কর।

সাংহাই থেকে তোমাদের মহান নদী ইয়াংসির মধ্য দিয়ে আমরা এখানে এসেছি। সারারাত প্রায়ই আমি বিছানা ছেড়ে নদীতীরের সৌন্দর্য দেখতে আসতাম। নিঃসঙ্গ বাতি নিয়ে ঘুমন্ত কুটীরগুলি, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের উপর নিস্তব্ধতা। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি নৌকাগুলি নদীর বুকে ভাসছে, তাদের পাল আকাশে উড়ছে—সার্থক মুক্তির উজ্জ্বল্য নিয়ে জীবনের সক্রিয়তার চিত্র। এটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। মনে হোল আমার পালেও বাতাস লেগেছে, আমাকে বন্দীত্ব থেকে আমার ঘুমন্ত অতীত থেকে এই মহান মানবিক পৃথিবীতে নিয়ে আসছে। মানব প্রগতির ইতিহাসের নানা পর্যায় আমার মনে এল।

তবে প্রতি গ্রামই ছিল আত্মকেন্দ্রিক, প্রতি কুটীর ছিল অচেতনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই দৃশ্য দেখে আমি কল্পনায় অস্পষ্ট স্বপ্ন ঘুমন্ত আত্মার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমার মনে যা আঘাত করেছিল তা হোল মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। বাতিগুলি কুটীরের মধ্যে জ্বললেও ঐ অন্ধকারে তারা বিচ্ছিন্ন। আমি দেখতে না পেলেও শিকার অন্বেষণে কিছু চোরের দল কেবলমাত্র জেগেছিল, যারা ঘুমন্ত তাদের শোষণ করতে।

দিনের আলো ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে পড়ি। আমরা তখন যে আলো দেখি তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য। আমরা তখন একে অন্যকে জানতে পারি, জীবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারি। সকালের দ্রুত ছুটে চলা নৌকার মধ্য দিয়ে এই বার্তা পেলাম। ছড়ানো পালের মধ্যে জীবনের মুক্তিকে পেলাম। আমি আনন্দ বোধ করলাম। প্রার্থনা করলাম এই সকাল যেন মানুষের জগতে এসেও আলো ছড়িয়ে দেয়।

আমরা যে যুগে বাস করি মানববিশ্বে তা কি এখনো রাত্রিকাল নয়, পৃথিবী ঘুমন্ত, দরজা জানালা বন্ধ কুটিরের মত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের মধ্যে সীমারেখা টেনে নিজেদের জাতি বলে পরিচয় দিচ্ছে না? এ কি সভ্যতার অন্ধকার যুগ নয় এবং আমরা কি বিশ্বাস করছি না যে কেবলমাত্র ডাকাতরাই জেগে আছে? টর্চের যে আলো মানুষ উঁচু করে ধরে আছে তা সভ্যতার আলো নয়, শোষণের পথকেই সে কেবল নির্দেশ করে।

এই যুগ এখনো চলছে, মানব সভ্যতায় এসে সবচেয়ে অন্ধকার যুগ বলা যায়। কিন্তু আমি নিরাশ হইনি। খুব ভোর বেলায় রাত্রি অন্ধকার থাকতেই পাখি সূর্যোদয়ের ডাক ডেকে ওঠে আমার হৃদয়ও তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের ডাক শুনতে পেয়েছে। এই নতুন যুগকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অনেক জ্ঞানী এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত বলবেন মানবপ্রকৃতি এত উন্নত নয়, তারা সব সময় একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সবল সব সময় দুর্বলের উপর জয়ী হবে, মানবসভ্যতার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। তাদের কথায় হয়ত ভিত্তি আছে কিন্তু আমি তাকে সত্যের প্রকাশ বলে গ্রহণ করতে রাজী নই।

অতি প্রাচীনকালে প্রকৃতি যখন বিরাট বিরাট দৈত্য তৈরি করেছিল কে তখন বিশ্বাস করত যে একদিন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে? কিন্তু সেই অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটেছে। হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর শারীরিক শক্তির মধ্যে অস্ত্র এবং কোন রক্ষাকবচ না নিয়ে নগ্ন ক্ষুদ্র এবং পাতলা চামড়ার মানুষ দেখা দিল। সে তার বুদ্ধির শক্তি আবিষ্কার করে মন থেকেই অস্ত্র তৈরি করে পেশীশক্তির বিরুদ্ধে টিকে রইল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব জীবনের প্রকৃত জয় ঘটেনি। আজও তার উপর পুরুষের অর্ধ বর্বর এবং অর্ধ মানুষ প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যদের চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে পৃথিবীতে শারীরিক শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা প্রাচ্যের মানুষ একবার মানুষের বর্বরতার মুখ বন্ধ করে তার ভয়ঙ্করতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আজ বুদ্ধির দানবিক শক্তি আমাদের নৈতিক এবং আত্মিক শক্তিকে অভিভূত করে ফেলেছে। জন্তুর শক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে কিন্তু বিজ্ঞানের বোমা, বিষাক্ত গ্যাস, খুনী বোমারু বিমান এবং ভীষণ অস্ত্রপাতির কোন সামঞ্জস্য নেই।

আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষের সত্য সকলের জন্য। অর্থ এবং বিত্ত ব্যক্তিগত কিন্তু সত্যকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লাগানো উচিত নয়, সেটা হবে ভগবানের আশীর্বাদকে লাভের জন্য বিক্রি করা। বিজ্ঞানও সত্য। রোগ নিরাময়ে, মানুষকে আরো বেশি খাদ্য এবং আরাম প্রদানে তার নিজস্ব একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু যখন তা সবলকে দুর্বলের ধ্বংসে সাহায্য করে, ঘুমন্ত মানুষকে লুণ্ঠন করতে সাহায্য করে তখন সে সত্যকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করছে। যারা পবিত্রতার অসম্মান করছে একদিন তাদের অস্ত্রই তাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে এবং তারা ধ্বংস হবে।

একটা নতুন যুগ এসেছে যখন একটা নতুন শক্তি আবিষ্কার করতে হবে, যে শক্তি যন্ত্রণা দিতে সাহায্য করবে না, বরং যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি জোগাবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বুদ্ধিবৃত্তি যেমন পেশীশক্তিকে জয় করেছে তেমনি এই শক্তি বর্বর লোককে জয় করতে সাহায্য করবে।

এই নতুন যুগের অরুণোদয় প্রাচ্যেই ঘটবে। অতীতেও এখানে আদর্শের নতুন প্রস্রবণের আবির্ভাবে জীবনক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলেছে। আত্মবলির মধ্য দিয়ে সেই নৈতিক শক্তির পরীক্ষা দিতে আমি আবেদন জানাই। দুর্বলের নতি স্বীকার নয়, শক্তিমানের ত্যাগ ও যন্ত্রণাভোগের দ্বারা তার প্রমাণ দিতে হবে। সংগঠন যত বড়ই হোক না কেন তা তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে না, নিভৃত অন্তরের প্রতি অকম্প ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারাই তা করতে হবে।

মহৎ মানবসমাজ কোটিপতিরা তৈরি করেনি, যারা বড় স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরাই করেছেন। কোটিপতিরা বিরাট পরিমাণে বাণিজ্য করতে পারে কিন্তু বড় সভ্যতা তারা তৈরী করতে পারে না। অন্যেরা যা তৈরি করেছে তারা তাকে কেবল ধ্বংস করতে পারে। যন্ত্রের অন্ধকার কারাগার থেকে মানবাত্মাকে মুক্ত করতে এগিয়ে এস। ঘোষণা কর মানুষের শক্তি মেশিনগান বা চাতুরীর উপর নির্ভর করে না, সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

নানকিং থেকে কবি তার সঙ্গীদের নিয়ে Blue Express Luxury ট্রেনে পেইচিং অভিমুখে যাত্রা করলেন। নানকিঙের জঙ্গীশাসক চি শি য়ুয়ান কবির ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রাইভেটকার জুড়ে দিয়েছিলেন। পেইচিং সরকারের পক্ষ থেকে ঐ গাড়িতে ভারতীয় অতিথিদের বিশেষ সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছিল। কারণ ঐ গাড়িতে এর আগের বছর দস্যুরা ৩৫ জন ইউরোপীয় এবং আমেরিকান যাত্রীদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল। (চে—পৃ. ১৫৬)

২২শে এপ্রিল কবি শানতুঙের রাজধানী থসিনান-এ নেমে ছুফুতে চীনের বিখ্যাত প্রাচীন দার্শনিক কনফুসিয়াসের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেলেন। বিকেলে Provincial Assembly Hall-এ কয়েক হাজার ছাত্রের সামনে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতা এবং অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা করলেন। একটি সার্বিক আলোচনা করে শ্রোতাদের সামনে একটি জীবন সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। চীনের বক্তৃতা মালায় একে 'সত্যম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কবি বলেন,

"প্রাচ্যে অনুশীলনের অভাবে আমরা নতুন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারি না, নতুন চিন্তার অভাবে মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আমাদের চিন্তায় আনুগত্যের অভাব ঘটেছে, অতিশয়তা এবং অযথার্থতায় আমরা কুসংস্কার এবং প্রতীকি অলৌকিকতায় আবদ্ধ হয়েছি।

অন্যদিকে আমরা যখন পশ্চিমের অনুসরণ করে গতির পিছনে ছুটে যাই তখন আমরা ভুলে যাই শাশ্বত ছন্দ থেকে বিচ্যুত যে-কোন আলোড়ন অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণে পরিণত হয়। পশ্চিমের জীবন মাথাভারী হিমশৈলের মত তার নৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে জানে তার আচরণ মাতালের মত কিন্তু কি করে থামতে হবে জানে না। সে তার পানশালা বন্ধ না করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য নানা উপায় চিন্তা করে।

প্রাচ্যের যুবকেরা যারা পশ্চিমের ঘোড়দৌড়বাজির নতুন মতে মত্ত তারা আমাদের সার্থকতার ভারসাম্যকে নিষ্ক্রিয়তা বলে উপহাস করে। কিন্তু তারা ভুলে যায় বিশ্রামের চেয়েও গতির জন্য ভারসাম্য বেশি প্রয়োজন।

চীনে ভ্রমণ করার সময় আমার একজন বন্ধু তার জাপানী পর্যটক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল তারা কেন চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে উপেক্ষা করছে। স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে জাপানি পর্যটক একজন জার্মানী যাত্রীকে জিজ্ঞেস করল তারা কখনো জার্মানী এবং ফ্রান্সের মিলনের কথা ভাবতে পারে কিনা। পশ্চিমী শিক্ষকের অধীনের প্রাচ্যের ছাত্ররা কিভাবে গড়ে উঠছে এর থেকে তা স্পষ্ট প্রমাণ হবে। তারা তাদের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করেছে কিন্তু তার থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি। তারা শিক্ষকের অঙ্গভঙ্গি গলার স্বর নকল করেও গর্বিত কিন্তু তারা জানে না যে তার ফাঁক দিয়ে আসল শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেল।

আমি মনে করি জাপানী যুবকের এই মত তার দেশের মানুষের মত নয়। সে ইউরোপের দোহাই টেনে চীন এবং জাপানের বৈরিতা সমর্থন করেছে। যে প্রচণ্ড ঘৃণা জার্মান এবং ফ্রান্সকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে সে সেকথা বুঝতে পারে নি।

এই আলাপ থেকে বুঝতে পারি জাতীয়তার কী বিষাক্ত বীজ সারা পৃথিবীতে উপ্ত হয়েছে প্রাচ্যের স্কুলের ছাত্ররা সেই আত্মবিধ্বংসী ফসল দেখে আনন্দ করছে। সময় এসেছে আমরা যেন প্রাচীন সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি, অহঙ্কার, ঘৃণা, কূটনীতির মিথ্যা ভাষণ কিংবা অর্থ বা পেশী শক্তি আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে অতীতে মহান সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল কারণ তারা সৃজনশীলতায় বিশ্বাস, আদর্শে বিশ্বাস এবং মানুষে মানুষের মধ্যে সম্প্রতির আদর্শ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আধুনিক যুগের আত্মপূজারী, অর্থগৃধ্নু, পরলোভী স্মার্ট এবং লাভ ক্ষতির ধূর্ত ব্যবসায়ী অতিসতর্ক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাকে অবশেষে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বড় বড় আদর্শের দ্বারাই মানুষের সমাজ গড়ে ওঠে, অন্ধ উত্তেজনা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। যতক্ষণ তারা জীবনের খাদ্য যোগান দিতে পারে ততক্ষণ টিকে থাকে কিন্তু যখন অতৃপ্ত আত্মসন্তুষ্টির জন্য জীবনকে তারা শোষণ করে তখন তা ধ্বংস হয়। আমরা শিখেছি সত্যই মানুষের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

ভারতবর্ষে কতকগুলি মন্ত্রের দ্বারা মানুষের মনকে পার্থিব জগতের সঙ্গে সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং মনে শান্তি আনে। এ রকম একটি মন্ত্রের শুরু হয়েছে 'সত্যম্' দিয়ে যার অর্থ চরম সত্য, সত্য।

জীবনের একেবারে প্রারম্ভে শিশু যতক্ষণ না জানতে পারে না যে যা তার হাতের কাছে আসে তাই খাদ্য নয় ততক্ষণ সে সব কিছু মুখে পুরে দেয়। বুদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের মন তেমনি এক প্রবল ক্ষুধা নিয়ে বিচ্ছিন্ন সব ঘটনাকেই গ্রহণ করে সঞ্চয় করে। অবশেষে মন জানতে পারে সে চায় কতগুলি ঘটনা বা বস্তু নয় তাদের মধ্য থেকে কিছু মূল্যবোধ।

তবে যেখানে সব কিছু পরিবর্তনশীল সেখানে চরম বাস্তবতা বলে কিছু থাকতে পারে? যে নক্ষত্র অন্ধকারে আলো দেয় সেই আলোর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। সুতরাং সংস্কৃতে এই পৃথিবীকে বলে সংসার অর্থাৎ যা গতিশীল এবং সংসারকে আমরা বলি মায়া, স্বপ্ন। তা হলে সত্য কোথায়?

সত্য এই গতিরই প্রকাশ। একটি নাচের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি থাকে কিন্তু কখনো তারা পারস্পরিক সংঘর্ষে আসে না কারণ তার মধ্যেও একটা নির্দিষ্ট সঙ্গীতের সত্য আছে যা প্রকাশের নানা ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়ে ওঠে।

এই পৃথিবীতে সব কিছুই গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। এই গতিশীলতার মধ্যেও আছে এক শাশ্বত সত্যের প্রকাশ। যে মানুষ এই অবিরাম পরিবর্তনশীলতার প্রতি স্থির দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকেন তার কাছে এই পরিবর্তনশীলতা অর্থহীন মনে হতে পারে। শিশু যেমন খেলাচ্ছলে অবলীলায় একটি বইকে ছিঁড়ে ফেলে তেমনি এই মানুষের কাছে এই পরিবর্তনে কোন সত্য নেই।

কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতার প্রতি মুহূর্তের মধ্যে একটি স্থায়ী অর্থ আছে এভাবেই পৃথিবীকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের জীবনে ছোট্ট ওঠার মধ্যেও অসংখ্য টুকরো টুকরো ঘটনা থাকে কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা সংযোগ আছে, একটি সামগ্রিক আনন্দ আছে এবং তার নামই জীবন। এই মুহূর্তে আমি যখন কথা বলছি তখন আমার বিচ্ছিন্ন

শব্দগুলি যদি আমার জীবনের প্রকাশ না হয় তা হলে সেগুলোকে মনে হবে বোঝা মাত্র, এই প্রকাশই হয় সত্যের প্রকাশ।

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে সেই চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের সম্পদের লোভ যখন এই সত্যকে উপেক্ষা করে এবং মনে করে যে এই পরিবর্তনশীলতা ছাড়া আর কিছুই সত্য নয় তখন আমাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, প্রতিহিংসোপরায়ণ প্রতিযোগিতার সংঘর্ষের পথে অন্ধকার পরিণামের দিকে আমরা এগিয়ে যাই।

পূর্ণতার উপলব্ধির মধ্যেই সত্যিকার আনন্দ। বস্তুগত বর্ধনের দ্বারা একে লাভ করা যায় না আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের মধ্যেই তাকে লাভ করতে হয়। একজন শিল্পী যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু বস্তুই গ্রহণ করেন।

উপনিষদের মতে সীম এবং অসীমের মিলনের মধ্যেই সত্যের পূর্ণতা। আমাদের জীবন এবং কর্মের মধ্যেই যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে হয় জীবন একটা ছায়া কিংবা মামুলি সঞ্চয় হয়ে ওঠে।

প্রাচ্যে আমাদের মন শাশ্বত একের শান্তি নিয়ে থাকত। এই মানসিকতা একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছিল। এই সঙ্কীর্ণতা দীর্ঘ জীবন দিয়েছিল কিন্তু নানা অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি দান করেনি। যাকে একসময়ে প্রাচ্যে সত্যের যে আলো মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখা দিয়েছিল কালক্রমে তা স্থবির হয়ে গেল, অলস কল্পনার স্তূপে পরিণত হল।

যখন মনের স্রোত ক্ষীণ হয়ে যায়, মৃত বস্তু পুঞ্জীভূত হয় তখন জীবনও জড় হয়ে পড়ে। এই দেশে এবং আমার মাতৃভূমিতেও ভয়ঙ্কর এই মৃতের বোঝা আমরা দেখতে পাই। যেহেতু আমরা জিজ্ঞাসার অধিকার হারিয়ে ফেলেছি এবং উপলব্ধির ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছি সেজন্য আমরা জড়তার বেদীতে জরিমানা গুণে চলেছি। আমরা জীবিত মানুষের আশা এবং উপলব্ধিকে বঞ্চিত করে মৃতের প্রাসাদ নির্মাণ করেছি। প্রাচ্যে আমরা জীবনের সব দিক বন্ধ করে কেবল অতীতের কবর রচনা করে চলেছি।

জীবনের নতুন নতুন দিক দিয়ে পূর্ণতার আদর্শকে যুগে যুগে নতুন জন্ম দিয়ে যেতে হয়। নইলে তারা চিন্তাহীন পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়, হাস্যকর গর্ব দিয়ে মানবজীবন অতীতের পুতুলে পরিণত হয়। এই পুতুলখেলা অনন্তকাল ধরে চলতে পারে যদি কোন বহিরাক্রমণ না থাকে কিংবা হঠাৎ যদি কোন অশ্রদ্ধের জনতা এসে জোর করে এই পুতুলগুলোকে তাদের ঘর থেকে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়।

বাঙালী লোকদের এই রকম একটা অশ্রদ্ধের ঝাঁকুনিতে আমাদের জাগরণ ঘটেছে। ঘুমন্ত থেকে হঠাৎ জেগে উঠে আমরা আমাদের পুরোনো আদর্শকেই অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি। আমরা কিছু সময়ের মধ্যে বুঝতে পারব এর জন্য ঐ আদর্শগুলোকে দায়ী করা উচিত নয় আমরা কিভাবে তাদের ব্যবহার করছি সেটাই বড় কথা। আমরা যদি আমাদের আদর্শকে এক অন্ধ আচারের গুহায় বন্ধ করে রাখি তাহলে তারা আমাদের আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে রাখবেই।

জীবনের ধর্মই হচ্ছে বিদ্রোহ করা। আবরণকে ভেঙে ভেঙেই তা এগিয়ে চলে কিন্তু এই আবরণ যা তাকে আশ্রয় দেয় যদি তার পরিবর্তন না ঘটে তাহলে তা বন্দীশালা হয়ে ওঠে। জড়শ্রেণীর কাছে মৃত্যু হচ্ছে মুক্তির শেষ যুদ্ধ। আমাদের সমাজে এই বিদ্রোহের সত্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে, মুক্তির চেয়ে আচারই পবিত্র হয়ে উঠেছে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জীবনের বিকাশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। আমরা দেখেছি বাস্তবতার পূর্ণতা সেখানেই যেখানে গতির মধ্যেই সত্য বিকাশ লাভ করে।

এটা সত্য যে যারা সত্যকে কেবলমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নয় বরং মুক্তির মধ্য দিয়ে লাভ করতে চায় তাদের নদীর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রগতির মত বহু বিপদ এবং বাধার মধ্য দিয়ে জীবনের গভীরতর সঙ্গীতকে উপলব্ধি করতে হবে। যারা শান্ত কুড়েমিকে ভালবাসে, যারা যে-কোন সক্রিয়তাকে প্রাচীন ঐতিহ্যবিরোধী মনে করে তারা রোগ, দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান এবং পরাজয়ে ভোগে। তারা সত্যকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে চায় বলে তারা মুক্তির অপব্যবহারের জন্য শাস্তি পায়।

আমি বলেছি জীবন বিদ্রোহী। অমনি আমাদের প্রাচ্যের বিদ্যালয়ের পাঠার্থীরা লাফিয়ে উঠে বলবেন তাহলে পশ্চিমের অনুকরণে আমরা এই বিদ্রোহ করব। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে আমাদের মৃত সংস্কার আমাদের অতীত জীবন থেকে চুরি, অনুকরণ ও অন্যের জীবন থেকে চুরি। দুটিই অন্যায়ের দলস্থ। প্রথম শৃঙ্খল হলে আমাদের শরীরে মানিয়ে যায় কিন্তু পরেরটা বোঝা বলে শৃঙ্খলই থেকে যায়। জীবনের বৃদ্ধি হয় ঋণের মাধ্যমে নয়, স্বাভাবিক বিকাশে।

পাশ্চাত্যের পশ্চাতে পরগাছার মত প্রাচ্যের অনুসরণ ভাল নয়। মানবতার পক্ষে এটা হবে হতাশা এবং প্রতারণা। প্রাচ্য যদি পাশ্চাত্যের অনুলিপি হয়, তাহলে সেই অনুলিপি হবে ম্লান।

পশ্চিম নিঃসন্দেহে তার পণ্য, পর্যটক, মেশিনগান, স্কুল শিক্ষক এবং মহান ধর্ম দিয়ে আমাদের আপ্লুত করে দিয়েছে কিন্তু তাদের পিছনে একটা মতলব আছে, লাভমনোভাব আছে। সেটা আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। কিন্তু পশ্চিম একটা বড় কাজ করেছে সেটা হোল তারা আমাদের জীবনে একটা সজীব মনের স্পর্শ দিয়েছে, তার ফলে আমাদের মনও চিন্তা ও ক্রিয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের মন বিরাট, বুদ্ধিদীপ্ত, জীবনের গভীরতা অনেক।

জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের মনে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হোল তার আগে কি ছিল। এখন সেই জাগরণের কাল অতিক্রান্ত, এখন সময় এসেছে এর মধ্যে কি আছে জানবার। আমরা আমাদের নিজেদের জানতে আরম্ভ করেছি। পশ্চিমও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেজন্য আমরা আমাদের মনকে সন্ধান করছি।

আমি নিঃসন্দেহ যে প্রাচ্যে আমাদের মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সুবিধা নিয়ে সেই সার্থকতায় বেশি মূল্য আরোপ না করা এবং আমাদের আদর্শ, আমাদের ধর্মের মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি করার উপরেই আমরা বেশি মূল্য দেব। প্রাচ্যের এই জাগরণ আমাদের

নিজেদের সিভিলাইজেশনকে আবিষ্কার করুক, তার পথ থেকে সব প্রতিকূলতা দূর করে বিস্তার অপসারণ ঘটিয়ে সব মানবজাতির মধ্যে যোগাযোগের এক প্রশস্ত পথ গড়ে তুলুক।" (T.C.)

এই বক্তৃতায় তুমুল হর্ষধ্বনি হয়। এর পরে শানতুঙ ক্রিস্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক জনতা কবির শিক্ষাদর্শ শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। কবি সেখানে গিয়ে তাঁর শিক্ষার সম্পর্কে বলেন। 'Talks in China' গ্রন্থে তার কোন বিবরণ নেই। তবে অন্যত্র ভাষণেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

পেইচিঙে রবীন্দ্রনাথ

২৩শে এপ্রিল ভোরে কবি আবার যাত্রা করেন পেইচিঙের উদ্দেশে। তিয়েনৎসিনে পেইচিঙ লেকচার এসোসিয়েশনের সভাপতি লিয়াং-চি-চাও কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে কবির ট্রেনে উঠলেন এবং বাকি ৭৫ মাইল কবির সঙ্গী ছিলেন। এদিন সন্ধ্যায় পেইচিঙের চিয়েন মেন স্টেশনে গাড়ি পৌঁছল।

এক বিরাট উৎসাহী জনতা কবিকে অভ্যর্থনা করার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিল। ছাত্র, অধ্যাপক, সাংবাদিক, নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—চীনা, জাপানী, ইংরেজ, আমেরিকান এমনকি কয়েকজন ভারতীয় পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে পেইচিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ চিয়াঙ মন-লিন, লিয়াং-চি-চাওর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী লিন চাঙ-মিন। চারদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি এবং তার সঙ্গে চীনা রীতি অনুসারে পটকাবাজির কর্ণভেদী শব্দ। এর আগে পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ড এবং আমেরিকা থেকে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এনেছিল কিন্তু এমন সম্বর্ধনা কেউ দেখেন নি। এই সম্পর্কে North China Standard (25th April) লিখেছিল,

"No event in recent years has aroused so much interest in Chinese intellectual circles as the visit of Rabindranath Tagore. Many men have come to China and gone yet none of them has been so enthusiastically received. What is the explanation? It is because, Dr. Tagore belongs to the East and in honouring him the Chinese intellectuals are honouring the civilisation of the East. What is more, Dr. Tagore has come with a message which cannot fail to make a powerful appeal to both Young China and Old China. Young China has often been criticised because of its attempt to transplant Western civilisation into Chinese soil, root and branch. This criticism was certainly justified a few years ago; but since then there has been unmistakable evidence that Young China is beginning to turn from the materialism of the West to the culture of their forefathers for spiritual relief. On the other hand, the will of Young China to examine the

teachings of their forefathers in the light of the civilisation of the West, will be reinforced by the words of Dr. Tagore. In this way there will be soon brought about a reconciliation between Young china and old China, and if this turns out to be the ultimate result of Mr. Tagore's visit to this country, he will have rendered a great service to the cause of Chinese civilisation."

এবং The Peking Daily News (24th April) : লিখেছেন—"It is a pleasure for the cultural classes in China to meet Sir Tagore, the great Indian poet., Theories and thoughts are hopelessly complicated now-a-days and one is at a loss to follow the right trend. Advocates of imperialism have not died out while the currents of communism seem to have invaded all the nations ... But scarcely have we heard anyone who is competent to point out the fundamental mistakes of mankind and to find a remedy that will give a new lease of life to the world. Dr. Tagore has made a careful examination of the Western civilisation and he knows what is lacking in that civilisation. He knows that, Oriental thoughts have yet a mission to perform."

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চীনের অভিজাত এবং বিলাসী পেইচিং হোটেলে। ২৫শে এপ্রিল এ্যাংলো-আমেরিকান এসোসিয়েশনের তরফ থেকে Wagonlits হোটেলে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। জনাকীর্ণ বক্তৃতাগৃহ। স্যার ফ্রান্সিস আগ্‌লেন সমিতির সভাপতি। আমেরিকান Dr. G. Schurman কবিকে পূর্ব থেকে জানতেন। তিনি কবিকে সভায় পরিচিত করান।

রবীন্দ্রনাথ এই লাঞ্চ সভায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করে ভাবাত্মক গঠনমূলক বিশ্বমৈত্রীর কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

"কয়েক বৎসর আগে আমি আমেরিকায় যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। যাবার পথে আমি নতুন সমৃদ্ধ এবং গর্বিত জাপানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখে আহত হয়েছিলাম যে হঠাৎ সমৃদ্ধি লাভ করে প্রাচ্য বিনীত হতে ভুলে গিয়েছে। আমাদের জানা উচিত যে, কোনদেশ যখন হঠাৎ বিস্ময়কর রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করে তখন তার দেশের ইতিহাসে সঙ্কটময় অবস্থা। শক্তির ধূলি ঝঞ্ঝা জ্ঞানের পথকে ধ্বংস করে। অহঙ্কার একের অত্যধিক ক্ষমতার উপর অন্ধ বিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; তার থেকে তার ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়; প্রতিবেশের সঙ্গে তার অনবরত সংঘাত বাধে।

এশিয়ায় আমরা ঐক্যের মধ্যেই আমাদের শক্তিকে প্রকাশ করব, নাস্তিকতার বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মম্ভরিতার মনোভাব থেকে দূরে থেকে আমরা সত্যের প্রতি অকম্পিত বিশ্বাস রাখব। প্রাচ্যের হৃদয় থেকে এক সময়ে উক্ত হয়েছিল, "বিনীত তুমি লাভ করো"। কারণ বিনয়ী কখনো ঔদ্ধত্য প্রকাশে শক্তি ক্ষয় করে না।

এশিয়ায় আমরা কোন যান্ত্রিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে ঐক্য চাই না, আমরা চাই প্রকৃত সহানুভূতির মধ্য দিয়ে ঐক্য। যন্ত্রের সংগঠিত শক্তি আমাদের কেবল অভিভূত এবং গ্রাস করে। তার থেকে আমাদের আত্মিক শক্তিকে রক্ষা পেতেই হবে। পশ্চিম থেকে আমরা বিজ্ঞান ঠিকই ধার করছি। পশ্চিমের মানুষের কাছ থেকে তাদের বুদ্ধির সম্পদ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। তাদের এই বুদ্ধি মহান এবং উৎকৃষ্টতর। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যদি আমাদের জ্ঞানের সম্পদকে ভুলে যাই তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি অপমান করা হবে। সীমাহীন শারীরিক শক্তি এবং বস্তু সম্পদের চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশি।

আমি গভীর ভাবেই অনুভব করি যে পৃথিবীতে একটা অপচয় এবং ধ্বংস নেমে আসছে। অর্থ এবং শক্তির সম্পর্কে মানুষ মোহগ্রস্ত এবং নত হয়ে পড়েছে। আমি আমার নমনে দেখেছি এই অহমিকার বিরুদ্ধে কেবল বক্তৃতা দিয়ে কিছু হবে না। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এক ধরনের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা একটা উচ্চতর জীবন আবর্তে বড় হয়ে উঠতে পারে।

বিগত কিছুকাল ধরে বুদ্ধির চর্চা করতে গিয়ে শিক্ষার আদর্শবাদ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ছাত্রদের মধ্যে একটা ইচ্ছাই বলবৎ হচ্ছে, সেটা হোল শক্তি এবং বিত্ত অর্জন করা, কোন আত্মিক উৎকর্ষ লাভ করা নয়, কোন আত্ম-মুক্তির চেষ্টা নয়। মানব বিকাশের পক্ষে এই আদর্শ প্রশংসনীয় নয়।

গত দেড় শতাব্দী ধরে পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলি জীবনের আত্মিক উৎকর্ষকে পরিত্যাগ করেছে। আমরা প্রাচ্যের মানুষেরা তাদের সাফল্যে মোহিত হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, পশ্চিম আকাশের উজ্জ্বলতা সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল্য নয়, উত্তেজনার দুঃস্বপ্নের অগ্নিকাণ্ড।

সেজন্য আমি বলি পশ্চিম থেকে এলেও আমরা সত্যগ্রহণে ইতস্তত করব না। তা না করলে আমাদের সভ্যতা একদেশদর্শী হয়ে যাবে, জড় হয়ে থাকবে। বিজ্ঞান আমাদের যুক্তির ক্ষমতা দেয়, আমাদের আদর্শের মূল্য নিরূপণে সাহায্য করে। পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি কোন ঘৃণা প্রদর্শন না করে কৃতজ্ঞচিত্তে তার সজীব মনকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমী মানুষেরও আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন কারণ আমাদের ভাগ্য এখন জড়িয়ে গিয়েছে।

আজ কোন একটি জাতি অন্যদের তার সীমানার বাইরে রেখে অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। পশ্চিমের যা কিছু উত্তম আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে তবে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে নয়, প্রতিহিংসা বা ঘৃণার ভাব নিয়ে নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা নিয়েই তা করতে হবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী এই সহযোগিতার আদর্শ নিয়েই মানুষের আত্মিক ঐক্য স্থাপনে আগ্রহী। প্রাচীনকালে আমাদের দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল এখনো যদি তার কিছু অবশেষ থাকে তাহলে আমি আমার ভাই বোনদের কাছে এই ঐক্য গড়ে তুলতে আহ্বান করি।" (Talks in China)

কবির এই ভাষণের নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর আগে সাংহাইতে জাপানীদের সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাও এই সুরে বাঁধা ছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, "যুব চীন পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। পেকিঙের এই প্রথম ভাষণ শুনিয়া তাহাদের ধারণা হইল ভারতীয় কবি প্রতিক্রিয়াপন্থী, তিনি প্রাচীনের জয়গৌরবে আত্মহারা, আধুনিক এশিয়ার নবজাগরণ আন্দোলন তাঁহার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইবে। নবীন চীনের একদল যুবক ভারতের পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের ন্যায়ই পশ্চিমমুখী—প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল কিছুরই জয়গানে মুখর ও পশ্চিমকে অনুকরণের জন্য উদগ্রীব।

যুবকরা বক্তৃতা সভার পূর্বে ছোট বিজ্ঞাপনীতে তাহাদের তরফের কথা ও যুক্তি লিখিয়া প্রচার করিত। তাহারা বলিত রবীন্দ্রনাথ তাহাদের পূজনীয় অতিথি, কিন্তু তাঁহার মত তাহারা গ্রহণ করিতে অপারগ। আশ্চর্যের বিষয় কোনো সভায় তাহারা কোনো প্রকার রূঢ় ব্যবহার করে নাই।"

পেইচিঙ ডেইলি নিউজ (২৬ এপ্রিল) এই ভাষণের পরে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে লিখেছিলেন, "But we must not misinterpret Sir Tagore. His criticism of Western civilization is not based on pure bias ... He has seen Europe with his own eyes ... He found that East and West has mush in common in spite of all the materialistic divergences. It was then that he came to see the possibility of a union of minds upon which depends the hope of a better and more peaceful world. ...This is a moment when acute materialism needs to be supplemented by the merits of Oriental culture. It is exactly in this respect that sir Tagore is the man of the hour."

Peking Leader (27th April) এবং Far Eastern Times (1st May) পত্রিকায়ও এই সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নতুন কোন বক্তব্য নেই।

২৫শে এপ্রিল বিকেলে চীনের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভ্রান্ত জনা পঞ্চাশেক মানুষ ভারতীয় কবিকে রাজকীয় Throne Hall-এ বিশেষ সম্বর্ধনা জানান। এখানে আগে চীন সম্রাটরা বিদেশী দূতদের সম্মান জানাতেন।

রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে 'বক্তৃতা সভা' বা চিয়াঙ ভুয়েশে'র সভাপতি চীনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী ও সমাজ-সংস্কারক লিয়াঙ-ছি-ছাও (১৮৭৩-১৯২৯) পেইচিঙবাসীদের পক্ষ থেকে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করে কবিকে স্বাগত জানান। লিয়াঙের এই বক্তৃতাটি পরে রবীন্দ্রনাথের Talks in China গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৯৮ সালে এই লিয়াঙ-ছি-ছাও তাঁর গুরু কাঙ ইউওয়েই-র সঙ্গে 'শতদিবস সংস্কার' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯০২ সালে তিনিই প্রথম কার্ল মার্কসের উল্লেখ করেন, ফরাসী বিপ্লব ও রুশোর চিন্তাধারা নিয়ে প্রবন্ধ

লেখেন। ১৯১৬ সালে ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রপতি যু় য়ান শিকাই-এর তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তরুণ মাওৎসে-তুঙ এঁর লেখা থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। চীন সাধারণতন্ত্রে ইনি মন্ত্রী ছিলেন, ১৯১৯-এ চীনের প্রতিনিধি হিসেবে প্যারিসে শান্তিচুক্তি আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন কবি এবং চীনের নতুন সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ।

মিঃ লিয়াঙ রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় ঋষি এবং কবি-দার্শনিক বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, মহান ব্যক্তিত্ব সাগরের মণির মত বিভিন্ন দর্শকের কাছে বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্য বিতরণ করে। তিনি ঐতিহাসিক এবং বৌদ্ধ হিসেবে তাঁর ধারণা বললেন :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে পরিভ্রমণ করেছেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই তিনি অসাধারণ অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। চিয়েন-মেন স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছলে যে অভ্যর্থনা লাভ করেছেন কোন বিদেশী অতিথিকে এর আগে এমন অভ্যর্থনা জানান হয় নি।

ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকদের অর্থহীন বীরপূজার মত আমরা চীনারা মামুলি বীরপূজা করি না। তবে আমরা সকলে একটি কথা স্বীকার করি, সেটা হোল, তিনি আমাদের নিকটতম এবং প্রিয়তম ভ্রাতা ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। ভারতবর্ষ যে আমাদের ভাইদের দেশ সেটা কেবল অতিথির কাছে সৌজন্যমূলক কথা নয়, এর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

প্রাচীনকালে চীন যোগাযোগের কোন সুযোগই পায়নি। ভূমধ্যসাগরের তীরে, পূর্ব এবং দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বর্বর জাতি অধ্যুষিত ছিল। আমরা পূর্ব এশিয়ার এক বদ্ধ কোণে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। পশ্চিমে এবং উত্তরেও যে বর্বর এবং তাতার জাতি বাস করত তারা কেবল আমাদের ধ্বংস করতে এবং ভয় দেখাতেই ব্যস্ত থাকত। বিস্তির্ণ সীমান্ত দিয়ে ঘেরা আমাদের এই দেশে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক কষ্ট করে যে সংস্কৃতি তৈরি করেছিল তা অসাধারণ হলেও একপেশে এবং রক্ষণশীল।

কিন্তু আমাদের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের বাইরেও একটি মহান এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ ভারতবর্ষ আছে। ভৌগোলিক এবং চারিত্রিক দিক থেকে ভারত এবং চীন দুই দেশ ভ্রাতার মত। অধিকাংশ সভ্য জাতি সক্রিয় হওয়ার আগেই আমরা দুই ভ্রাতা মানব জাতির নানা সমস্যা নিয়ে ভাবনা শুরু করেছি, মানবিকতার ক্ষেত্রে আমরা অনেক অগ্রগতি লাভ করেছি। ভারতবর্ষ ছিল আমাদের আগে আর আমরা ছোট ভাইয়ের মতো ছিলাম পিছনে। কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ। আমাদের মধ্যে আছে বিরাট এক অনুর্বর মরুভূমি এবং দুটি নিষ্ঠুর তুষার শৃঙ্গ। এই প্রকৃতিই আমাদের পৃথক করে রেখেছিল। দুই হাজার বছর আগে আমরা জানতে পারলাম পৃথিবীতে উত্তরে আমাদের একটি বড় ভ্রাতা আছে।

ভারতীয় ইতিহাস অনুযায়ী রাজা অশোকই প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক দূত পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত তাদেরই কেউ কেউ চীন পর্যন্ত এসেছিলেন। আমাদের

ঐতিহ্য বলে যিনি গ্রেট ওয়াল তৈরি করেছিলেন সেই বিখ্যাত চিনৎসে হুয়াঙ (Chin Sze Huang) এর সময়ে দশজনের বেশি হিন্দু ছিল যাদের বন্দী করে হত্যা করা হয়েছিল। অশোক এবং চিনৎসে হুয়াঙ সমকালীন ছিলেন সেজন্য এই কথা সত্য হতেও পারে। কিন্তু এই অর্ধ সত্য গল্প নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

আমরা ঐতিহাসিকরা বলতে পারি খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল। Han Yung Tsin-এর দশম বৎসর থেকে Tang Chen yuan (৬৭-৭৮৯ খ্রিঃ) এর পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত মোটামুটি আট শ বছর ধরে ২৪ জন হিন্দু পণ্ডিত চীনে এসেছিলেন। এর সঙ্গে কাশ্মীর থেকে (কাশ্মীরকে তখন ভারতের অংশ বলে গণ্য করা হোত না) ১৩ জনকে ধরলে মোট ৩৭ জন চীনে এসেছিল। Tsin থেকে Tang রাজবংশে (২৬৫-৭৯০ খ্রিঃ) পর্যন্ত ১৮৭ জন যার মধ্যে ১০৫ জনের আমরা নাম করতে পারি ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ধর্ম-রক্ষ (Tamolosa) বুদ্ধ ভদ্র (Chu Shien) এবং জিনভদ্র (Chen Ti) আর চীনা থেকে যারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ফা-হিয়েন, যুয়ান চুয়াঙ বা হিউয়েন সাং (Yuang Chuang) এবং ই সিঙ (I Tsing).

সাত আটশ বৎসর আমরা স্নেহবৎসল ভ্রাতার মত একে অন্যকে শ্রদ্ধা করে বাস করেছি।

সাম্প্রতিককালে আমরা কিছু সভ্যদেশের সংস্পর্শে এসেছি। তারা আমাদের দেশে এসেছে আমাদের ভূমি এবং ধর্ম গ্রহণ করতে, কারখানা তৈরি করে আমাদের লোককে তাদের শিল্প থেকে বঞ্চিত করতে। কিন্তু আমরা দুই ভ্রাতা পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়েই বাস করেছি। আমরা চীনারা আমাদের বড় ভাই ভারতবাসীর কাছে নেতৃত্ব এবং নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেছি। আমরা কেউই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে আগ্রহী হইনি।

আমাদের সেই ঘনিষ্ঠতার সময়ে বড় ভাইকে দেওয়ার মত আমাদের কিছু ছিল না। আমরা যে অমূল্য দান গ্রহণ করেছি তা কখনও ভুলতে পারি না। আমরা কি কি পেয়েছি :

১। ভারতবর্ষ আমাদের শিখিয়েছে পরম মুক্তির কথা। যে আধ্যাত্মিক মুক্তি পার্থিব অস্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে, অতীতের এবং বর্তমানের বিশেষ সংস্কারের ঊর্ধ্বে যে মানস মুক্তি সেই মুক্তির কথা।

২। ভারতবর্ষ আমাদের শিখিয়েছে পরম প্রীতির কথা। যে প্রীতি সব হিংসা ক্রোধ ঘৃণার ঊর্ধ্বে সব প্রাণীকে ভালবাসতে শেখায়। সাত হাজার খণ্ডের মধ্যে যে বৌদ্ধ শিক্ষার কথা আছে তাকে এক কথায় বলা যায় সহানুভূতি এবং বুদ্ধির চর্চার দ্বারা জ্ঞানের মাধ্যমে পরম মুক্তি এবং করুণার মাধ্যমে মহান প্রীতি। (To cultivate sympathy and intellect, in order to attain absolute freedom through wisdom, and absolute love through pity.)

৩। আমাদের বড় ভাইয়ের আরও কিছু দেবার ছিল। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে

অমূল্য সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। প্রথম এগুলো এসেছিল Si Yu-র মাধ্যমে এবং তারপর ভারতীয় ঋষিদের মাধ্যমে যারা চীনে আসার সময়ে আমাদের সম্রাটের জন্য তাদের চিত্র, ভাস্কর্য এবং গ্রন্থ উপহার হিসেবে নিয়ে আসত। তৃতীয়ত, চীনের পণ্ডিতেরা ভারত থেকে ফেরার সময় এগুলো নিয়ে আসত। সর্বশেষে আমরা ভারতীয় জ্ঞানের ক্লাসিকস এবং শিল্প পেয়েছি অনুবাদের মাধ্যমে।

৪। ছোটখাট দানের মধ্যে আমি শুধু নীচের কয়েকটা উল্লেখ করছি :

সঙ্গীত : এটা এসেছিল Siyu-র মাধ্যমে পরোক্ষভাবে। আমরা জানি না আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত কেমন ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ রাজবংশের পরে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে হয়ত আমাদের কিছু ছিল কিন্তু উত্তরে সি উই যা নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে চীনের সঙ্গীত মিলে গিয়েছিল। আজ আমাদের কাছে তার কোন প্রমাণ নেই, যা কিছু আছে তা রক্ষিত আছে জাপানের রাজকীয় প্রাসাদে। আমাদের সঙ্গীতের যা কিছু সৌন্দর্য সম্ভবত তা চীন এবং ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণে।

স্থাপত্য : চীন ভারতীয় স্থাপত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। লো ইয়াঙের চা লান মন্দির না থাকলেও এখনো যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় তার থেকে অতীত গৌরবের নিদর্শন পাই। প্যাগোডার মূল রীতি ভারতীয়। ভারতীয় প্রভাবের পূর্বে এমনি ধরনের আমাদের কিছু ছিল না। হাঙ চৌ-র ওয়েস্ট লেক লুয়েইফঙ (Luei Fong-Thunder peak) এবং চমৎকার পাও সু প্যাগোডাকে বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না। What charm would be in the city of Pian Liang, if it were not for the presence of the iron pagoda and the pagoda Tan Tai (House of Abundance)? The oldest piece of architecture in Peking is the pagoda in front of the temple Tien Nien (Heavenly place) built at the end of the 6th Century A. D. What beauty of harmony does the island of Chung Hua (Fairy flower) in Pie Hei, reveal with the white pagoda on its peak and the long Nerandah below, which the combination of Chinese and Indian architecture alone could have achieved! These as elsewhere we see the wonderful interplay of these two cultures.

চিত্রকলা : আমাদের প্রাচীনকালের চিত্রকলা বিলুপ্ত। Wu Liang Tsze এবং Foh Siang Shien-এর স্তম্ভ চিত্রকলা যা পাথরের ফলক বা পাথরের inscriptions থেকে পাওয়া যায় তার মধ্যেই আমরা প্রাচীনকালের চিত্রকলার চমৎকার সাফল্যের পরিচয় পাই। আমাদের প্রাচীনকালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন Kou Tan Wei এবং Kou Hu To. বুদ্ধের চিত্রকলার জন্য তারা বিখ্যাত ছিলেন। বিখ্যাত বুদ্ধের ছায়া চিত্র যা Lo San-এ পাওয়া যায় সেটাই চীনের প্রথম তৈল চিত্র। Wang Wei এবং Wu Tao Tsze যে চিত্রকলা সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে বৌদ্ধচিত্রই অধিকাংশ। পূর্ব চীন রাজবংশ থেকে তাঙ রাজবংশ পর্যন্ত ভারত ও চীনের মধ্যে অবিরাম যোগাযোগ ছিল এবং তখন

অসংখ্য ভারতীয় চিত্রের পরিচয়ের বড় প্রভাব ছিল চীনের চিত্রকলার উপরে। ভারতীয় প্রভাবেই চীনের চিত্রকলার ভিত্তি বলা যায়। উত্তর সুঙ রাজবংশ থেকে আমাদের চিত্রশিল্পীদের রয়াল একাডেমি চলে আসছে তারাই চীনের চিত্রকলার ক্লাসিক্যাল রীতির প্রবর্তন করেছিলেন।

ভাস্কর্য : প্রাচীনকালে পাথরের উপর আমাদের খোদাই কার্য থাকলেও বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের পূর্বে আমাদের ভাস্কর্যে three dimension ছিল না। Tsin রাজবংশের Tai An Tao একজন চিত্রকর, সাহিত্যিক এবং ভাস্কর ছিলেন। তিনি এবং তার ভাই মিলে তখনকার দিনে বিরাট বুদ্ধমূর্তি তৈরী করেছিলেন। Sui Tang এবং ছয় রাজবংশের সময়ে আমাদের বিখ্যাত ভাস্কর্য ছিল। কিন্তু পরে গৃহযুদ্ধের সময়ে এবং বুদ্ধ ধর্ম বিরোধী তিন সম্রাটের দ্বারা সেগুলো সব ধ্বংস হয়েছে। আমাদের এখন Wei এবং Tsi রাজবংশের সময়কার পাথরের ভাস্কর্যের তিন চার হাজার নিদর্শন আছে Lo Young এবং Lung Men এ। কিন্তু Yung kuang, Ta Tung এবং Shensi-তে প্রায় হাজার হাজার বিভিন্ন মূর্তি আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এগুলোকে বলা হয় গ্রীক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে আফগানিস্তানের গান্ধার রীতি। প্রসঙ্গত আমরা কাকেমনো Kakemono চিত্রকলার উল্লেখ করতে পারি যার মূল ভারতীয়। হিউয়েন সাঙ ভারত থেকে আসার সময় অনেকগুলো কাকেমনো নিয়ে এসেছিলেন।

নাটক : আমাদের প্রাচীনতম অপেরাধর্মী নাটক হল Pu Tou। আধুনিক গবেষণায় জানা যায় এর উৎপত্তি Ta Tung থেকে দশ হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ ভারতের কাছাকাছি কোন দেশ Pato থেকে। এর কাহিনী হল পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পাহাড়ে বাঘের মুখে একজনের মৃত্যু হয়। আবেগময়ী গান এবং নাচের মধ্যে দিয়ে নায়ক তার অনুভব প্রকাশ করেন। লিয়ান লিং ওয়াঙ, লিয়ান লিঙের রাজা এবং তাও ইয়াও নিয়াঙ প্রভৃতি পরবর্তী নাটক Pu Tou-এর মত। যদি এটা সত্য হয় তা হলে আমরা নাটকের ক্ষেত্রেও ভারতের কাছে ঋণী।

আমাদের মাঙ ও ড্রাগন যা প্রাচীনতম নাটক বলা হয় তা সম্ভবত কিছু বাদুবিদ্যা এবং কৌশল মাত্র। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে নাটক বলা যায় না। প্রাচীনকালে নাচ গান ছিল কিন্তু ওয়েই রাজবংশের আগে তা নাটকে রূপলাভ করেনি।

কবিতা এবং কথাসাহিত্য : কবিতা এবং কথাসাহিত্যে ভারতের প্রভাব আছে; কথাটা শুনতে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু দুটি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ অশ্বঘোষের শাক্যমুনির জীবন (Fun Pen Shen Tsai) এবং ভারতীয় কবি মা মিঙের (যার ভারতীয় নাম জানা যায় না) মহাযান সূত্র (Ta Shen Chung Yen Tsin) আমাদের সাহিত্যে নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করেছে। Our original poetry from the Book of odes to the five syllable lines of Han and Wei included only short persoal lyrics. ছয় রাজবংশের আগে আমাদের কোন আখ্যানধর্মী কবিতা ছিল না। এখন চারশতেও পদো পাওয়া গেলেও তখন Kung Chou Tung Nan Fe and Mou

Lan, Fun Pen Shin A Sai-র কবিতার মত প্রথমে ছিল একটি দীর্ঘ জীবনীমূলক কবিতা। এদের উপরে হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল। হিন্দু সাহিত্যের বিশাল কল্পনা এবং সমৃদ্ধ আবেগ চীনা কবিদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। আমাদের উপন্যাস যে মহাযান অনুবাদের প্রভাবে হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। Tsin থেকে Tang যুগ পর্যন্ত আমাদের কাহিনী অনুরূপ ভাবে গড়ে উঠেছে। যথার্থ বলতে গেলে Sung যুগের আগে আমাদের উপন্যাস শুরু হয় নি। Hua Yuan এবং Pan Chi গ্রন্থ আমাদের উপন্যাসে লেখা হয়েছিল।

জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্জিকা : বিজ্ঞানের এই বিশেষ বিভাগের চর্চা বহু প্রাচীনকালে চীনে হয়েছিল কিন্তু তাঙ যুগে এর যে বিকাশ হয় তাতে Ju Tehu Sie-এর প্রকাশে ভারতের স্পষ্ট প্রভাব আছে।

চিকিৎসা : চীনের এটা মৌলিক বিদ্যা হলেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পরে এ সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। Suey-এর ইতিহাস এবং Tang যুগের শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

লিপি : চীনের ভাষা স্বভাবতই চিত্রধর্মী এবং এতে বিরাট অসুবিধে। বুদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয়ের পরে ভারতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের অসুবিধে দূর করার জন্য লিপি প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিল। যদিও সেই চেষ্টা প্রাথমিক এবং সন্তোষজনক নয় তবু এই সম্পর্কে আরও চর্চা করার বহু উপাদান জুগিয়েছে।

সাহিত্য রীতি : প্রাচীন চীনা পুস্তকে বিন্যাসের সুষমা এবং প্রকাশের স্পষ্টতা ছিল না। বৌদ্ধ ক্লাসিক গ্রন্থ আসার পরে ভাব প্রকাশে স্বচ্ছতা এবং যুক্তি দেখা দিয়েছে। ভারতীয় হেতুবিদ্যা এবং তাদের বিন্যাস প্রণালী চীনের লেখায় এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছিল। ইউয়ান চুয়াঙ এই নতুন বিজ্ঞানে একজন পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা এক নতুন স্কুলের সৃষ্টি করল যা বৌদ্ধদের ধ্যান প্রথার চেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত।

শিক্ষা প্রণালী : প্রাচীনকালে চীনে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হোত সেটা কেউ বলতে পারে না। তবে কনফুসিয়াস এবং মেনসিয়াস তাদের বাণী প্রচারের জন্য বড় সভা বা বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। প্রত্যক্ষ বক্তৃতা দেওয়ার যে রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত তা এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। তাঙ রাজবংশে যে সব পণ্ডিতেরা খ্যাত হয়েছিলেন তার মূলে ছিলেন বৌদ্ধ। চীনের শিক্ষার ইতিহাসে এই শিক্ষাদান প্রথার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সামাজিক সংগঠন : চীনের সমাজ হল পরিবারভিত্তিক। সামাজিক বিভিন্ন সংগঠন পারিবারিক নানা প্রকাশ মাত্র। চীনে বুদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হওয়ার পরে পরিবারের বাইরে ধর্মীয় এবং পণ্ডিতদের জন্য নানা জন-সমিতি গড়ে ওঠে। এগুলোর এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে সরকারও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। আজ পর্যন্ত Pu To দ্বীপে

বিহার ব্যবস্থার এমন ব্যবস্থা আছে যে একে এক বিশিষ্ট সাম্যবাদী প্রকৃতির সমাজভিত্তি বলা যায়।

আমি উপরে যা বললাম তা হচ্ছে বৌদ্ধ উত্তরাধিকারের প্রধান উপাদান। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমরা তাকে সৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছি। ভারতীয় চিন্তার সামগ্রিকভাবেই আত্মীকরণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সম্বর্ধনার উত্তরে সংক্ষেপে হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বললেন পূর্বে ভারত থেকে বহু মহান পুরুষ এসেছে আমি এসেছি বর্তমান যুগের দূত হিসাবে। Talks in China গ্রন্থে এই ভাষণটি নেই। তবে এই প্রকার ভাষণ তিনি পরে অন্যত্র দিয়েছেন।

২৬শে এপ্রিল পেইচিঙের সরকারী কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র ন্যাশনাল নর্মাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথকে এক সম্বর্ধনা জানায়। এই সভায় মিঃ লিয়াঙ গতকালের ভাষণেরই পুনরাবৃত্তি করলেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক ঘণ্টা দেরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এই সভায় রবীন্দ্রনাথ বললেন হিংসার মাধ্যমে যে লাভ পাওয়া যায় তা সাময়িক কিন্তু অনিবার্যভাবে এটা একটা জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। শক্তির উপর অধিক নির্ভরশীলতা বর্বরতারই লক্ষণ।

ছাত্রদের কাছে এই বক্তৃতা অনলে পেইচিঙের জনসাধারণের কাছে এটা রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমি যখন চীনে আসার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি তখন আমি জানতাম না আপনারা সকলে ভারতবর্ষ থেকে একজন মানুষকে চেয়েছেন কিনা। আমি শুনেছি আমার আসা সম্পর্কে আপনাদেরই কিছু বিরোধিতা ছিল; কারণ, তাতে আপনাদের পাশ্চাত্য অগ্রগতি এবং শক্তি সম্পর্কে আধুনিক উৎসাহে বাধা পড়তে পারে। সত্যি যদি আপনারা এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এমন একজন মানুষকে চেয়েছেন তাহলে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভুল করেছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের ইতিমধ্যে দশহাজার সক্ষম শিক্ষক আছেন। আমি তাতে কোন সাহায্য করতে পারব না।

আমি সাবধান বাণী করতে পারি, যারা কেবল বস্তুগত শক্তির দ্বারা একটি শক্তিশালী জাতি গড়তে চায় তারা ইতিহাস জানে না, সভ্যতাকেও উপলব্ধি করেনি। শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বর্বরতার লক্ষণ। যে জাতি তার উপর নির্ভর করেছিল তারা ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কিংবা বর্বর রয়ে গিয়েছে।

অন্য জাতিগুলি শারীরিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির যোগ করে আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছে। আমরা বিজ্ঞান এবং বস্তুগত অগ্রগতিকে অস্বীকার করতে পারি না তবু এরাই জাতিকে মহান করতে পারে না।

সহযোগিতা, মৈত্রি, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সাহায্য সভ্যতার যথার্থ শক্তি এবং অগ্রগতি ঘটাতে পারে। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আয়ত্ত করার জন্য নতুন আত্মিক

এবং নৈতিক শক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাতে যন্ত্র বা অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নইলে এরাই আধিপত্য করবে এবং তাদের ধ্বংস করবে।

বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বিশাল যান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মানুষ তার মানবিকতা এবং জীবনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বর্তমানে সভ্য জগতে যে বিশাল শক্তি এবং বুদ্ধির বিকাশ দেখি তা আসলে নরমাংসভক্ষণ প্রথা। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মানুষের আত্মার বিকাশের সহায়তা না করে তাকে অধিগত করে রেখেছে। সেজন্য বিজ্ঞানের জগৎ নৈর্ব্যক্তিক শক্তির জগতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অনেকে চীন এবং ভারতবর্ষের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে বলবেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে শক্তি এবং অগ্রগতির উপরে জোর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি আমার দেশের মহানদের ভাষায় বলতে পারি, অন্যায়ের দ্বারা মানুষ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, অন্যায়ের দ্বারা শত্রুকে জয় করা যায়, অন্যায়ের দ্বারা মানুষ ঈপ্সিতকে লাভ করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সমূলে ধ্বংস হয়।

আমরা সভ্যতার ইতিহাসে দেখি কূটনীতি এবং অস্ত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মিথ্যা ক্ষণিকের জন্য কৃতকার্য হতে পারে কিন্তু প্রকৃত জীবনের মূলেই মৃত্যু ঘটে।

আপনারা আজকের সমৃদ্ধি ও শক্তির উপর ভরসা রাখতে পারেন কিন্তু আগামীকাল আছে। মিথ্যা এবং অত্যাচারে এই বর্তমান পরিপূর্ণ, এটা নিরুজ্জ্বল। আমি এই বর্তমানকে অস্বীকার করি, সে যেন আমার উপর আধিপত্য না করে। আমি শান্তি ও বিশ্বাসের, ভবিষ্যতের উপর ভরসা রাখি। আত্মার বিশ্বাস করা ছাড়া আমি এর কোন প্রমাণ দিতে পারব না। শহীদের দুঃখ যন্ত্রণা, অপমান এবং বিড়ম্বনার মধ্যেও শান্তি, প্রেম, দয়া এবং আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রাখব।

আমি একটি অগ্রগতিতে পিছিয়ে পড়া জাতির সদস্য হিসেবে বলতে পারি, আমি সকল অবমাননা এবং দৈহিক পীড়ন সহ্য করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমার বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য হারিয়ে যেতে পারে এমন অবমাননা এবং পরাজয় আমি কখনো স্বীকার করব না।

আমার শত্রু আমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা আমাকে তাদের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারবে না। শয়তান যেখানে প্রভু সেখানে সে সাহায্য করতে পারে কিন্তু আমরা যদি জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই তাহলে সেই সাহায্য অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করব। সাফল্য না এলেও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করবেন না।

তথ্যের প্রমাণ না থাকলেও আমি এটা বিশ্বাস করি। তথ্য আপনাকে সংখ্যার দ্বারা বিপথগামী করতে পারে কিন্তু ব্যক্তিত্বের জগৎ তথ্যকে অতিক্রম করে যায়। সত্য আসে উপর থেকে, অনন্ত সম্পর্কে সে সচেতন, সে সৃজনশীল, যে সব মহান পুরুষ এই সত্যের বাণী শুনিয়েছেন আমরা তাদের অনুসরণ করেছি। বর্তমানে সভ্যতার আবরণে

লালসা এবং নরমাংসভক্ষণকারী প্রথার বিরুদ্ধে যেন বারবার শুনতে পাই ঃ

অন্যায়ের দ্বারা মানুষ কৃতকার্য হতে পারে, অন্যায়ের দ্বারা মানুষ শত্রু জয় করতে পারে, ইচ্ছাপূরণ করতে পারে কিন্তু তারা সমূলে ধ্বংস হয়।" (Talks in China)

কবি সেদিন কথাবার্তা বলেন ঘরোয়াভাবে। এর ফল ভালই হয়েছিল। এ সম্পর্কে এলমহার্স্ট লিখেছেন, "The scholars and literary men of the Renaissance movement in Peking were a little sceptical about the poet's philosophy and were not quite sure whether in his enthusiasm for old China he would not be somewhat of a reactionary. His first talk to them has completely won their hearts and minds. They found that he had all the time been as much of a revolutionary in the field of letters as any of them."

২৬শে এপ্রিল বিকেলে ইয়ং মেনস বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন একটি সভার আয়োজন করেছিল। তারা বৌদ্ধ সভ্যতার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছেন, "Now you–the great Buddhist poet–come from the original country of the Buddha to our sister-country with your milk of thought; surely as a result we realise your flowerly givings all world round where your elephant like steps reach; and therefore we are greatly glad for this...you–as a star of great love, perfect gladness; unlimited goodness and continuous newness as well as a representative of the Buddhist civilisation–may kindly accept our request as we think."

পেইচিং শহরের এই বৌদ্ধ মন্দির মহাযান বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় মন্দির। এখানে হাজার বছরের উপরে তাঙ রাজত্বের অনেক স্মৃতি আছে। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ছাত্রদের এই আন্তরিক আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে তাঁর ভাষণে বললেন,

"অতি দূর শতাব্দীর অনেক জিনিষ ভারতবর্ষে আছে যা প্রবহমান হলেও প্রকৃত মৃত। এখানে পুরানো ভারতের কিছু এখনো বেঁচে আছে। জীবনের যে স্রোত একটি পাহাড় মরুভূমি ডিঙিয়ে এখানে এসেছিল এবং তোমাদের হৃদয়কে উর্বর করেছিল আমি এখনো তার স্পর্শ অনুভব করি। চিরস্থায়ী জীবনের সেই স্রোতধারা এখনো বয়ে চলেছে, সেই জ্ঞান কাল এবং জীর্ণতাকে অতিক্রম করে শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

আমরা যারা উত্তর পুরুষ তারা আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠি। আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা যে দেশকে ভালবেসেছিল এবং যাকে এত সাহায্য করেছিল সেখানে এসেছি সেজন্য তাদের আত্মা নিশ্চয়ই খুশী। আমরাও সেই শান্তি এবং প্রেমের পথে এসেছি। আজ যখন মানবজাতি যুধ্যমান তখন তাদের আত্মা আমাদের এই সংঘর্ষ এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যেও অনুপ্রাণিত করে। আশা করি প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ আমাদের গতিপথে শক্তিদান করবে।

এই দেশে যখন আমি বিদেশী এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভোজন করি তখন আমি

এখানে দীর্ঘকাল বসবাসকারী আমার প্রতিবেশীর সঙ্গ লাভ করি। সে যখন আমাকে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার কথা বলতে দেখে তখন সে মনে করে আমি যে ভূমি তৈরী করে গিয়েছি সেখানেই এ বীজ বুনতে এসেছে। আমিও নিশ্চিত মনে বলি ভারতবর্ষ থেকে যে আন্তরিক শান্তি ও প্রেমের বার্তা এসেছিল তা গ্রহণ করতে চীন এখনো প্রস্তুত।

পূর্বপুরুষদের মতো আমার কণ্ঠস্বর নেই। এই বার্তাকে বলপ্রসূ করে তোলার জন্য আমার জীবনে সেই সার্থকতা আসে নি। তবু আমি তাদের সন্ততি হিসেবে আমার পূর্বপুরুষদের মিশনকে বহন করে নেবার গুরুদায়িত্ব অনুভব করি এবং তা সকল মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাই।

আপনারা আমাকে যে স্বাগত জানিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত...এটা কোন ব্যক্তিকে নয়, হাজার হাজার বছর আগে যে বার্তা এসেছিল তার দূতকে। আমার বাজকে বলপ্রসূ করতে আমি কোন অসুবিধে বোধ করি না বরং সানন্দ প্রত্যাশা নিয়ে আমি আপনাদের সাহায্য, সহানুভূতি এবং উপলব্ধি দাবী করি।

চীন দেশে কেউ এসেছে বাণিজ্য করতে, লাভ করতে; তারা সর্বত্র আপনাদের বাজারে ভীড় করেছে। আমরা যারা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি তারাও আপনাদের দেশ থেকে কিছু নিতে চাই, তবে তা কোন বাজার পণ্য নয়, বরং বহু শতাব্দী পূর্বে যে প্রেম, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বীজ বপন করা হয়েছিল তার কিছু ফল নিয়ে যেতে।

ফসল পেকে গিয়েছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত বিশ্বের কাছে তা নিয়ে যেতে হবে। তাদের পক্ষে এটা একান্ত আবশ্যক। আপনাদের প্রাণে যে শান্তি আছে, প্রতিদিন যে প্রেমে আপনারা ধনী হচ্ছেন তা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। সমস্ত বিশ্ব তাই দাবী করছে।" (Talks in China)

২৭শে এপ্রিল কবি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চীনের নির্বাসিত মাঞ্চু সম্রাট ও তাঁর পত্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। চীন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হবার পর (১৯১২) মাঞ্চু সম্রাট ও তাঁর পত্নীরা প্রাসাদ এবং সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন, বাইরের সঙ্গে তাদের কোন যোগ রাখতে দেওয়া হোত না। চীনা সম্রাটের প্রাসাদ একটি পল্লীর ন্যায়। প্রধান দ্বার থেকে ভেতরে যেতে প্রায় এক ঘন্টার সময় লাগে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের 'জনমান চীন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথ মাঞ্চু সম্রাজ্ঞীদের জন্য বাংলাদেশের শাঁখের চুড়ি উপহার দিলেন। এলমহার্স্ট কবির ইংরেজি গ্রন্থ ও নন্দলাল বসু কয়েকখানি 'চিত্র' উপহার দিলেন। সম্রাট কবিকে একটি মহামূল্যবান পাথরের বুদ্ধমূর্তি উপঢৌকন দেন।

এর আগে সম্রাট একমাত্র ডঃ হু শি ছাড়া আর কাউকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে পাঠান নি। হু শি কে বলা হয় আধুনিক চীনা কবিতার জনক। তিনি যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছাত্র তখনই 'নতুন যৌবন' পত্রিকায় চীনা সাহিত্য সংস্কার সম্বন্ধে একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ পাঠান। তা নিয়ে দেশব্যাপী বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দেশে

ফিরে তিনি পেইচিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপনা করেন। কনফুশিয়াস বিতাড়ন আন্দোলনেও হু শি অগ্রণী ছিলেন।

Peking Leader রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখেছেন, "Ex-emperor Hsuan Tung shattered another precedent on Sunday (27th April) when he received Rabindranath Tagore and his party in the garden of the Imperial Palace." প্রায় আড়াই ঘন্টা প্রাসাদের নানা দর্শনীয় জিনিসপত্র দেখে কবি ফিরে এলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় পেইচিঙের বুদ্ধিজীবীরা কবিকে সংবর্ধনা জানান। লিয়াঙ ছি ছাও-এর এক বন্ধু আর্ট-ক্রিটিক মিঃ লিন্ ছাঙ মিন্ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেন,

'ডঃ টেগোর এবং তাঁর সঙ্গীরা চীনে আসার পর থেকে হার্দিক অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। তাদের সাংহাই, নানচিং এবং পেইচিং-এ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। এই অভ্যর্থনা আমরা হৃদয়ে যা অনুভব করি তার পক্ষে অযথার্থ। অন্য রাত্রে এই ছোট সমাবেশে সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনায় আমি আমাদের আবেগ প্রকাশ করছি মাত্র।

আমরা ডঃ টেগোরকে ঋষি বা আবিষ্কারক বা ধর্মীয় সংস্কারক হিসাবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি না; আমরা তাঁকে একজন কবি, মহৎ কবি এবং বিশ্বকবি হিসেবে অভ্যর্থনা করি। তিনি আমাদের কবিতায় একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করবেন।

এটা দুর্ভাগ্য যে আমরা এই মহান কবির কাব্য মৌলিকভাবে পড়তে পারি না। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজিতে এবং চীনা অনুবাদে পড়েছেন সেটা আরো অযথার্থ। আমরা যদি মূল ভাষায় পড়তে পারতাম তাহলে আমরা আরো বেশি প্রভাব পেতে পারতাম।

চীন একটি প্রাচীন দেশ। বলা যায় একটি সাহিত্যিক দেশ। আমাদের সব প্রকার সাহিত্য থাকলেও তা সীমাবদ্ধ। কবিতার মহৎ উদ্দেশ্য হোল উচ্চতম প্রকাশ। মানব জীবনের আধ্যাত্মিক উৎস থেকে উৎসারিত অনুভূতির সর্বোত্তম প্রকাশ।

আমাদের প্রথম ত্রুটি ভাষা। সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশে তা অসমর্থ। আমাদের অন্য অসুবিধা হোল আমাদের সঙ্গীত প্রায় মৃত শিল্প। আমাদের তৃতীয় অসুবিধা হোল আমাদের কাব্যরীতি। আমাদের কবিতা ছন্দরীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাব্যধারার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশের পরিবর্তে, যুগচিন্তার প্রকাশের পরিবর্তে তা যুগের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।

তাও রাজবংশ থেকে আমাদের কবিরা অত্যন্ত ভীরু এবং ঐতিহ্যবাহী। দাসসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে তারা পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে। আজ সময় এসেছে বিবর্তনের। আমরা অন্যও ভাল কিছু চাই, বিষয়বস্তুতে যা বিপ্লবী এবং নতুন নতুন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ।

কিন্তু আমাদের নতুন যুগও যথেষ্ট সাহসী নয়। সেজন্য আমরা একজন বিপ্লবের কবি, বিপ্লবী কবিকে পেয়ে ভাগ্যবান। তাঁর থেকে আমরা মহৎ অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারব।" (Talks in China)

রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যর্থনার উত্তরে বলেন, "আমরা যখন বিদেশে যাই তখন সেখানকার মানুষের হৃদয়ের প্রাচুর্যের যে উদ্বৃত্ত তা আমরা গ্রহণ করি। যাদের আত্মা দরিদ্র তারা কখনো বিদেশীকে তাদের গৃহে এবং হৃদয়ে আহ্বান করতে পারে না। যারা প্রেমে ধনী তারাই কেবল আশ্রয় দিতে পারে।

আপনাদের প্রাচীন সভ্যতা হৃদয়ের ভূমিকে উর্বর করেছে। এটা যদি প্রধানত মানবিক না হোত তাহলে তা এতদিন টিকতে পারত না।

আরও অনেক সভ্যতা আছে যারা অনেক উন্নত চিন্তা এবং আদর্শের জন্ম দিয়েছে কিন্তু সেগুলো শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে রিক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনাদের সভ্যতা এই মাটির গুণে জীবন বৃক্ষকে সমৃদ্ধ করেছে যা বহু দূর দেশী মানুষকেও ছায়া এবং অন্ন দান করতে পারে। আমি অনুভব করেছি আপনাদের সাহিত্যে এবং অন্যান্য প্রকাশের মধ্যে এই আতিথেয়তাপরায়ণতা রয়েছে। উত্তম এবং উচ্চতম আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে সমাজ এবং আমি এই সমাজের পাত্র থেকে অমৃত পান করেছি। এই কারণে যারা অন্য দেশ থেকে আসে তারা এই প্রাচীন সভ্যতার ভূমিতে এসে নিজ গৃহে অবস্থান বলে মনে করে।

আপনাদের এক কাগজে পড়েছি আপনারা মানবিক। আপনাদের সম্বর্ধনায়ও আমি অনুভব করেছি আপনারা প্রধানতই মানবিক।

আমি আপনাদের কিছু কবিতার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এগুলো আমার জানা অন্য কোন সাহিত্যের মত নয়। এগুলো একান্তই আপনাদের। অবশ্য এ সম্বন্ধে আপনারা আরো ভালো জানেন। তাঁদের সামনে আমি আপনাদের সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে চাই না।

আমি আমাদের দেশের সাহিত্যের সমস্যার কথা বলি। আমরা একটা ক্লাসিকাল সাহিত্যের বজ্র আঁটুনির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সেই প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমরা ভারতের ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যে দেখেছি সেখানে জনগণের মৌলিক ভাষার একটা সমান্তরাল প্রকাশ ছিল। সংস্কৃতের কবি প্রায়ই সেখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। কিন্তু যেহেতু তাদের উপভাষা অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছিল এবং তার কোন লিখিত প্রমাণ ছিল না সেজন্য তাদের অনেক বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা আমাদের প্রাচীন লোকসাহিত্য অনেক নষ্ট করে ফেলেছি।

আমাদের বন্ধু অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এখানে আছেন। তিনি বলতে পারবেন ত্রয়োদশ থেকে ষোল এবং সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগের ভারতীয় কাব্যের কী সৌন্দর্য ছিল। আমি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছি, দেখেছি তাঁরা কত আধুনিক ছিলেন। সব ভাল জিনিসই চির-আধুনিক এবং সেগুলো কখনো সেকেলে হতে পারে না।

আমরা ভারতবর্ষে দেখি একটা গভীর রহস্যময় এবং ধর্মীয় আবেগ মানুষের মনকে

সজীব করে রেখেছে। বস্তুত আমাদের ঋষিরা অনভিজাত এবং নীচ জাতের মানুষদের এক অদ্ভুত সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছেন। তারা একটা স্বর্গীয় অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের হৃদয়কে মুখর করে দিয়ে গিয়েছেন। তখন যে কবিতার জন্ম হয়েছে সেগুলো অনুভবের গভীরতায় এবং জ্ঞান ও আঙ্গিক সৌন্দর্যে অপূর্ব। আমাদের বাঙলাদেশে বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্যে অনুরূপ পুরানো ছন্দের কবিতা আছে।

আমি যখন কবিতা লিখি তখন শিক্ষিত মানুষেরা ইংরেজী সাহিত্য থেকে প্রেরণা নিয়ে লিখতেন। আমার মনে হয় এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি অভিজাত পরিবারে যে ভাবে শিক্ষা লাভ হয় সেভাবে স্কুল কলেজের কোন শিক্ষা পাইনি। স্কুল শিক্ষকের যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি বলে আমি অনুকরণবৃত্তির মধ্যে আটকা পড়িনি। আমার ছন্দ, ভাষা এবং ভাবের মধ্যে একটা অশিক্ষিত গ্রাম্যত্ব ছিল যা শিক্ষিত মানুষেরা তখন খুব সমালোচনা করেছিলেন। আমার অজ্ঞতা এবং বিরুদ্ধ ধর্মমত আমাকে সাহিত্যিক দুর্বৃত্তে পরিণত করেছে।

আমি খুব অল্প বয়সে লেখা আরম্ভ করি। আমি ছিলাম লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে ছোট। আমার কোন পরিণত বুদ্ধি বা অভিজাত ইংরেজী শিক্ষা ছিল না। তবে আমার একটা বিচ্ছিন্নতার স্বাধীনতা ছিল। আমি আমাদের দেশের জল মাটির মত ক্রমশ খ্যাতি এবং নিন্দা পেতে লাগলাম।

বৈষ্ণব কবিতা ছন্দের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ মাধুর্যের অপূর্ব নিদর্শন। বাল্যকালে এর সঙ্গে পরিচয়ই আমাকে দৃঢ়তা দিয়েছে। আমার যখন কবিতা ছাপা হয় তখন আমার বয়স মাত্র ১২। আমি স্বীকার করি, ঐ কবিতাগুলো ছিল প্রেম সম্বন্ধীয় এবং ঐ বয়সের পক্ষে অনুপযুক্ত কিন্তু আমার কল্পনা বৈষ্ণব কবিতার ভাব ভাষা ছন্দের দ্বারা আপ্লুত ছিল।

সাহিত্যে আমার লক্ষ্যহীনতাও ছিল আরেকটা কারণ। আমার পিতা উপনিষদের শিক্ষা অনুযায়ী ছিলেন কট্টর একেশ্বরবাদী, তিনি ছিলেন ধর্মীয় আন্দোলনের নেতা। আমার দেশের মানুষ তাকে খ্রিস্টানের মতই মন্দ বলে ভাবত। সেজন্য আমরা ছিলাম নির্বাসিত। বোধ হয় এটাই আমাকে অতীতের অনুসরণ থেকে রক্ষা করেছে।

আমার পরিবারের অধিকাংশেরই একটা সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল। কেউ ছিলেন শিল্পী, কেউ কবি, কেউ সঙ্গীতজ্ঞ। শৈশবকাল থেকেই আমার প্রবল নিসর্গপ্রীতি ছিল। একই সঙ্গে মানবিক দয়ার প্রতি ছিলাম সংবেদনশীল। এই সব কিছুকে আমি প্রকাশ করতে চাইতাম। অপরিণত হলেও আমার আবেগের আন্তরিকতা সত্য হয়ে প্রকাশিত হত।

তখন থেকে আমি দেশে খ্যাতি অর্জন করলাম অবশ্য একই সঙ্গে আমার কবিতার এক বিরুদ্ধ ধারা ছিল। কে বলত আমার কবিতায় জাতীয় ঐতিহ্য এবং হৃদয়ের সাড়া নেই, কেউ বলত দুর্বোধ্য। কেউ বলত খণ্ডিত। বস্তুত আমি আমার লোকদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় হইনি। এটা আমার পক্ষে আশীর্বাদ হয়েছে। কারণ অবিসংবাদিত সাফল্যের মত উদ্যমহীনতা আর নেই।

এই হচ্ছে আমার ইতিহাস। আমার ভাষায় আমার কাজ যদি ব্যাখ্যা করতে পারতাম তাহলে আরো ভালো হত। কোন একদিন হয়ত তা সম্ভব হবে। তবে ভীষণ হিংসুটে, তারা কখনো বিদেশীর মাধ্যমে নিজের উত্তম সম্পদকে প্রকাশ করে না। কবিতা সোনা বা অন্য কোন মূল্যবান সামগ্রীর মত না যাকে সহজে হস্তান্তর করা যায়। আপনারা এটাকে যত বিশ্বস্তই হউক না কেন তার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রেয়সীর হাসি বা দৃষ্টিকে গ্রহণ করতে পারেন না।

আমি নিজে ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যের সম্পদকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি অনুবাদের মাধ্যমে দান্তে পড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। আমি কিছু জার্মান জানবার চেষ্টা করেছি এবং অনুবাদের মাধ্যমে হাইনে পড়তে গিয়েছিলাম। পরে এক জার্মান মহিলার মাধ্যমে তার সাহায্য নিয়েছিলাম। কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রম করলাম। আমার খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল কিন্তু সেটাই ভাল গুণ নয়। আমি অধ্যবসায়ী ছিলাম না। আমি চট করে কিছু বুঝে ফেলতে পারতাম। আমার শিক্ষক মনে করলেন আমি হয়ত ভাষা শিখে ফেলেছি কিন্তু সেটা সত্য নয়। যাই হোক আমি কোন প্রকারে হাইনে বুঝতে পেরে অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি। আমি গোটে চেষ্টা করলাম কিন্তু যে সামান্য জার্মান শিখেছিলাম তার পক্ষে গোটে শক্ত। কোনোরকমে ফাউস্ট পড়লাম। আসলে আমি প্রাসাদে ঢুকেছিলাম দর্শকের মত কয়েকটি বিশেষ ঘরে, যে দারোয়ানের কাছে সব ঘরের চাবি আছে তার মত নয়।

এটাই হওয়া উচিত। তীর্থ না করে মন্দিরে ঢোকা যায় না। অতএব অনুবাদের মাধ্যমে আমার ভাষার মাধুর্য আপনারা পাবেন না। যথার্থ প্রমাণ না পেয়ে আপনারা ধরে নিয়েছেন আমি একজন কবি। আমি শুনে কৃতার্থ হলাম যে আপনারা ধরে নিয়েছেন যে যেহেতু আমার সুন্দর শুভ্র দাড়ি আছে অতএব আমি একজন কবি। কিন্তু আমার কবিতায় কি আছে যতক্ষণ আপনারা তা না জানতে পারছেন ততক্ষণ আমার তৃপ্তি হবে না।

আশা করি আপনারা একদিন বাঙলা শিখে নেবেন। আমার সামনে বসে যে যুবক নোট নিচ্ছেন তিনি এটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। আমি তাকে আমার ক্লাসে ভর্তি করে নেব এবং আমার যতটা ক্ষমতা তাকে সাহায্য করব। এখন আমাদের শিল্পকলা সম্পর্কে কিছু বলি।

আমার ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ এটা শুরু করেছেন। তবে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধু নন্দলাল একজন বিখ্যাত শিল্পী তিনি আপনাদের আরো ভালো করে বলতে পারবেন কিভাবে তা চারদিকে প্রভাব বিস্তার করছে।

সঙ্গীতের ব্যাপারে আমি অনেক সঙ্গীত রচনা করেছি এবং অনেক অভিজাত গোঁড়ামিকে অস্বীকার করেছি। অনেকে এতে বিরক্ত হয়েছেন। লোকেরা নিন্দা করুক সব সময় শুদ্ধ না হলেও আমি আমার গান করে যাব।

আপনারা ভাববেন না আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি বিনীতভাবেই আমার বাঙলা

বাস্তব বিচার করে তার প্রশংসা ব্যক্ত করতে পারি। যুগে যুগে আমার দেশে ফুলের যেমন কোন অভাব হবে না তেমনি তারা ফুলের সঙ্গে আমার গানও গাইবে। এটাও একজন শিল্পীর কাজ।" (Talks in China)

২৮শে এপ্রিল চীনের 'কৃষি মন্দির' প্রাঙ্গণে প্রায় দশ হাজার শ্রোতার সামনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের আদর্শবাদ সম্পর্কে বলেন,

"এক সময় ছিল যখন এশিয়া পৃথিবীকে বর্বরতা থেকে রক্ষা করেছিল। তারপর আমি জানি না কি ভাবে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দরজার কড়া নাড়ায় আমরা জেগে উঠে দেখলাম ইউরোপ তার শক্তি এবং বুদ্ধির দম্ভ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। পশ্চিম আমাদের কাছে এসেছে তাদের শ্রেষ্ঠ দেবার জন্য; আমাদের শ্রেষ্ঠ নেবার জন্য নয়। আমাদের সম্পদ শোষণ করতে। এমন কি তারা ডাকাতি করে আমাদের ঘরে ঢুকেছে। এ ভাবেই ইউরোপ এশিয়াকে আয়ত্ত করেছে।

আমরাও ইউরোপের কাছে অন্যায় করেছি কারণ আমরা সম্মান নিয়ে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। ফল হয়েছে উচ্চ নীচের সম্পর্ক, একদিকে অবমাননা অন্যদিকে দর্প। আমরা ভিক্ষুকের মত জিনিস গ্রহণ করেছি। আমরা ভেবেছি আমাদের নিজের কিছু নেই। আমরা এখনো আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে ভুগছি। আমরা আমাদের সম্পদ সম্পর্কে সচেতন নই।

আমাদের এই জড়তা কাটিয়ে উঠে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা ভিক্ষুক নই। এটা আমাদের দায়িত্ব। আপনারা ঘরে অমূল্য জিনিসের সন্ধান করুন। তাহলেই আপনারা রক্ষা পাবেন এবং মানবতাকে রক্ষা করতে পারবেন। প্রাচ্যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা উচিত। আমি তা বিশ্বাস করি না। পাশ্চাত্য যা করেছে তা তাদের নিজস্ব। আমরা প্রাচ্যের লোক, পশ্চিমী মন বা মেজাজ ধার করতে পারি না। আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারকে খুঁজে নেব।

শোষণের মধ্য দিয়ে শোষণের ফল ভোগ করে পশ্চিম নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। মানুষের নৈতিক এবং আত্মিক শক্তির উপর বিশ্বাস নিয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। প্রাচ্য আমরা কখনো মৃত্যুর কারবারী সৈন্যাধ্যক্ষ কিংবা মিথ্যার কারবারী কূটনীতিজ্ঞের প্রশংসা করিনি, আমরা করেছি আত্মিক নেতাদের। তাদের মাধ্যমেই আমরা একমাত্র রক্ষা পেতে পারি। শারীরিক শক্তিই চরম শক্তি নয়, ঐ শক্তি নিজেকে ধ্বংস করে। মেশিনগান এবং বোমানিক্ষেপকারী বিমান তাদের নীচে জীবন্ত মানুষকে ধ্বংস করে এবং পশ্চিম নিজেকে ধুলায় নিমজ্জিত করছে। প্রতিযোগিতায়, স্বার্থপরতায়, বর্বরতায় আমরা পশ্চিমকে অনুসরণ করব না।

ক্রমবিকাশের কথা ভাবুন। প্রথমে ভূমি তারপরে জন্তু। প্রথমে অন্ধকার, তারপরে আলো, পরে এল বুদ্ধি এবং শারীরিক জীবনে মনের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করল। তারা তাদের বাহুকে অস্ত্রে সম্প্রসারিত করল এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে জন্তুর প্রভু হল। ক্রমবিকাশ সেখানেই থামে নি। মানুষের মধ্যে আরেকটি প্রবৃত্তি আছে তা হোল লাভ করা নয়, ত্যাগ করা।

ডিমের মধ্যেই মুরগীর ছানার প্রাথমিক ডানা, চোখের দৃষ্টি এবং পা থাকে কিন্তু যতক্ষণ তা খোসার মধ্যে থাকে ততক্ষণ সেগুলো কোন কাজের নয়। আমরাও অনুরূপ এক খোসার মধ্যে। একে ভেঙে ফেললে অনেক ক্ষতি কিন্তু লাভ আরও বেশি। অন্যদিকে ত্যাগের মধ্য দিয়ে আরও বেশি পেতে চাই। মহান হৃদয় মানুষের এটাই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানবিকতায়, আত্মায়। আমরা যখন নিজেদের দান করি তখনই নিজেদের বেশি করে পাই।

মৌমাছিরা মধু জমানোর বাইরে কিছু প্রত্যাশা করে না। মানুষ যার আত্মা আছে সে সব সময় তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করে। সে প্রত্যাশা করে সত্যের, অনন্তের, অসীমের। আমাদের অনন্তর উপর বিশ্বাস আছে, আমরা সেই অনন্তের স্পর্শ পেতে চাই।

তথ্যের সঙ্গে সত্যকে মিশ্রিত করা উচিত নয়। সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তথ্যের নেই। সত্যের আছে আত্মার চিরস্থায়ী আলো। সত্য মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে। না হলে পৃথিবী অনেক আগে অন্ধকারে ডুবে যেত। সৎ, সুন্দর ও প্রেমের সত্যকে লালন করা উচিত।

আপনাদের সামাজিক জীবনে আত্মার উপর বিশ্বাস রেখে আপনাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। শক্তিতে নয়, সত্যের উপর বিশ্বাস রেখেই আপনাদের শত শতাব্দীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। আপনাদের এক মহান অতীত আছে সেজন্য আমি যখন এশিয়ার কথা বলি তখন আপনারা আমার কথা শুনতে এসেছেন। আমি আমার মহাদেশের জন্য গর্বিত। আমাকে আপনারা যে স্বাগত জানিয়েছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"
(Talks in China)

রবীন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তিনি হঠাৎ লক্ষ করেছেন হলে বসেই যুবকরা ছাপানো হ্যান্ডবিল বিলি করছে। মানচিকেও একরকম প্রচারপত্র বিলি হয়েছিল। এলমহার্স্ট ১৭ এপ্রিল তারিখে সাংহাইতে লক্ষ করেছেন যে চারটি বিষয়ে কবির প্রতি বিরোধিতা আছে। এই চারটি বিষয় হোল তিনি শান্তিবাদী, যন্ত্রবিরোধী, আত্মা সম্পর্কে কথা বলেন এবং কমিউনিস্ট নন।

China Illustrated Review (May 3) এই বিরোধিতা সম্পর্কে লিখেছিল : "They claim that he is preaching against the system which the Chinese hold sacred, that he opposes material civilization for China and that he favours the abolition of administration and government, which is tended to hasten China's destruction. Lastly the attack is directed against those scholars who invited Dr. Tagore to come to China to talk to the young men in an attempt to tell them with conservative and backward thoughts."

রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে দুইজন পশ্চিমী পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করেন এবং একদল চীনা চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সেখানে ভারতীয় এবং চীনা শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর জোর দেন।

ৎসিনহুয়া কলেজে

এক সপ্তাহ পেইচিংএ থাকার পর মে মাসের গোড়ায় কবি কয়েকদিনের জন্য Tsin Hua College-এ আতিথ্য গ্রহণ করেন। বক্সার বিদ্রোহের পরে আমেরিকা চীনের কাছ থেকে যে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিল তা দিয়ে তারা পেইচিং থেকে ১২ মাইল দূরে বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর এই ৎসিনহুয়া কলেজ স্থাপন করে। এখানে থাকার সময় কবি চীন যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এখানকার ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা কী'। 'ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ কী রূপ?' 'বেঁচে থেকে সুখ কি?' 'পাপ কাকে বলে?' রবীন্দ্রনাথ অতি ধৈর্যের সঙ্গে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, "The important idea is, that human beings are related to an Infinite, Person, that they are not like so much drift-wood, that they have a personal root in an Infinite personality, which we name God."

"Your eyes grope for light in a dark room. You are miserable because you cannot see. So our personality seeks its own fulfilment, its reality, where it can have its freedom, seeks it in other personalities in friends. This personality not only seeks other human personalities, but it is always changing. Our friends may become enemies. There is death. So my personality needs the assurance of reality just as much as my body does. That is why it craves the touch of some Infinite Personality. To this infinite personality I give the name God." (V. B. Qly. 1924) অর্থাৎ সব মানুষেরই এক অনন্ত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাকেই আমরা বলি ঈশ্বর। অন্ধকারে যেমন আমাদের চোখ আলোর সন্ধান করে বেড়ায় তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতার জন্য কেবল অন্য মানুষের ব্যক্তিত্ব বা বন্ধুত্বই দাবী করে না, একটা অনন্তের ব্যক্তিত্বের স্পর্শও কামনা করে। এই অনন্ত ব্যক্তিত্বকেই আমরা ঈশ্বর নাম দেই।

২৯শে এপ্রিল ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার পরেই কবি এক সম্বর্ধনার উত্তরে বস্তুতান্ত্রিক অগ্রাধিকার বিরুদ্ধে সত্য, প্রীতি ও সুন্দরের কথা বললেন।

"আমার যুবক বন্ধুগণ, আমি গভীর আগ্রহে বয়সের দূরত্ব দিয়ে তোমাদের দ্যুতিদীপ্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে আছি। আমি সূর্যাস্তের তীরের দিকে এগিয়ে চলেছি আর তোমরা দাঁড়িয়ে আছ উদিত সূর্যের দিকে। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি। রাত্রি শেষের উৎকণ্ঠ আঁধারে আমার শৈশবে আমি জানতাম না কী এক মহান যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আজ সেই যুগের অর্থ এবং বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় পৃথিবীর অনেক ব্যক্তি এই আহ্বান শুনতে পেয়েছেন।

মানবেতিহাসের অন্যতম এই শ্রেষ্ঠ সময়ে তোমাদের কী আনন্দ এবং দায়িত্ব! বিশ্বব্যাপী এক বন্যার আগুন পোহাতে পোহাতে আমরা অস্পষ্টভাবে এই যুগের মহত্ব

করে। কোন গবেষণাগারে এই সৌন্দর্যের গোপনীয়তার বিশ্লেষণ করা যাবে না। তোমরা স্বাভাবিকভাবেই একে আয়ত্ত করেছ—কত ভাগ্যবান তোমরা। এটা শেখানো যায় না কিন্তু এর ফলের অংশ তোমরা আমাদের দিতে পার। তোমরা যে সুন্দর সৃজনে সার্থকতা লাভ করেছ তার প্রকাশ আছে তোমাদের আতিথেয়তার মধ্যে; আমি বিদেশী হয়েও সুন্দরের মধ্যে আমার গৃহের সন্ধান পেয়েছি।

আমি ক্লান্ত এবং বৃদ্ধ। তোমাদের সঙ্গে এটাই হয়ত শেষ দেখা। আমি এই সুযোগে তোমাদের অনুরোধ করব তোমরা কুণ্ঠিত শক্তিতে, বিরাট আয়তনে, সঞ্চয়ের মনোভাব নিয়ে অর্থহীন এবং অন্তহীন লক্ষ লক্ষের গুণিতকে জড়িয়ে পড়বে না।

সভ্যতার আদর্শকে পোষণ কর, তার জন্য তোমাদের সকল কর্ম, সকল আন্দোলনকে সংযুক্ত কর। তাহলে তোমাদের মর্ত্য প্রীতি সত্ত্বেও তোমরা স্বর্গকে মর্ত্যে নিয়ে আসতে পারবে।" (Talks in China)

এখানেও সমালোচনার সুর শোনা যায়। একদল ছাত্র বিদ্রোহী ইস্তাহার শ্রোতাদের মধ্যে বিলি করে।

কবি এখানে রাজকীয় গ্রীষ্ম প্রাসাদের কাছে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্যাগোডা এবং নানা স্মৃতিচিহ্ন দেখলেন। কবি এখানে তাঁর বন্ধুদের কাছে শিল্প সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ একটা ভাষণ দেন। ৎসিংহুয়া কলেজে থাকতেই কবি ভারতীয়দের আয়োজিত এক সভায় 'সভ্যতা ও প্রগতি' নামে একটি দীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তাতে তিনি বললেন,

"একজন চীনা লেখক লিখেছেন, "চীনে সবচেয়ে বিপদের কথা হল এই যে, যখন চীন জাতিকে তার সভ্যতা পরিহার করে আধুনিক ইউরোপের সভ্যতা গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে তখন গোটা ইউরোপে একজনও শিক্ষিত লোক পাওয়া যাচ্ছে না যিনি বলতে পারেন আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাটা কি।"

অন্যত্র আমি একজন ফরাসীর উদ্ধৃত উক্তি পড়েছি তাতে তিনি লিখেছেন, চীন একটি দেশ নয়, একটি সভ্যতা। তিনি কি বলতে চান আমি বুঝতে পারি নি। মনে হয় তিনি বলতে চান, চীন বলতে কেবল ধন, জ্ঞান বা শক্তির অগ্রগতি বোঝায় না, বোঝায় একটি জীবনদর্শন এবং জীবনযাত্রার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। সিভিলাইজেশন এই ইউরোপীয় কথাটি বলতে ঠিক কি বোঝায় বলা শক্ত।

সভ্যতা বলতে আমরা কোন ঘটনার সমষ্টি বলতে পারি না হঠাৎ একটা বিশেষ আকৃতি বা গতি লাভ করেছে এবং যাকে আমরা বলতে পারি অপূর্ব। এটা আমাদের সমাজের সার্থকতার পথে কোন নৈতিক শক্তির প্রকাশ হওয়া উচিত। কোন জড় পদার্থ বা যে প্রাণীর কোন জৈবিক বৈশিষ্ট্য আছে সেখানে সার্থকতার একটা স্পষ্ট অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ যেখানে জটিল এবং সব সময় নিজেকে পরিবর্তিত করে চলেছে সেখানে সার্থকতা বলতে কোন স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে এই শব্দের নানা সংজ্ঞা পাওয়া সম্ভব।

আমাদের ভাষায় সংস্কৃত ধর্ম শব্দের সঙ্গে সিভিলাইজেশন শব্দের কিছু মিল আছে। বস্তুত এ ছাড়া অন্য কোন প্রাণহীন নতুন শব্দ এর কাছে আসে না। ধর্মের নির্দিষ্ট অর্থ হল যে নীতি আমাদের দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে এবং আমাদের উত্তম কল্যাণের পথে চালিত করে। এই শব্দের সাধারণ অর্থ হল কোন বস্তুর প্রকৃত গুণ।

ধর্ম সত্যনিষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সে এই ধর্ম পরিত্যাগ করে কোন জন্তু বা যন্ত্র হতে পারে; এর দ্বারা হয়ত সে বাহ্যিক এবং বস্তুগত শক্তি লাভ করতে পারে। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে, অধর্মের দ্বারা মানুষ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, যা ইপ্সিত তা লাভ করতে পারে, শত্রুকে জয় করতে পারে কিংবা সমূলে ধ্বংস হয়।

যে অর্থোপার্জনের আয়োজন যন্ত্র তার মধ্যে যথার্থ মানুষের প্রকাশ নেই। সে একটি সুন্দর টাকার থলির মত।

মহান চীনা কবি লাওৎসে এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে মরণের কালে হয় না তার জীবন চিরজীবী। অর্থাৎ যে মানুষ সত্যকে প্রকাশ করেন তিনি বাঁচেন এবং সত্যই হল ধর্ম। এই আদর্শ অনুসারে সিভিলাইজেশন হল মানুষের মিলিত জীবনের ধর্ম।

গত একশো বছরের উপর সমৃদ্ধ পশ্চিমীরা আমাদের টেনে নিয়ে এসেছে। তার ধুলোয় গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, শব্দে কানে তালা লেগেছে, তবু তার গতিতে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমরা স্বীকার করেছি সেই রথ চলাই প্রগতি, আর এই প্রগতিই সিভিলাইজেশন। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি কোনদিকে কিসের প্রগতি তাহলে আমাদের প্রাচ্যদেশীয় বলে উপহাস করা হয়। অশেষে আমাদের বলা হোল রথ নির্মাণের বৈজ্ঞানিক নিপুণতা নয়, রথ চলার পথে যে গর্ত হয়েছে সেটা দেখতে। (তার থেকেই প্রগতি স্পষ্ট হবে)

সম্প্রতি আমি আমেরিকান সাপ্তাহিক নেশনে একটা খবর পড়েছি। এ পত্রিকার সম্পাদক লন্ডন টাইমসের খবর উদ্ধৃত করে বলেছেন, "ব্রিটিশ বৈমানিকেরা আফগানিস্তানের মাসুদ গ্রামে বোমা বর্ষণ করেছিল। একটা বোমারু বিমানকে জোর করে নামিয়ে আনা হল। যখন বৈমানিকেরা অসহায় হয়ে বিমান থেকে বেরিয়ে আসে তখন জনা চল্লিশেক এক জনতা ছুরি শাণিয়ে তাদের দিকে তেড়ে আসে কিন্তু মালিক বা গ্রামপ্রধান এবং মোল্লা তাদের নিরাপদে একটি গুহায় নিয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা তাদের যত্ন নেয়।"

উপরের ঘটনায় প্রমাণ হয় পশ্চিম বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়েছে। তারা পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় যেতে পারে; সর্বাধিক ধ্বংসের জন্য যান্ত্রিক মারাত্মক বোমা তৈরি করেছে। কিন্তু এত অগ্রগতিতে মানুষ খুব ছোট হয়ে পড়েছে। সে গর্বের সঙ্গে কল্পনা করতে পারে যে তার হাতে ভীষণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই যান্ত্রিক সাফল্য তার কাছ থেকে একটা কথা লুকিয়ে রাখে তা হল এর দ্বারা তার মধ্যকার মানুষটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছে।

শৈশবে স্বাধীনভাবে অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমরা খেলার জন্য খেলনা তৈরি

করতাম। আমার সঙ্গীরা ঐ খেলার সময় সুখের অংশভাগী হত। একদিন আমাদের শৈশবের সেই স্বর্গ ভেঙে গেল। বড়দের বাজার থেকে বিলাতি দোকানের একটা খেলনা এনে আমাদের এক সঙ্গীকে দেওয়া হোল। খেলনাটা ভারী সুন্দর, বড় এবং বিস্ময়কর ছিল। ছেলেটি খেলনা পেয়ে গর্ববোধ করল। খেলা সম্পর্কে সে কম আগ্রহী হয়ে খেলনাটা যত্নে রক্ষা করতে লাগল এবং অন্য সঙ্গীদের যাদের কাছে সস্তার খেলনা ছিল তাদের কাছে দামী খেলনা দেখিয়ে নিজেকে সকলের চেয়ে বড় মনে করতে লাগলো। যদি সে ইতিহাসের আধুনিক ভাষা ব্যবহার করতে পারত তাহলে সে বলত, সে ঐ চমৎকার খেলনার জোরেই আমাদের চেয়ে বেশি সভ্য।

উত্তেজনার মুহূর্তে সে ভুলে গেল ঐ বিলাতী খেলনার চেয়েও বেশি সার্থক একটি শিশুর যথার্থ প্রকাশ। খেলনার মধ্যে আছে ধনের প্রকাশ, শিশুর সৃজনশীল সত্তার প্রকাশ নয়, তার খেলার উদার আনন্দ নয়, খেলার জগতে তার সঙ্গীদের উদার আমন্ত্রণ নয়।

মস্যুলে যারা বোমা ফেলতে গিয়েছিল তারা তাদের সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক খেলনার প্রয়োগে সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়েছিল। তারা এই খেলনার মূল্য এত বেশি মনে করে যে তাদের কাছে নিজ দেশের মানুষেরও কোন মূল্য নেই। তারা মানুষের মৃত্যুহারের সঙ্গে তুলনা করে এই খেলনার অপচয় ঠিক করে এবং তারা নিজেদের সুখী মনে করে। তাদের বিজ্ঞান তাদের বস্তুগত দিকে সার্থকতাকে এত সস্তা করে দিয়েছে যে তারা এর জন্য কী মূল্য দিতে হয় সেটা হিসাব করে না।

অন্যদিকে মাসুদরা যে বৈমানিকরা তাদের নারী শিশু পুরুষ সকলকে হত্যা করতে এসেছে তাদের রক্ষা করে। এর মধ্যে তাদের সযত্নে রক্ষা করা মূল্যবোধেরই পরিচয় দিয়েছে। মসুদদের কাছে অতিথেয়তা এক মহান গুণ। সেই গুণ প্রকাশের সুযোগ যদি একটি শত্রুপক্ষের মানুষের পক্ষেও ঘটে তাহলেও তারা তাকে ব্যর্থ করতে পারে না। প্রকৃত ঘটনার দিক থেকে মাসুদদের এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়, আমরা যেমন আমাদের মূল্যবান সামগ্রীকে রক্ষা করার জন্য দেই। এটাই ত সভ্যতার সঠিক মূল্যবোধ। মসুদদের অনেক ত্রুটি থাকতে পারে যার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া চলে তবু এটা প্রগতি বলে গণ্য না হলেও একে নিশ্চয়ই সভ্যতা বলা যাবে।

সঙ্কটের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্মম অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুকে জয় করা যায় কিন্তু সেখানেই তার শেষ। এই শেষ অপূর্ণ। গত মহাযুদ্ধের শুরুতে যখন নানাভাবে দানবিকতার প্রকাশ হচ্ছিল তখন পাশ্চাত্যের মানবিকরা সাময়িকের জন্য আপনা থেকে কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা তাদের প্রশংসা করছে কারণ তাদের কুণ্ঠিত ধর্মীগৃহে আরও শস্যকের আমদানি হয়েছে। মানুষকে বড় শাসন করতে চায় তাদের অস্বাভাবিক উন্নত জীবনে একে হয়ত প্রগতি বলা যায় কিন্তু এটা সিভিলাইজেশন নয়।

একবার আমাকে মোটরে অনেক দূর থেকে কোলকাতায় আসতে হয়েছিল। যান্ত্রিক

গোলমালে আমাদের প্রতি আধ ঘণ্টা পরে জলের দরকার হয়ে পড়েছিল। প্রথম গ্রামে আমরা যেখানে থামতে বাধ্য হয়েছিলাম, আমরা একজনের কাছে জল চাইলাম। অনেক কষ্ট করে সে জল সংগ্রহ করে দিল, আমরা যখন তার প্রতিদানে কিছু দিতে চাইলাম সে অস্বীকার করল। আরও পনেরটা গ্রামে একই ব্যাপার ঘটল। একটা গরম দেশে যেখানে পথিকদের অনবরত জলের প্রয়োজন হয় সেখানে তাদের জলদান করা গ্রামবাসীরা কর্তব্য মনে করে। তারা চাহিদা এবং যোগানের নিয়মে সহজে ব্যবসা করতে পারত কিন্তু তাদের আদর্শকে তারা জীবনের ধর্ম বলে মনে করে। একে বিক্রয় করার অর্থ জীবনকে বিক্রয় করা। একে ধারণ করার মধ্যে তারা কোন ব্যক্তিগত উৎকর্ষ মনে করে না।

লাওৎসে প্রকৃত সৎ মানুষ সম্পর্কে বলেছেন তিনি অনুপ্রাণিত করেন কিন্তু অর্জন করেন না। তিনি কাজ করেন কিন্তু দাবী করেন না। তার মেধা আছে কিন্তু এটা তার জীবিকা নয়। যেহেতু তিনি এর দ্বারা অর্জন করেন না সেজন্য এটা তাকে পরিত্যাগ করে না। যা আমাদের বাহ্যিক তাকে আমরা বিক্রয় করতে পারি কিন্তু যা আমাদের জীবনের অন্তর্গত তাকে বিক্রয় করতে পারি না। সত্যের সার্বিক উপলব্ধিতেই সার্থকতার স্বর্গ। একে লাভ করাই সভ্যতার কাজ।

প্রতি মিনিটে অসংখ্য জিনিস উৎপাদনের ক্ষমতার তুলনায় অপরিচিত পথিককে কষ্ট স্বীকার করেও জলদান করে তার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা না করা একটি সহজ কাজ। কিন্তু এই সরলতাই শত শতাব্দীর সংস্কৃতির ফল। এই সরলতা অনুকরণ করা শক্ত। কয়েক বছরের চেষ্টায় চাকা ঘুরিয়ে হাজার হাজার সূঁচে গর্ত করা শিখে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিন্তু একজন শত্রুকে কিংবা একজন অপরিচিতকে আতিথেয়তা দান সরল হলেও এটা শিখতে কয়েক পুরুষের শিক্ষার প্রয়োজন। সরলতা কোন মূল্য দাবী করে না। সেজন্য ক্ষমতাগর্বীরা আত্মিক প্রকাশের সরলতাই যে সিভিলাইজেশনের চরম প্রকাশ তা স্বীকার করে না।

একটা বিপত্তির ফলে উন্নততর জীবনের এই অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধনলিপ্সু শক্তি যেমন তার সভ্য অস্ত্রের দ্বারা দুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারী পাখিকে নির্মূল করে দিচ্ছে। এর প্রমাণ পেলাম যখন আমরা কলকাতার কাছাকাছি এসেছি। সেখানে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল, অপর্যাপ্ত জল। সেখানেই আমাদের কাছে জলের মূল্য চাওয়া হল। আমাদের জানতে হবে কিভাবে এই বিধান কাজ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে সত্যের প্রকাশ। এর প্রকাশ এবং শত্রু দুইদিকেই আছে। এর মধ্যে বস্তুকে প্রকাশের স্বার্থে ত্যাগ করতে হয়। ভারতবর্ষে একটি সংস্কৃত কবিতার ব্যাকরণের সব জটিল নিয়ম বলা আছে। যে সব পাঠক শিল্প কাজের মধ্যে শারীরিক প্রকাশে শক্তি অনুভব করতে চান তারা এর থেকে আনন্দ পাবেন। আধুনিক পশ্চিমী জগতে আমরা একই জিনিস দেখতে পাই। সেখানে প্রগতির পরিমাপ হয় গতি দিয়ে, বস্তুর গুণফল দিয়ে। তাদের অশ্বশক্তির কাছে আত্মিক শক্তি ম্লান হয়ে যায়। অশ্বশক্তি চালনা করে, আত্মিক শক্তি পালন করে। যা

তুলনা করে তাকে বস্তুর নীতি বলা হয়, আর যা পালন করে তাকে বলে ধর্ম। এই ধর্ম শব্দই আমার মতে সিভিলাইজেশন।

আমরা বৈজ্ঞানিকদের কাছে শুনেছি অনু হচ্ছে শীস যার চারদিকে পৃথ্বের যুগ্ম নানা গন্ধ অণু হয়ে একটি সার্থক একক সৃষ্টি করে। সিভিলাইজেশনও ততক্ষণ সুস্থ এবং শক্তিশালী থাকে যতক্ষণ এর কেন্দ্রে কোন সৃষ্টিশীল আদর্শ থাকে যা তার সদস্যদের একটা সুন্দর ছন্দে আবদ্ধ করে রাখে।

কয়েকযুগ আগেই পাশ্চাত্য সমাজের চালিকা শক্তি ছিল এক মহান আত্মিক আদর্শ, তার মধ্যে ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস যা সমাজের ঘূর্ণায়মান শক্তিকে একত্রিত করে রেখেছিল। কিন্তু আমাদের আবেগ সংকীর্ণ, এর সীমাবদ্ধতা উত্তেজনার গভীরতা সৃষ্টি করে। সম্প্রতি লোভের একটি আক্রমণাত্মক শক্তি পাশ্চাত্যমনকে অধিকার করেছে। অল্পকালের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছে। ফলে হঠাৎ একটা বস্তুর বন্যা পৃথিবীর সময় এবং কালকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলেছে। যা কিছু মানবিক ছিল তা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

এই শক্তির বিশৃঙ্খলাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শক্তি বা স্বদেশানুরাগের জন্য নানা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠনগুলোর কোনটাকেই সার্থক বলা যায় না। আলো পাত্রের যেমন প্রয়োজন তেমনি এই সংগঠনগুলোর প্রয়োজন আছে কিন্তু সেগুলোর চেয়ে বেশি প্রয়োজন আলোর। জল ছাড়া পাত্রগুলো যেমন বোঝা তেমনি বোঝা এই সংগঠনগুলো।

আমি কোথাও ক্রেটের একটা মন্তব্য পড়েছি। সেখানে তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি বুদ্ধিমান সমাজতান্ত্রিক সমাজ অবশ্যম্ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে ততক্ষণ এর বিকাশ হবে, তারপরে আর বিকাশ হবে না, সমাজ বধির হয়ে পড়বে এবং তার সুসম্বদ্ধতা নষ্ট হয়ে পড়বে।" জীবনের যে অবদান আছে তাকে সহযোগিতা এবং লেনদেনের মধ্য দিয়ে সর্বত্র যে জীবন্ত অনুভবের নিউক্লিয়াস আছে তাকে যতক্ষণ রক্ষা করা যাবে ততক্ষণই অখণ্ডতার উপলব্ধি থাকবে।

লাওৎসে বলেছেন "শাশ্বতকে না জানলে উত্তেজনা বাড়ে এবং সেটাই শয়তান।" আরাম এবং অনায়াসে বস্তুগত সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটে, আবেগ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় কিন্তু শাশ্বত ক্ষীয়মান হয়। মহাদেশ থেকে মহাদেশে শয়তানের আধিপত্যে মানুষ ও জীবনের কুসুম নষ্ট হয়ে যায়। এই মৃত্যু মিছিলের জন্য আমরা যোরন গাড়ু তুলি। আমরা যদি এর অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে না পারি তাহলে অন্তত এর বিজ্ঞাপন না করা উচিত। লাওৎসে যেমন বলেছেন ভাগে হওয়ার চেয়ে মরণও ভাল।

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তোমাদের দার্শনিক বলেছেন, লোভের চেয়ে আর দুর্দৈব নেই। এসব কথার মধ্যে যুগের জ্ঞানকে পাওয়া যায়। মানুষের জীবনে যখন লোভের আধিক্য ঘটে তখনই তার মৃত্যু হয়, কোন বাইরের প্রতিষ্ঠা করে তাকে রক্ষা করা যায় না। একদিকে জাতির স্বার্থমগ্নতাকে অবাধে বাড়তে দেওয়া এবং অন্যদিকে তার পথ বন্ধ করার জন্য বাহ্যিক বাঁধ বাঁধার চেষ্টা। এক্ষেত্রে

বাধা দিলে আরো প্রবল শক্তিতে বন্যা তাকে ভেঙে ফেলবে। লাওৎসে বলেন স্বার্থমগ্নতায় জীবন লাভ করা যায় না। অতএব এইসব নীতির দ্বারা আমাদের স্বার্থের লোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

যখন অন্তর আদর্শের মূল্য ছিল, যখন বর্তমানের মত অর্থেরই এমন মূল্য ছিল না তখন সভ্যতা ছিল জীবন্ত। আমরা সেই মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছি এবং আমাদের উপর যে অপমান চেপে বসেছে আমরা তাকে উপলব্ধি করতে পারছি না।

প্রাচীনকালে অর্থ সঞ্চয়ের সঙ্গে যদি কোন মহান আদর্শের যোগ না থাকতো তাহলে তাকে সম্পদ বলে গণ্য করা হোত না। কোন নৈতিক দায়িত্ব ছাড়া নিছক অধিকারবোধকে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যে মানুষ সম্মানজনক মনে করতো না। সর্বত্র অর্থগৃধ্নু তাকে ভাল চোখে দেখা হত না, যারা অতিরিক্ত লাভকেই একমাত্র মূল্য দেয় তাদের হেয় জ্ঞান করা হত।

এক সময় ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে কেবল জ্ঞানের জন্য নয়, ধনের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় আমাদের সমাজ তার আদর্শ সম্পর্কে সচেতন ছিল। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু অগ্রগতিকেই সীমাহীন বস্তুগত সম্প্রসারণকেই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয় সেজন্য অর্থ সার্বিক আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই উচ্চাশার জগতে অর্থই এখন কেন্দ্রীয় শক্তির উৎস।

প্রাচীনকালে সম্রাটেরা আত্মিক বা সৃজনশক্তির অধিকারী মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে লজ্জা বোধ করতেন না। ঐ সময়ে উচ্চতর জীবনাদর্শই ছিল সভ্যতার নিয়ামক শক্তি। বর্তমানে যে-কোন মর্যাদার মানুষ ধনবানের নিকট শ্রদ্ধা জানাতে অপমানিত বোধ করে না। বস্তুবাদী মানুষের কাছে সম্পূর্ণ মানুষের এটা পরাজয়। এই বিরাট অপমান এটাকে সরীসৃপের মত সমগ্র মানবিক পৃথিবীকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে। মানবতাকে যদি এই বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হয় তাহলে আমাদের মানবসভ্যতার উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এই শয়তান ড্রাগনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে।

আমি নিশ্চিত যে আপনারা আপনাদের দেশের উপর এই বিবেকহীন লোভের সম্পর্কে অবহিত। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আপনারা এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কোন উপায় উদ্ভাবন করবেন।

যে শত্রু আক্রমণ করে তার থেকে যত বিপদ তার চেয়েও বড় বিপদ রক্ষাকারীর বিশ্বাসঘাতকতা থেকে। আপনাদের বর্তমান যুবকদের মধ্যে যখন প্রাচুর্যের অপশক্তির প্রতি একটা মোহ দেখতে পাই তখন আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। তারা তাদের মহাজ্ঞানী সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ত্যাগ করে ধুলোর মধ্যে কালিমাখা হারিকেন হাতে যে এগিয়ে চলেছে তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

তারা আপন গৃহমুখী হয়ে যখন তাদের মহান শিক্ষক লাওৎসের শিক্ষা কী জানতে পারবে তখনই তারা সভ্যতার অর্থ বুঝতে পারবে। লাওৎসে বলেছেন যারা পুণ্যবান তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে আর যারা পুণ্যবান নয় তারা কেবল দাবি করে। আমি এতক্ষণ যা বলতে চেয়েছি, তিনি কয়েকটি শব্দে তা প্রকাশ করেছেন। যে প্রগতি অন্তর

আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে কেবল বাহ্যিক আকর্ষণ করে তা আমাদের সীমাহীন দাবী পূরণের চেষ্টা করে। কিন্তু সিভিলাইজেশন বলতে যে আদর্শকে বোঝায় তা আমাদের দাবির পূরণের শক্তি ও আনন্দ দেয়।

জীবনের দৃঢ়তা এবং হৃদয়ের কাঠোরতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ঘাস এবং গাছ যখন সজীব তখন তারা কোমল এবং নমনীয় আর যখন তারা মৃত তখন তারা কঠোর এবং শুষ্ক। এই ভাবে কঠিন এবং শক্ত হোল মৃত্যুর সঙ্গী। অতএব যার অস্ত্র আছে সে শক্তিশালী, যে কখনো জয়লাভ করতে পারে না, সে নীচে থাকে। কোমল এবং নমনীয় উপরে থাকে।

আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিরা বলেন, অধর্মের দ্বারা মানুষ সমৃদ্ধি লাভ করে, যা ইচ্ছা তাই পায়, তারা শত্রু জয় করে কিন্তু সমূলে ধ্বংস হয়। যে ধনে কল্যাণ নেই তার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তার সঙ্গে থাকে মৃত্যুবীজ। পশ্চিমে এই ধনকে মানুষের রক্তে পোষিত করেছে। আপনাদের কবিও একই সতর্কবাণী করে বলেছেন, যে জিনিস বর্ধিত হয় এবং পুরানো হয় তাকে বলে অযুক্তি। অযুক্তি শীঘ্রই ধ্বংস হয়।

আপনাদের শিক্ষক বলেছেন, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা আশীর্বাদ। পাহাড়ের বড় বড় পাইনগাছের প্রতি ইঞ্চির মধ্যে একটা ছন্দ এবং আত্মসংযম আছে সেজন্য তার অতি বৃদ্ধির মধ্যেও একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ আছে। যব প্রবাহের মত কাঠ, পাতা, ফুল ফলের সঙ্গে গাছের একটা সঙ্গতি আছে, এগুলোকে বাহুল্য বলা যায় না, বলা যায় আশীর্বাদ। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা জীবনের আবশ্যকীয় সরবরাহের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে লাভ বৃদ্ধির দিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে ফলে একটা কুৎসিত স্থূলতার উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকায় তাতে ছন্দপতন ঘটেছে।

আমাদের জীবন্ত সমাজে ঈশ্বরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নক্ষত্র ফুলের মত আমাদের জীবনেও চলায় ছন্দ, স্বরে সঙ্গীত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সৌন্দর্য থাকা উচিত।" (Talks in China).

আবার পেইচিঙে

কবি ৩ই মে পেইচিঙে ফিরে আসেন। বিকেলে বৌদ্ধ সমিতি কবিকে সম্বর্ধনা জানায়।

কবি পেইচিঙে ফিরে এসে একজনের বাড়িতে উঠেন। এখানে তিনি ৬ই মে থেকে তাঁর যে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল সে সম্পর্কে কাজ করেন। পেইচিঙে তখন ছিলেন বিখ্যাত ইংরাজী জানা পণ্ডিত ডঃ হু শি। তিনি সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার কথা শুনে আগ্রহী হন। রবীন্দ্রনাথ কি সত্যই বড় বড় শহরগুলোকে নিন্দা করে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে চান। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন, "একটি আদর্শ নগর সংস্কৃতির কেন্দ্র হবে, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। তিনি তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশের

বাউলদের কথা বললেন। তারা গ্রামের প্রতি ঘরে কবিতা, সঙ্গীত এবং গল্পকে নিয়ে এসেছে। এভাবে অতীতের সংস্কৃতিকে মানুষের মনে জীবন্ত করে রেখেছে।

মিঃ জো ভোনথেইনসি নামে প্রসিদ্ধ হুয়া কলেজের একজন আধুনিক উঁচুদরী অধ্যাপক কবির বক্তৃতার প্রতিবেদন ও সমালোচনা লেখেন। তা থেকে জানা যায় কবির বক্তৃতা তাদের ভাল লেগেছে, এমন কি কবির কথা তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করতেও পরাঙ্মুখ নয়; কিন্তু তাদের ভয় পাছে বিদেশীর মুখে আত্মপ্রশংসা শুনে তারা আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

এরপর রবীন্দ্রনাথ Yen Ching কলেজে ইংরাজি ভাষা শেখাবার শিক্ষকদের কাছে কবি হয়েও তিনি কেন বিদ্যালয় স্থাপন করলেন সেই কথা ব্যাখ্যা করে বললেন :

"আমাকে বলা হয়েছে আমি যে শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে আপনারা শুনতে চান। কিন্তু গত ২৪ বছর ধরে ধীরে ধীরে আমার প্রতিষ্ঠানের যে আদর্শ ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে আপনাদের কোন স্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। আমার মনের সঙ্গে আমার শিক্ষার আদর্শ এত ধীরে এবং এত স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে যে তাকে আপনাদের সামনে বিশ্লেষণ করা শক্ত।

আপনারা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমি কেন শিক্ষাকে গ্রহণ করলাম। চল্লিশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আমি সাহিত্য কর্মে আমার সময় ব্যয় করেছি। হাতে কলমে কোন কাজ করার ইচ্ছা আমার হয় নি কারণ আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে আমার সে রকম কোন প্রতিভা নেই। আপনারা হয়ত জানেন আমি তের বছর বয়সে আমার স্কুলের পাঠ শেষ করে ফেলেছি। এটা আমার গর্ব নয়, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

যতদিন আমি স্কুলে যেতে বাধ্য হতাম ততদিন এটা আমার কাছে অসহনীয় অত্যাচার বলে মনে হোত। আমি আমার বছরগুলো গুনতাম কবে আমি স্বাধীনতা পাব। আমার বড় দাদারা লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে নিজ নিজ মনোমত জীবনযাপন করত। তাড়াতাড়ি সকালের খাওয়ার শেষ করে আমি যখন দেখতাম স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে তখন আমি ওঁদের কী ঈর্ষা করতাম। আমি ভাবতাম কোন যাদুস্পর্শে আমি আমার পনের বা কুড়ি বছরের অতিক্রম করে চলে আসি। আমি পরে উপলব্ধি করেছি আমার মনের উপর তখন শিক্ষার একটা অস্বাভাবিক চাপ ছিল।

শিশুদের মন যে জগতে তারা জন্মগ্রহণ করে সে সম্পর্কে খুব সংবেদনশীল হয়। তাদের অবচেতন মন সব সময় সক্রিয়, সব সময় তারা যা জানে তার থেকে নতুন পাঠ নতুন আনন্দ গ্রহণ করে। তাদের নিষ্ক্রিয় মনের এই সংবেদনশীল গ্রহণ শক্তিই অনায়াসে জটিল এবং দুরূহ ভাষাকে অনায়াসে আয়ত্ত করে নেয়। তাদের এই স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই তারা শব্দের এমন অর্থ গ্রহণ করে যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। 'জল' শব্দে কি বোঝায় শিশু তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে কিন্তু 'গতকাল' শব্দের অনুষঙ্গ তার পক্ষে জানা শক্ত। তবু তাদের অবচেতন মনের অসাধারণ সংবেদনশীলতার দ্বারা তারা

এই সব বাধাকে অতিক্রম করে যায়। এই কারণেই এই বাস্তব পৃথিবী তাদের কাছে সহজ এবং আনন্দদায়ক।

কিন্তু এই সময়েই প্রাণহীন, বর্ণহীন, চার দেওয়ালে চোখের তারা অচিকে যান্ত্রিক এক শিক্ষা কারখানায় শিশুর জীবনকে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রদত্ত আনন্দ গ্রহণের এক ক্ষমতা নিয়ে আমাদের জন্ম হয় কিন্তু শৃঙ্খলা নামক এক শক্তির দ্বারা সেই আনন্দময় সক্রিয়তাকে বন্দী করা হয়। প্রকৃতির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কিছু গ্রহণ করতে যে আগ্রহী সংবেদনশীল মন থাকে নষ্ট করে ফেলা হয়। আমরা যাদুঘরের মৃত বস্তুর মত নিষ্ক্রিয় বসে থাকি আর উপর থেকে আমাদের উপর পাঠ বর্ষিত হয়।

আমাদের শৈশবে আমরা আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত শরীর মন দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করি। আমাদের যখন স্কুলে পাঠানো হয় তখন আমাদের কাছে প্রকৃতির উৎস বন্ধ হয়ে যায়, আমরা কেবল অক্ষর দেখি এবং কতকগুলো বিমূর্ত পাঠ শুনি। প্রকৃতির হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত যে আদর্শের ধারা আসে আমাদের মন তার থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষকরা যাঁদের আদেশের ধারা মনে করেন এতে মন বিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা আমাদের জন্য শৃঙ্খলা বলে যা গ্রহণ করি তাতে আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তাকে পরিহার করি। এই উদ্দেশ্য পরতা যা বড়দের মনে বিরাজ করে আমরা তাই স্কুলের ছেলেদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিই। আমরা বলি, "তোমাদের মনকে কখনো বিক্ষিপ্ত করো না, তোমাদের সামনে যা আছে, তোমাদের যা দেওয়া হয় তা মন দিয়ে করো।" এটা ছেলেদের উপর একটা অত্যাচার কারণ এটা প্রকৃতির পরিপন্থী। প্রকৃতি হল সবচেয়ে বড় শিক্ষক। মানুষ শিক্ষক জীবনের পাঠ নয় যান্ত্রিক পাঠে বিশ্বাস করে। ফলে শিশুর মন কেবল আহতই হয় না, জোর করে তাকে নষ্ট করে ফেলা হয়।

আমি বিশ্বাস করি শিশুকে প্রকৃতির মধ্যে রাখতে হবে, তার নিজস্ব একটা শিক্ষার মূল্য আছে। আজকের জীবনে যা কিছু ঘটছে তাতে তাদের মনে সব কিছুতেই বিস্ময় উৎপাদন করাতে হবে। নতুন আগামীকাল জীবনের নতুন ঘটনা নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হবে। শিশুদের জন্য এটাই শ্রেয় পন্থা। কিন্তু স্কুলে কি হয়, প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় একই বইয়ের পুনরাবৃত্তি হয়। তার দৃষ্টি কখনো প্রকৃতির হঠাৎ বিস্ময়ে আপ্লুত হয় না।

আমাদের বড়দের মন নানা জিনিসে ঠাসা। আমাদের সেগুলোকে সাজিয়ে রাখতে হয়। অতএব আমাদের চারপাশে যে ঘটে, ফুল এবং সঙ্গীতের দূত হয়ে যে প্রভাব হয় আমাদের উপর তার কোন প্রভাব পড়ে না। আমাদের মন তো ঠাসা। সেজন্য আমরা সেগুলোকে আসতে দিই না, প্রকৃতির হৃদয় থেকে আপনা থেকে যা আসে তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। আমাদের সার্থকতার জন্য যা প্রয়োজন তাকে রেখে বাকীগুলোকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

শিশুদের এই চিত্তবিক্ষেপ নেই। নতুন যা কিছু ঘটে তা তাদের মনে অবাধে স্থান

পায়। সেজন্য অতি অল্প সময়ে তারা অনেক বেশি শিখে ফেলে। এভাবে যা শেখা যায় জীবনে তা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এর অধিকাংশই হচ্ছে বিমূর্ত সত্য।

প্রাকৃতিক অবদানের জন্য শিশু তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। বড়রা অত্যাচারী বলে প্রাকৃতিক দানকে অস্বীকার করে এবং বলে শিশুদেরও তাদের মত শিখতে হবে। আমরা জবরদস্তি মানসিক বাক্যের উপর জোর দিই এবং আমাদের পাঠ অত্যাচার হয়ে ওঠে। এটা মানুষের ভীষণ নিষ্ঠুর এবং ক্ষতিকর চেষ্টা।

আমার শৈশবে আমি এই নিয়মের মধ্য দিয়ে এসেছি, সেজন্য এই অত্যাচারকে আমি স্মরণ করি। স্কুল সত্ত্বেও ছেলেরা যেখানে স্বাধীন আমি সেরকম স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি।

প্রকৃতি নিজেই তার সব কিছু উজাড় করে দেয়, প্রাকৃতিক স্কুলের সম্বন্ধে এই রকম ধারণা নিয়েই আমি শহর থেকে অনেক দূরে এক সুন্দর জায়গায় আমি আমার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি, যেখানে শিশুরা যথাসম্ভব বেশি স্বাধীনতা পাবে, তাছাড়া শিশুর মন যা গ্রহণ করতে পারে না আমি তাদের সেই পাঠ দেওয়ার জন্য জোর করি না। আমি অবশ্য স্বীকার করি আমি সব দিক থেকে আমার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারি নি। আমরা যে সমাজে বাস করি সেটাই অত্যাচারী। সেখানে বাস করতে গেলে আমি যা বিশ্বাস করি না চাপে পড়ে আমাকেও অনেক সময় সেই কাজ করতে হয়। তবে আমি সব সময় চেষ্টা করেছি একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ক্লাশরুমের শিক্ষার চেয়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সেখানে আকাশের উন্মুক্ত সৌন্দর্য আছে, বিভিন্ন ঋতু তাদের নানা রঙের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে এই সার্থক স্পর্শে আমরা বিভিন্ন ঋতু উৎসবের সুযোগ গ্রহণ করি। আমি বসন্তের আগমন এবং কয়েক মাসের খরার পর যে অপূর্ব বর্ষা নামে তাকে স্মরণীয় করে রাখতে গান লিখেছি। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা সুসজ্জিত নাটকের অনুষ্ঠান করি।

আমি শহরের বিখ্যাত শিল্পীদের আমাদের স্কুলে এসে বাস করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তাদের কাজ কর্মে স্বাধীনতা দিয়েছি, ছেলেমেয়েদের পছন্দ হলে তাদের লক্ষ্য করতে বলেছি। এ ভাবেই আমরা কাজ করি। আমি যখন কবিতা এবং গান রচনা করি আমি প্রায়ই শিক্ষকদের সেগুলো পাঠ করতে বা গান করতে আমন্ত্রণ করি। এভাবে এমন সূক্ষ্ম অথচ প্রাণদায়ী এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আমি এই সম্পর্কে অনেক বলেছি কিন্তু এ ছাড়াও আছে যুগের আদর্শ যা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান পাওয়া উচিত। যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ এক সঙ্গে আসে, বর্তমানে তা প্রায়ই হয়, তখন তাদের শুধু একজায়গায় জড় করা নয় তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কের বাঁধন গড়ে তুলতে হবে নইলে তারা পারস্পরিক বিরোধে মত্ত হবে।

প্রত্যেক শিশু যাতে যুগের এই উদ্দেশ্যকে ধরতে পারে আমাদের শিক্ষা সেভাবে হওয়া উচিত। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, তাদের প্রতি পারস্পরিক

সাহায্য নিয়ে আমাদের শিক্ষায় সব বিভেদের মধ্যেও ঐক্যের উপলব্ধি ঘটাতে হবে।

আমরা বিশ্বভারতীতে এটা চেষ্টা করেছি। কিছুটা শিক্ষার মধ্যে, কিছুটা শিল্পের মধ্যে, কিছুটা প্রতিবেশী গ্রাম জীবনের পুনর্গঠনে আমরা এই মিলনের আদর্শকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি।

আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রতিবেশীদের জীবনের সঙ্গে অনবরত সম্পর্ক রেখে চলে। শিশু জীবনের পক্ষে সবচেয়ে বড় দান স্বাধীনতা তা তারা এখানে ভোগ করে। আরেকটু স্বাধীনতা আছে, সেটা হোল সমস্ত জাতি এবং গোষ্ঠীর অহমিকা থেকে স্বাধীনতা, সঙ্কীর্ণতার মানসিকতার প্রতি স্বাধীনতা।

শিশুর মনকে সাধারণত বন্দী করে রাখা হয় সেজন্য তারা বিভিন্ন মানুষের ভাষা ও সংস্কারকে বুঝতে পারে না। এর ফলে যখন অন্ধকার নেমে আসে—অজ্ঞতায় এবং যুগের অন্ধতায় একে অন্যকে আমরা আঘাত করি। এই অন্যায় কাজে পাঠ্যদের অবদান আছে। সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর অহমিকা ভাতৃত্ববোধের নামে তারা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তারা এটা স্থায়ী করে শিশুদের মন বিষিয়ে দিচ্ছে। শিশুরা যখন তাদের মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তখনই পায়ের শেকল বাঁধা দৃঢ় হয়।

জাতীয় অহমিকাপূর্ণ নানা পুস্তক থেকে এবং যে বিষাক্ত প্রথা শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার থেকে রক্ষা করার জন্য একটি চেষ্টা করেছি। প্রাচ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বৈরিতা আছে। আমি পশ্চিমের বন্ধুদের সাহায্যে ছেলেমেয়েদের এই বোধ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। পশ্চিমী বন্ধুদের একটা মানবিক প্রীতি এবং সহানুভূতি আছে।

আমরা সমস্ত জাতির আত্মিক মিলনের আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। আমি অন্যান্য জাতির এ ব্যাপারে আরও সাহায্য চাই। আমি ইউরোপে যখন বেড়াতে গিয়েছি তখন সেখানে প্রখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে আবেদন রেখেছি। আমার সৌভাগ্য আমি তাদের সাহায্য পেয়েছি। তারা তাদের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে আমাদের নাতিক দরিদ্র প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

আমার মনে কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, বিশ্বভারতীর সেটা মাত্র একটা দিক। আমি চেয়েছিলাম সমস্ত দেশের মানুষ যারা আত্মিক মিলনে বিশ্বাস করে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক চায় তারা যেন এক জায়গায় এসে মিলতে পারে। পশ্চিমে এ রকম আদর্শবাদী অনেকেই এই কাজে যোগ দিতে চেয়েছেন।

যখন মানবজাতিগুলি একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবে তখন এই মিলনের ফলে এক নতুন সত্য উদ্ভাসিত হবে, এক মহান ভবিষ্যতের সৃষ্টি হবে। সেই মহান ব্যক্তির মত যে অখ্যাত মানুষেরা মানবিকতার শহীদের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছে তাদের মধ্য থেকেই সত্য ও প্রীতির নতুন অরুণোদয় ঘটবে। রোম যখন তার গৌরবের শীর্ষে তখন সেই মহান ব্যক্তির মাত্র কয়েকজন ছোটো শিষ্য ছিল এবং তিনি তার জীবন শেষে

চরম ব্যর্থতার এক দুঃখজনক চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। তিনি জনতার দ্বারা অনাদৃত ছিলেন, শক্তিমানের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন, তবু তার ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই তিনি চিরজীবিত।

বর্তমানেও অনেক শহীদ আছেন যারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা ক্ষমতাশীল মানুষ নন কিন্তু তারা "মৃত্যুহীন ভবিষ্যতের মানুষ।" (Talks in China).

চীনে কবির জন্মদিন

৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ কবির ৬৪ তম জন্মদিন। পেইচিঙ-এর 'ক্রেসেন্ট মুন' গোষ্ঠীটি মহাসমারোহে ঐ দিনের উৎসব পালনের আয়োজন করে। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ডঃ হু শি। সমস্ত অনুষ্ঠান ইংরাজিতে হয়। তবে পণ্ডিত লিয়াং ছি ছাও উপস্থিত থাকায় হু শি চীনে ভাষায় উৎসবের ভূমিকা করে দেন। এই সভায় লিয়াং ছি ছাও মহা উল্লাসের মধ্যে জন্মদিনের উপহার হিসাবে কবি চীনা নামকরণ করে বললেন, "আজ তিয়েনচু (স্বর্গীয় ভারত) থেকে আমাদের প্রিয় এবং সম্মানিত কবি তার প্রিয় চেন তানে (চীনাস্থানে) ৬৪ তম জন্মদিন পালন করছেন। আমি দুই দেশের নাম যুক্ত করে অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং সুখের সঙ্গে তাঁকে 'চু চেনতান' এই নতুন নাম উপহার দিচ্ছি।' (তানচুঙ) 'চু' মানে 'তিয়েন-চু' অর্থাৎ প্রাচীন চীনা ভাষায় ভারতীয় আর 'চেন-তান' মানে রবীন্দ্র। তান মানে রবি বা সূর্যোদয় আর চেন মানে ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্র দেবতা। 'চু চেন তান' অর্থ 'ভারতের বজ্রকণ্ঠ উদীয়মান সূর্য'। অন্যভাবে দেখলে এর অর্থ ভারত-চীন। 'চু' মানে ভারত আর চীনকে প্রাচীনকালে ভারতীয়রা বলত চেন-তান বা চীনাস্থান।

"হু শি বললেন ভারত চীনের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ছিন্ন হয়েছিল, আবার নতুন করে গড়ে উঠবে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথও বললেন, ভারতবর্ষ থেকে একদা যাঁরা চীনে এসেছিলেন, যাঁরা আজও স্মৃতিতে জীবিত, তাঁদের সঙ্গে এই চীনা নাম চীন ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" (বিতর্কিত অতিথি)

চীনে বিখ্যাত অভিনেতা মেই-লান-ফাঙ এই দিনের স্মৃতিতে লিখেছেন "জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হতে রবীন্দ্রনাথ ধীরে পদক্ষেপে প্রবেশ করে তৃতীয় সারির মাঝখানে আসন গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর পাশে বসে কাছ থেকে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ করুণাঘন চেহারা লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর মাথায় গাঢ় লাল রঙের টুপি, গায়ে লম্বা নীল সিল্কের জোব্বা, গভীর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, কেশশ্মশ্রু শুভ্র, প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্তি।" (বিতর্কিত অতিথি'তে উদ্ধৃত) মেই লান ফাঙ এই লেখা লিখেছেন ১৯৬১ সালে, আর V. B. Bulletin (June 1924) এ আছে রবীন্দ্রনাথ "বাঙালি পোষাকে সভায় উপস্থিত ছিলেন।" রবীন্দ্র জীবনীকার লিখেছেন, "একটি মূল্যবান পাথরের উপর চীনা হরফে 'চু-চেন-তান' খোদাই করিয়া কবির হস্তে অর্পিত হইল। উৎসবান্তে 'চিত্রা'র অভিনয়

হয়। রবীন্দ্রনাথ ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া বাঙালি বেশে রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া 'চিত্রা' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। দর্শকদের মধ্যে কবির পাশেই বিখ্যাত চীনা নর্তক মেই-লান-ফাঙ; উৎসবশেষে চীনা তরুণরা কবিকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র, একটি চীনা মাটির পেয়ালা ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী উপহার দেন।" চিত্রাঙ্গদা এবং মদনের ভূমিকায় অভিনয় করেন দুই দোভাষী লিন-হুই-ইন এবং শু-চি-মো।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ এই অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে ৩০ নং কবিতাটি লিখেছিলেন :

একলা গিয়েছি চিন দেশে
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' বলে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।"

জন্মদিনের এই উৎসব হয়েছিল পেইচিং নর্মাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে রাজধানীর চারশ বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে লু শুনও ছিলেন। এই সভার অনুভূতি তাঁর কাছে ভালো হয় নি। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষণ দেবার সময় "রাখা হয়েছিল একটি বাদ্যযন্ত্র, জ্বালানো হয়েছিল এক মস্ত ধূপ, বাঁ-পাশে লিন-হুই-মিন, ডানপাশে শু-চি মো। সবার মাথায় ভারতীয় টুপি। কবি শু-র পরিচয় দান এমন বিড়বিড় করে যেন তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।" অন্যত্র এই ঘটনার সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতবর্ষের ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের চীন আগা যেন, কতকগুলো ভদ্রলোকের সাহিত্যিক আর আত্মিক অহঙ্কার বাড়াবার জন্য তাঁদের গায়ে মস্ত বড় আচ্ছাদন জেকে দেওয়া।" (লুশুন রচনা সংগ্রহ ৫ এবং ১ খণ্ড, 'বিতর্কিত-অতিথি'-তে উল্লেখিত)

ঐ জনাকীর্ণ হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চীনা বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ১৯৬১ সালে মেই লান-ফাঙ তার সারণে যা লিখেছিলেন তা হোল, "আমার কাছে এই দিনটি সবচেয়ে সুখের কারণ এই দিনে তিনি চীন ও ভারতের জনগণের ঐক্য ও বন্ধুত্বের একটি প্রতীক লাভ করেছেন। এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য তিনি অক্লান্ত কাজ করে যাবেন। তিনি আন্তরিকভাবে চীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধুদের ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা এবং বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।"

পেইচিঙে বাকি বক্তৃতা

৯ই মে থেকে চেন-কোয়াঙ থিয়েটারে সর্বসাধারণের জন্য রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ধারা আরম্ভ হল। এটা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং আধুনিক সিনেমা হল। হল পরিপূর্ণ। অধিকাংশেই চীনা। কিছু বিদেশীরাও ছিলেন। বক্তৃতা সভার সভাপতি হিসেবে লিয়াঙ-ছি-চাও রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিয়ে দিলেন।

প্রথম দিন কবি মৌখিক ভাষণ দেন এবং তারপর তিনটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ হয়ত তাঁর বিরুদ্ধে অনাধুনিকের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্যই যে আধুনিকতার আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সেই কথাই এখানে বললেন। মিঃ হে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়ত বক্তৃতার সময়েই কিছু বিরুদ্ধ আলোচনা শুনতে পেয়েছিলেন যে তিনি একেবারে আধুনিক যুগের বাইরের লোক। সেই অভিযোগ পরিষ্কার করার জন্যই তিনি তার পরিবারের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা সেদিন বললেন : "আপনাদের একটা কাগজে পড়েছি তাতে আমার সম্পর্কে লিখেছে আমি দার্শনিক হওয়ার জন্য একটা বিশেষ সভায় পৌঁছতে দেরি করেছি। এর অর্থ হোল আমি আধুনিক যুগের একেবারে অযোগ্য। আমার হয়ত দুই হাজার বৎসর আগে জন্মান উচিত ছিল যখন মানুষের সময় কাল-এর কোন জ্ঞান ছিল না।

অথচ বাল্যকাল থেকে আমি শুনে আসছি আমি ভীষণ রকমের আধুনিক যার সঙ্গে অতীতের কোন সম্পর্ক নেই। আমি জানি না কোনটা সত্য।

আমার জন্ম ১৮৬১ সালে। ইতিহাসে এই তারিখটা কোন গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক মহান যুগের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশে নদীর সঙ্গমস্থলে তীর্থস্থান গড়ে উঠে। আমাদের কাছে এই নদীর সঙ্গম হচ্ছে আত্মার মিলন, আদর্শের মিলন। আমার জন্মের সময়ে আমাদের দেশে তিনটি আন্দোলনের স্রোত বইছিল।

তার মধ্যে একটি হোল অসীম বুদ্ধি অত্যন্ত মহান হৃদয়বান রাজা রামমোহনের ধর্মীয় আন্দোলন। এটা ছিল বিপ্লবাত্মক কারণ আচারের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ, আত্মার মুক্তির সব পথরোধকারী আধ্যাত্মিক জীবনের সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করলেন।

তাঁর সঙ্গে গোঁড়াদের বিরাট যুদ্ধ হল। যারা কেবল অতিপুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে চায় তাদের সংরক্ষণের একটা গৌরব আছে। যখন কোন মহান ব্যক্তি বা শক্তি কোন সত্যের প্রেমিক তাদের বেড়া ভেঙে চিন্তার নবোদয়ে সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে তাকে ভরিয়ে দিতে চায় তখন তারা দুর্বল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

আমার জন্মের সময় তা ঘটেছিল। আমি গর্বিত যে আমার পিতৃদেব সেই আন্দোলনের অন্যতম মহান নেতা ছিলেন। আমি এই নতুন আদর্শের উদ্ভাবণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। একই সঙ্গে এই আদর্শ ছিল প্রাচীন, সেই যুগে গর্ব করতে পারে এমন যুগের চেয়েও প্রাচীনতর।

দ্বিতীয় আন্দোলনও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সময়ে আমার চেয়ে বড় হয়েও আমার একই সময়ের একজন নিঃসন্দেহে মহান ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি দীর্ঘকাল জীবিত থেকে বাংলাদেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রধান সুধী ছিলেন।

আমাদের আত্মপ্রকাশের জন্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক আদর্শের ক্ষেত্রে মুক্তি চাই না, সাহিত্যের প্রকাশের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা চাই। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী জীবনের বিকাশ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কোন আলোড়ন ছিল না, আলংকারিক কারুকৃতির মধ্যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই সাহসী মানুষ সব রকমের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আমাদের ভাষার অস্তিত্বের জড়তা কাটিয়ে তিনি তাঁর অপূর্ব যাদুস্পর্শে আমাদের সাহিত্যকে যুগনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুললেন। সাহিত্য যখন তার শক্তি এবং ঔজ্জ্বল্য নিয়ে হাজির হল তখন তার কি অপূর্ব সৌন্দর্য।

এছাড়াও আরেকটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল যাকে বলা যায় জাতীয়। এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক নয় তবে এর মধ্যে আমাদের জনগণ তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি স্বাদ খুঁজে পেয়েছিল। তখন যে অপ্রচুর শক্তি মানববিশ্বকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভাগ করে ভোগ করার চেষ্টায় ছিল এবং মনুষ্যত্বের যে অপমান সাধন করছিল তার প্রতি একটা ঘৃণা প্রকাশ করছিল। এই বিদেশ নীতির ঘৃণ্য শক্তি আমাদের অনবরত আঘাত করছিল এবং আমাদের সংস্কৃতি জগতের বিরাট ক্ষতি করছিল। এর ফলে আমাদের যুবকদের মনে অতীতের যা কিছু উত্তরাধিকার তার প্রতি একটা অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। ইউরোপীয় স্কুল শিক্ষকদের অনুকরণে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা এবং চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের ছাত্রদের মনে একটা উপহাসের ভাব দেখা দিয়েছিল।

যদিও আমাদের শিক্ষকরা পরে তাদের মন পরিবর্তন করেছিলেন তবুও তাদের শিষ্য এবং ছাত্ররা আমাদের শিল্পকলার যেখানে স্থায়ী মূল্য তার সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারছিল না। ফরাসী তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রকলার জন্য তাঁরা এক প্রচণ্ড বুভুক্ষা নিয়ে অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে গতানুগতিক যান্ত্রিক যথার্থতা আছে।

ভারতবর্ষের আধুনিক যুবকরা বাস্তবতাকে পরিহার করে আমদানি করা চিত্রের কিছু প্রাসঙ্গিকতার ভক্ত হয়ে উঠলেন। আমার জন্মকালে এর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিল আমারই পরিবারের ভাই, ভাইপো। তারা জনসাধারণকে একটা অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করল।

আমাদের একটা ভিত্তি বার করতে হল যা বিশ্বজনীন, যা শাশ্বত, যার একটা স্থায়ী মূল্য আছে। আমাদের অতীতকে নির্বিচারে যাতে পরিত্যাগ না করি তার জন্য জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পর জাতির গৌরবকে স্বীকার করার জন্য একটা সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল সেজন্য এই আন্দোলন ছিল বিপ্লবী।

এই তিনটি আন্দোলনেই আমার পরিবারের লোকেরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের যেহেতু কোন গোঁড়ামি ছিল না সেজন্য আমরা ছিলাম প্রায় নির্বাসিত।

সুতরাং আমরা বিজাতীয় মুক্তি লাভ করেছিলাম। চিন্তা ও মানসিক শক্তি দিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছিলাম।

অতএব আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি তাকে তার নিজস্ব জীবনযাপন করতে হয়েছে। আমার যৌবনকালে এই জীবনধারাই আমার আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছিল। প্রকাশের মাধ্যম ছিল অবশ্যই মাতৃভাষা। অবশ্য জনগণের এই ভাষাকে প্রয়োজনমত আমাকে পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে।

কোন কবিই কোন অভিজাত বিপণি থেকে তার বাহন ধার করে না। তাকে যেমন তার নিজের বীজ বুনতে হয় তেমনি তার মাটিও তৈরী করে নিতে হয়। প্রত্যেক কবিরই একটা নিজস্ব ভাষা-মাধ্যম আছে।

মানবজাতির হৃদয়ে কবিতা আছে, তাদের অনুভূতির সার্থক প্রকাশের জন্য তাদের যুগ যুগ ধরে একটি নিজস্ব বাহনের প্রয়োজন। প্রত্যেক মহৎ ভাষারই পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়। যে ভাষার কোন পরিবর্তন নেই তা মৃত। তার মাধ্যমে চিন্তা ও সাহিত্যের ভাল ফসল হতে পারে না। কাঠামো যখন দৃঢ় হয় তখন আত্মা তার বন্দীত্ব স্বীকার করে অথবা বিদ্রোহ করে। বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে সব বিপ্লবই আত্মশুদ্ধি করে থাকে।

আমাদের সামাজিক জীবনেও যখন কোন শক্তি বহির্ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আমাদের অন্তর্শক্তিকে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করে তখন বিপ্লব দেখা দেয়। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় বা ধর্মীয় যখন কোন যান্ত্রিকতা তার কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে উঠে তখন তা মানুষের অন্তর্জীবনের অবাধ গতিকে ব্যাহত করে। বর্তমানে বহির্জগতে এই শক্তি অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং নিপীড়িত মানবাত্মা এই স্থূল বস্তু থেকে অর্থহীন বস্তু সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

যারা অতীতকে আঁকড়ে থাকতে চায়, যারা কেবল গতানুগতিকতা এবং বস্তুতন্ত্র নিয়ে থাকতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব হতে বাধ্য।

কেবলমাত্র শারীরিক আধিপত্য যান্ত্রিক এবং আধুনিক যন্ত্র কেবল আমাদের শরীর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বর্ধিত করছে। আধুনিক শিশু অতিরিক্ত বস্তুশক্তির মধ্যে আনন্দ পায়, সে বলে আমাকে একটি বড় খেলনা দাও এবং কোন ভাবাবেগ যেন তাকে বিরক্ত না করে। সে বুঝতে পারছে না আমরা সেই আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি যেখানে কেবল শারীরিক বলেরই প্রাধান্য ছিল সেখানে আত্মার কোন স্বাধীনতা ছিল না।

মানুষের সব মহৎ আন্দোলনই একটা মহৎ আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। আপনাদের কেউ কেউ হয়ত বলবেন এই সব আত্মার কথা একশ বছর আগে মৃতকল্প হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি বলব, না। মানুষ কেবল তার আকার নিয়ে বাঁচে না। মানুষ তার অসহায় দেহ নিয়ে জীবনে বসন্ত আনে নি, এনেছে তার মন এবং আত্মা দিয়ে।

বস্তুজগতের ঔদ্ধত্য অতি প্রাচীন। মানবাত্মার প্রকাশই আধুনিক। আমি আধুনিক বলেই এর পক্ষে। আমি আত্মার স্বাধীনতার বিপ্লবী পতাকা বহন করেই এগিয়ে চলেছি।"

(Talks in China)

১০ই মে শনিবার সকালে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতা শুরু করার আগে দেখা গেল একদল যুবক রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাবনাকে আক্রমণ করে বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করছে। এ রকম অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা করে লিয়াঙ চি চাও ব শিকে সতর্কিত করতে বলেন। ব শি আমন্ত্রিত কবির প্রতি এই অসৌজন্য প্রকাশ করার জন্য আন্দোলনকারীদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন।

রবীন্দ্রনাথ The Rule of the Giant এবং The Giant killer দুটি বক্তৃতা এক সঙ্গে দিলেন। দুটো বক্তৃতাই একসঙ্গে V. B. Qly তে July 1926 The Rule of the Giant নামে প্রকাশিত হয়। দৈত্যের নিয়ম প্রবন্ধে কবি আধুনিক সভ্যতার বিরাট অসম বিকাশ, অসমতার নিরবচ্ছিন্ন যার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর ঘাতক-দৈত্য প্রবন্ধে 'শিল্পায়নের যন্ত্র দানবিকতা', 'বিত্তগৃধ্ন বাণিজ্যে'র কথা বলেছেন। এমনকি আধুনিক গণতন্ত্রও এই দায় থেকে মুক্ত নয় কারণ এর বেদীমূলে অসংখ্য জীবনের বলি হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল হলের মধ্যে চীনা ভাষায় লেখা কয়েকটি প্রচারপত্র। তাতে কী লেখা আছে জানতে চাইলে ব শি জানালেন রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বক্তব্যের ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছে। পরে কয়েকজন জাপানী রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদের মূল বক্তব্য জানান। পাঁচটি কারণে তরুণরা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছে।

১। "প্রাচীন চীনা সভ্যতা জনসাধারণকে শোষণ করে রাজাদের বড়ো করেছে, মেয়েদের পদানত করেছে, পুরুষকে দিয়েছে সব অধিকার, পোষণ করেছে অভিজাত সামন্তদের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সভ্যতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাই আমরা তাঁর বিরোধিতা করি।

২। আমাদের কৃষি চাষীর ক্ষুধা নিবারণে অক্ষম, আমাদের শিল্প কুটিরশিল্প মাত্র, আমাদের নৌকা, আমাদের যানবাহন দিনে আড়াই মাইলের বেশি যেতে অসমর্থ, আমাদের ভাষা, আমাদের লিখন-পদ্ধতি এখনও আদিম, আমাদের পথঘাট, আমাদের শৌচাগার, আমাদের রন্ধনশালা পৃথিবীর চোখে হাস্যকর। অথচ রবীন্দ্রনাথ বস্তুসভ্যতার অগ্রগতির জন্য আমাদের তিরস্কার করেছেন। তাই আমরা তাঁর প্রতিবাদ করতে বাধ্য।

৩। রবীন্দ্রনাথ চীনকে বলেন আত্মিক সভ্যতা তাঁর ভাবাবহ বল আমরা প্রাচীন চীনে দেখেছি—অনবরত যুদ্ধ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, বিশ্বাসঘাত, বঞ্চনা, লালসা, নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তি, পুত্র ধনীর রক্ত পান, বাপ-মাকে খাওয়ানোর জন্য ধার্মিক সন্তানের নিজের শরীরের মাংস কেটে দেওয়া, শবরিকের মাথার খুলিতে মদ্যপানের উৎসব, পা বিকৃত করে মেয়েদের সুন্দরী বানানোর চেষ্টা। এই প্রাচীনের দিকে ফিরতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

৪। চীনের বর্তমান দুর্দশার কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকদের ঔদাসীন্য। তারই ফলেই জঙ্গী শাসক ও বিদেশী শক্তি আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর রবীন্দ্রনাথ

বলছেন আমরা নাকি ঐ সব ব্যাপারে বড় বেশি লিপ্ত। তাঁর মানে জাতীয়তার দরকার নেই। সরকারের দরকার নেই। দরকার শুধু আত্মার সন্ধান।

৫। আমাদের দেশে চীন এবং ইয়াঙ তত্ত্ব ছিল, তাও ছিল, কনফুসিয়াস তত্ত্ব ছিল। এখন এসেছে 'থিয়সফিক্যাল চার্চ সোসাইটি', 'স্পিরিচুয়াল কালচার অ্যাসোসিয়েশন', এবং খ্রিস্টতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ব্রহ্মের কথা—আত্মার মুক্তির কথা। এই অকর্মণ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি। আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি।" (দ্র. Hay 170-71 অনুবাদ 'বিতর্কিত অতিথি' থেকে)

"রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে গেলেন। আক্রমণের তীব্রতায় নয়, আক্রমণের মিথ্যা ভিত্তিতে। তিনি এমন কোন কথা বলেন নি চীনের যার থেকে কেউ মনে করতে পারে তিনি চান, চীন ফিরে যাক প্রাচীন যুগে, তিনি সমর্থন করলেন প্রাচীনের অন্ধ সংস্কার, প্রভুর যুক্তিহীন শাসন, তিনি অস্বীকার করেন বিজ্ঞান, যন্ত্র, শাসন-যন্ত্র, প্রচার করেন অকর্মণ্যতার তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিন্তা, তাঁর ধর্মচিন্তা, যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কোনটিই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সেই সমালোচনা শুনতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই প্রচারপত্র তো সমালোচনা নয়—এ কলঙ্কলেপন। ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন আর একটি বক্তৃতা দিয়েই শেষ করবেন। বাকি বক্তৃতা বাতিল।

সেদিন ছিল রবিবার। কিন্তু খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ত্বরিত গতিতে। সোমবার বারোই মে-র সকালে দু হাজার যুবক-যুবতীতে হল ভরে গেল। প্রথমে শু চি মো দিলেন আবেগময় বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথ দিলেন তাঁর শেষ বক্তৃতা। এখানে তিনি বললেন প্রাচ্য সভ্যতা মানেই আধ্যাত্মিক নয়, বহু ক্ষেত্রে তাও জড়বাদী। পশ্চিমকে গ্রহণ করতে হবে অন্ধভাবে নয়, আত্মসম্মানের সঙ্গে।" (বিতর্কিত অতিথি) এই দিনের বক্তৃতার নাম ছিল Judgement, W.B. Qly. Oct. 25 তারিখে প্রকাশিত।

মিঃ হে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেদিনই পশ্চিম পাহাড়ে চলে গেলেন বিশ্রাম করতে এবং ১৮ই পেইচিং ফিরে এলেন এবং ১৯শে পেইচিং ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই ছিলেন ক্লান্ত এবং আহত। আমন্ত্রকরা বললেন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য তাঁর নির্ধারিত বাকী বক্তৃতা বাতিল করে দিয়েছেন। মিঃ হে নানা ঘটনার উল্লেখ করে দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার কথা ঠিক নয়।

১৫ই মে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী প্রতিনিধি পেইচিঙের চরমমতবাদী ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় মিঃ লিও কারাখানের সঙ্গে কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, রাশিয়ার অধিকাংশই প্রাচ্যের মধ্যে, তার ঐতিহ্যগত সভ্যতা প্রাচ্যের সভ্যতার কাছাকাছি এবং যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুগত সভ্যতার একজাতি করে রাশিয়া তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য আমি দেশ দেখতে এবং প্রাচ্য সভ্যতার কথা বলতে সোভিয়েট রাশিয়ায় যেতে চাই।

১৭ই মে তাইয়ুয়ান উৎফ প্রদেশের নতুন হোটেলে বক্তৃতা-সভার পক্ষ থেকে যে

ডিনার দেওয়া হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ ভারত এবং চীনের গ্রাম-সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৮ মে-র সকাল বেলায় পেইচিঙে ফিরে আসার পরে ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে হঠাৎ একদল ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত। তারা রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু শুনতে চায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষার অভিজ্ঞতার কথা বললেন, "আমার যৌবনকালে আমি স্কুলের লেখাপড়া ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম। যৌবনে ঐ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম বলে আমি আজ যা তা হতে পেরেছি। আমি যে ক্লাস থেকে পালিয়েছি তা আমাকে কেবল নির্দেশ দিত, অনুপ্রাণিত করত না। এই প্রকৃতি এবং জীবন থেকে আমি মনের সংবেদনশীলতা লাভ করেছি।

আমরা যে বিরাট পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি সেখানে যদি কেবল বইয়ের স্তূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতাম তাহলে এই পৃথিবীকে আমি হারাতাম। বাস্তবের সংস্পর্শে এলে, এই পৃথিবীর মধ্যে যে বাস্তবতা ছড়িয়ে আছে তার সংস্পর্শে এলে যে মন সংবেদনশীল হয়ে ওঠে তাকে ধ্বংস করতে পারলে নীল আকাশে যা ছড়িয়ে আছে, বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে যে ফুলের ডালি সাজানো আছে, প্রেমের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের মধ্যে যে কোমল সম্পর্ক আছে সেগুলোকে উপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু আমি সেই সংবেদনশীলতাকেই রক্ষা করেছি।

নিসর্গ মা যদি পারতেন তাহলে তিনি আমাকে আদর করতেন, আশীর্বাদ করতেন, রাজমুকুট পরিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'তুমি আমাকে ভালবেসেছ।' আমি এই পৃথিবীতে কোন সমাজ বা গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে নয়, ভবঘুরে হিসাবে বাস করেছি। আমি তাকে মুখোমুখি দেখেছি, "আমি এই পৃথিবীর অনন্তের রহস্যের মধ্যে, তার হৃদয়, তার আত্মার মধ্যে বাস করেছি। তোমরা আমাকে একজন অশিক্ষিত, অসংস্কৃত একজন বোকা কবি বলতে পারো, তোমরা বড় পণ্ডিত এবং দার্শনিক হতে পার তবু আমি তোমাদের পণ্ডিতাভিমানী জ্ঞানের প্রতি উপহাস করে যাব।

আমি তোমাদের চেয়ে কম অঙ্ক জানি বলে তোমরা আমাকে উপহাস করছ, কারণ, তোমরা জান আমি এই অস্তিত্বের গোপন রহস্য অন্যভাবে আয়ত্ত করেছি, শিশু যেমন মায়ের খবরকে জানে তেমনি করে। আমি আমার মধ্যে শিশুর সেই আত্মাকে রক্ষা করে চলেছি যাতে আমি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে পারি। যার ফলে আমি মধু সুধারস থেকে পান করতে পারি, যার ফলে আমি তোমাদের কাছে আসতে পারি, স্বপ্নের পথ ধরে দূর দেশের যুবক হৃদয়কে আমি স্বীকার করতে পারি।" (Talks in China)

১৮ মে বিকেল বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বিদায় সভার আয়োজন হল। রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর চীনে আসার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল তা বর্ণনা করে বলেন, "যে বন্ধুদের সঙ্গে আমি বাস করেছি যাঁদের কাছ থেকে সদয় ব্যবহার পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে। যাঁরা আমাকে এই মহান দেশ এবং তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমি তাঁদের সঙ্গে কত আপন হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে

পারব না। তবু মনে হচ্ছে কিছু অপূর্ণ রয়ে গেল, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নি। তার জন্য বর্তমান যুগ এবং তার প্রতিকূলতাই দায়ী।

আমার দেশের মানুষ যখন শুনেছে আমি চীন থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি তখন তাদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। আপনাদের অনেকেই জানেন, আমি এর আগে পশ্চিমের অনেক দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু এবারকার আনন্দ কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। যখন অধিকাংশ লোক পশ্চিমী সংস্কৃতি নিয়ে মোহিত হয়ে আছে তখন প্রাচ্যের একজন মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে যে উদারতা আছে তাতে সকলেই মুগ্ধ। তারা মনে করেছেন প্রাচীন আত্মিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের এক বিরাট সুযোগ এসেছে।

আমাদের দেশের মানুষ সরল, তারা কৃত্রিম অভিজাত নয়। তারা বিশ্বের ব্যাপার জানে না, তারা মনে করে জাতিগুলির পরস্পর কাছে আসা একটা সহজ ব্যাপার। বরং ভিত্ত সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়।

তাঁরা আমাকে বলেছে, "চীনের জনগণকে বলবেন, দূরকালে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমরা তাকে ভুলতে পারি না। তাঁরা ভেবেছে চীনের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সর্বত্র চীনের লোককে ভারতবর্ষের প্রীতির কথা বলা খুব সহজ। তারা জানে না এখন সময় খুব কঠিন এবং অনেক অলঙ্ঘ্য বাধা আছে। তাঁদের সরল হৃদয়ে তাঁরা বিশ্বাস করেছে দুই দেশের হৃদয়কে একত্রে বন্ধন করা আমার মত একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব।

একে অন্যের কাছে কথা বলা খুব সহজ হয়েছে। আমরা কয়েকদিনের জন্য এসেছি। আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় আমাদের ভ্রমণ পিকনিক হয়েছে। আমরা পার্টিতে যোগদান করি, পরস্পরে আনন্দ করি, চা খাই, বক্তৃতা দিই, তারপর ফিরে যাই। এ সবই সহজ।

কিন্তু যে জিনিস মূল্যবান তার মূল্য দিতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের জনসাধারণের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের একটা আদর্শ ছিল কিন্তু তাঁদের যাতায়াতে অনেক অসুবিধে ছিল সেজন্য তাঁরা সহজে তাঁদের বার্তা নিয়ে যেতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও হাজার বছর পূর্বে তাঁরা আপনাদের ভাষায় কথা বলতে পারত। কারণ তাঁরা তাঁদের কাজের গুরুত্ব বুঝতেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন এত অমূল্য ছিল যে তাঁরা ভাষার পার্থক্যও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এই বন্ধন একটি উপায়।

এই মানুষগুলো যে পর্বত অতিক্রম করে, যে মরুভূমি "পার হয়ে এসেছিল তার চেয়েও বেশি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ভাষাকে আয়ত্ত করে তাঁদের আধ্যাত্মিক বিষয়কে চীনা ভাষায় রূপান্তরিত করা। এটা কম বিস্ময়কর নয়।

এইরূপে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের সত্যের জন্য মূল্য দিয়েছিলেন। আমার পক্ষে সবই এত সহজ এবং আরামপ্রদ যে আমাকে তার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় নি। আমি আপনাদের বলেছি, আমি কিছু বক্তৃতা দিয়েছি, আমি আপনাদের রেলগাড়িতে

চড়ে গন্তব্যস্থলে গিয়েছি। তবু আমি বলব এটা স্বাভাবিক নয়। আমি আমার সহযাত্রীদের জানার কোন সুযোগ পাই নি। আমার যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁরা কি আমাকে সব বুঝতে পেরেছেন? প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা আছে। আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট সেই হতভাগ্যদের মাথার উপরে শব্দের বৃষ্টি করেছি। সভ্যতা এখন কত সহজ করে দিয়েছে।

কিন্তু আদর্শকে কার্যকরী করতে হলে শ্রোতা ও বক্তাকে সহযোগী হতে হবে। শুধু হৃদয়ের বন্ধনের মধ্যেই প্রকৃত মিলন। আমি যদি আপনাদের মধ্যে বাস করতে পারতাম এবং আমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলতে পারতাম তাহলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আমাদের চিন্তা কার্যকরী হতে পারত। তাতে কালক্রমে ফল ফলত। আমাদের সম্পর্ক আর একতরফা হোত না। কিন্তু আমাদের অধ্যাপক এবং স্কুল শিক্ষকরা বক্তৃতা শুনতে চান, তার থেকে কোন গভীর ধারণা হয় না, স্মৃতিতে আবছা রেখা থাকে। খবরের কাগজে কিছু অনুচ্ছেদ থাকে কিন্তু মানব-হৃদয়ে কোন দাগ পড়ে না।

কিন্তু ভারতবর্ষে আপনাদের যে তীর্থযাত্রীরা গিয়েছিলেন কিংবা আমাদের যাঁরা আপনাদের দেশে এসেছিলেন তার মধ্যে যে সত্য ছিল তা এখনো নষ্ট হয় নি। বর্তমানে পরিবর্তিত সময়ে হাজার বছর আগেকার সেই চিন্তা এবং শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারব না, কিন্তু তাঁরা যেহেতু আমাদের জীবনের মধ্যে মিশে গিয়েছেন সেজন্য আমরা তাঁদের ভুলতেও পারব না।

তখন কি মহান তীর্থযাত্রা ছিল। ইতিহাসের কী মহৎ সময়! ঐ বিস্ময়কর মানুষেরা তাঁদের বিশ্বাসের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘকালের জন্য গৃহ থেকে নির্বাসন নিয়েছিলেন। অনেকে কোন চিহ্ন না রেখেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কয়েকজন বেঁচে গিয়ে তাঁদের কাহিনী বলেছেন। তাঁদের অধিকাংশে পিছনে কোন প্রমাণ রেখে যেতে পারেন নি।

আধুনিক সভ্যতা সেলাই বিভাগের মত সব কিছুর আবরণী তৈরি করছে। তার থেকে বাইরে এসে কিছু স্পর্শ করা শক্ত, ফলে নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। যখন জীবন সরল ছিল, জীবন অসন্দিগ্ধ ছিল, অতিথিপরায়ণ ছিল, তখন তাঁরা তাঁদের সুখ সম্পদ ভাগ করে নিতে পারত। তখন তা সহজ ছিল, এখন এটা ভীষণ শক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাস করে তাঁরা এটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে।

বিভিন্ন জাতিকে প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করার কথা আমরা সকলে বিশ্বাস করি কিন্তু জীবন এত গতানুগতিক হয়েছে যে এটা এখন কঠিন কাজ। আপনাদের শোনার সময় নেই, এমন কি যদি প্রাচীন ভিক্ষুরাও আসত তাহলেও আপনাদের তাঁদের কথা শোনার কৌতূহল বা সুযোগ হত না। জীবনের পক্ষে আবশ্যকীয় না হলেও আপনাদের জীবন নানা কাজে ঠাসা। জীবনের নানা ফাঁক পূরণ করতেই আমরা ব্যস্ত, প্রতিবেশী মানুষের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ নেই।

আপনারা কি একটু ভাবতে পারেন কোন মহান দূত এসে আপনাদের পশ্চিম পর্বতের পাদদেশে লেকের ধারে বাস করছে? আপনারা বলবেন লোকটা পাগল, আপনারা পুলিশ পাঠিয়ে তাকে ধরে আনবেন, আপনাদের বৈদেশিক দপ্তর তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে অথবা নিরাপদে বন্দী করে রাখবে। আসলে আপনাদের মনের অবস্থাই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

আমি স্বীকার করছি আমার উচ্চতর আদর্শে বিশ্বাস আছে। কেবল তার মধ্য দিয়েই জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। একই সময় সে সম্পর্কে আমার একটা দুর্বলতা আছে, আধুনিক যুগে সে সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের এখন সবই সাধারণ এবং উপর উপর। আমাদের এখন সংবাদপত্রের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যারা সারা পৃথিবীব্যাপী ভুল বোঝাবুঝি এবং উপর উপর জীবন দেখার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করে মানব হৃদয়ে পৌঁছনো খুব শক্ত কাজ।

মনে করবেন না, আপনাদের হৃদয়ে জায়গা না পেয়ে আমি এ অভিযোগ করছি। এটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সমাবেশ। আপনাদের ঘনিষ্ঠতায় আমি যত সুখী হয়েছি অন্য কোথাও তেমন হইনি। মনে হয় আমি যেন আমার সমগ্র জীবনকে এখানে উপলব্ধি করেছি। এখানে আমার অবস্থান সুন্দর এবং আনন্দময় হয়েছে এবং আমি খুশি। কিন্তু আমার হৃদয়ে একটা যন্ত্রণা আছে। আমি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে জানবার সুযোগ পাইনি। আমি এখানে খুব ভাল ছিলাম, আমি দিনগুলি কাটিয়েছি উপর-উপর। কেবলমাত্র সাহিত্যিক বা কবি হিসাবে নয় আন্তরিকভাবে আপনাদের হৃদয়কে উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

আমি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারি নি। তবু আমি মনে করি কিছু হয়েছে। পথ উন্মুক্ত হয়েছে, যে পথ অন্যেরা অনুসরণ করতে পারে। আশা করি আপনাদের মধ্য থেকেও কেউ ভারতের দিকে যাবে।

আমি আমার জীবনের শেষ দিকে যে আদর্শ নিয়ে চলেছি তার কিছু আপনাদের কাছে দিতে পেরেছি, এটাই আমার সান্ত্বনা। আমি আমার প্রতিষ্ঠানে ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শকে অনুসরণ করি। সেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষ কাছাকাছি আসতে পারে। আমি মানুষের আত্মিক মিলনে বিশ্বাস করি। আশা করি আপনারাও এটা গ্রহণ করবেন। 'আমরা এই আদর্শকে স্বীকার করি', আপনারা যদি তা না বলতে পারেন, তাহলে আমার মিশন ব্যর্থ। আমাকে আপনারা কেবল একজন অতিথি হিসাবে গ্রহণ করবেন না, আমি এসেছি একটা মহৎ আদর্শের জন্য আপনাদের প্রেম, সহযোগিতা এবং বিশ্বাস অর্জন করতে। আমি যদি আপনাদের মধ্যে একজনকেও তা গ্রহণ করতে দেখি তাহলেই আমি খুশি।" (Talks in China)

মিঃ হু শি তাঁর প্রতিভাষণে বললেন,

"আমি নিশ্চিত আমরা সকলেই আমাদের অতিথির ভাষণে মুগ্ধ হয়েছি। এখানে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকেও আমি নিশ্চিত বলতে পারি ডঃ টেগোর এবং তাঁর

সঙ্গীরা যে অনুভূতি এবং সহানুভূতির সঙ্গে বর্তমানে আমাদের সামনে যে মহান কর্ম আছে তার সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন তা ব্যর্থ হয় নি। বরং আমি বলব তাঁরা এই আশ্বাস নিয়ে ফিরতে পারেন যে তাঁরা তাদের উদ্দেশ্যসাধনে সার্থক হয়েছেন।

এটা সত্য যে, কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, এমনকি বোঝার মত বিভ্রান্তিও হয়েছে সেগুলো অনিবার্য ছিল। আমাদের নিজেদের মধ্যেও বোঝাপড়া করা শক্ত, আমাদের মধ্যে যারা দেশের মানুষের জন্য কোন আদর্শ আমদানি করতে চায় তাঁদের প্রচেষ্টাকেও ভুল বোঝা হয়।

সত্যকে প্রচার করা, দশ শতাব্দী ধরে দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়েছে তাকে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার মধ্যে গড়ে তোলা খুব শক্ত কাজ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন এই কাজ পারস্পরিক ভাবা শিক্ষার মধ্য দিয়ে করতে হবে, তখন তিনি খুব খাঁটি কথা বলেন।

আমাদের হৃদয়ে যে বীজ বপন করা হয়েছে তা কখনও ব্যর্থ হবে না, একটা অঙ্কুর হয়েছে মাত্র। একটা উর্বর জমিতে এই বীজ বপন করা হয়েছে এবং আগামী দিনে তা ফলপ্রসূ হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি ডঃ টেগোর এবং তাঁর সঙ্গীরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন তা সার্থক হয়েছে ধরে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন।" (T.C.)

১৯শে মে মহাযান বৌদ্ধপ্রতিনিধিদের সামনে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু এবং বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক সম আদর্শের কথা বলেন।

সেদিন বিকেলে International Institute এর তত্ত্বাবধানে কবি পেইচিঙে শেষ বক্তৃতা দেন কবির ধর্ম সম্পর্কে। নয়টি ধর্মের প্রতিনিধি নিজ নিজ জাতীয় পোষাকে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। Peking Leader এই সভা সম্পর্কে লিখেছেন, "Mr. Rabindranath Tagore gave his farewell address at the Cheu Kwang theater, before a house that was crowded to the doors."

চীনের বিখ্যাত নর্তক ও অভিনেতা মেই-লান-ফাঙ একটি পৌরাণিক অপেরা "The Goddess of the Lo-River" দেখান। মেই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এই অপেরা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং গ্রীনরুমে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সেদিন বিকেলে তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সম্পর্কে বলেন : "আমি শুনেছি চীন কখনো ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করেনি। এটা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মানুষ তার নিজেদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে প্রতিবেশীর ধর্মকে বিচার করে। আমি যদি বেশিদিন থাকতে পারতাম, তাহলে আমি চীনের হৃদয়কে বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমার ভ্রমণের দিন অল্প তার মধ্যে আবার এত নির্দিষ্ট কাজ ছিল যাতে আমি সাধারণ মানুষের সারল্য এবং দেশের ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে সাধারণের সংস্পর্শে যেতে পারিনি।

আমার ধর্ম সম্পর্কে আপনারা জানতে চেয়েছেন। আমি কোন বিশেষ ধর্মমতের মধ্য দিয়ে বড় হইনি। আমার পরিবার উপনিষদের মতে উদ্বুদ্ধ ছিল। আমার ব্যক্তিগত যে মানসিকতা তাতে আমার চারপাশের লোকের ধর্মমত আমি গ্রহণ করতে পারিনি। আমার মন গড়ে উঠেছে একটা স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে; তার মধ্যে কোন বিশিষ্ট ধর্মমত বা ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল না। সেজন্য ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারি না।

চীনে আমার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র আমার ভগবৎ বিশ্বাসের যুক্তি কী জানতে চেয়েছিল। আমি তাদের আমার যুক্তি দিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি স্বীকার করি উপলব্ধি থেকে যুক্তি পৃথক। আমার যুক্তি ভুল হলেও তা আমার আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সত্যকে নষ্ট করে না। বাস্তবে এর প্রমাণ হোল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, যুক্তিশাস্ত্রে নয়।

আমার ধর্ম মূলত একজন কবির ধর্ম। আমার সঙ্গীতের মত এর স্পর্শ আসে অদেখা এবং অজানা কোন প্রেরণা থেকে। আমার কাব্যজীবনের মত আমার ধর্মীয় জীবনও এক রহস্যময়তায় আবৃত। যেভাবেই হোক তাদের পারস্পরিক মিলন ঘটেছে। কি ভাবে ঘটেছে সেটা আমার অজানা। হঠাৎ একদিন তাদের সেই মিলন আমার কাছে প্রকাশ পেল।

তখন আমি এক গ্রামে বাস করতাম। অন্যদিনের মতই সেদিনও তার সব তুচ্ছতা নিয়েই এসেছিল। আমার সকালের সব কাজ সেরে আমি স্নান করতে যাবার আগে ক্ষণিকের জন্য আমার জানালায় দাঁড়ালাম। দেখলাম চোখের সামনে শুকনো এক নদীর তীরের বাজার। হঠাৎ আমি আমার মধ্যে একটা অস্থিরতা উপলব্ধি করলাম। আমার অভিজ্ঞতার জগৎ এক মুহূর্তে আলোকিত হয়ে গেল, তথ্যের বিযুক্তি ঘটে অর্থের এক মহান ঐক্য উপলব্ধি করলাম। অনুভূতিটা ছিল এই রকম, একটা মানুষ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, সে জানে না কোথায় তার গন্তব্য। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল সে তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আমার শিশুকালের কথা মনে করি। বাংলা অক্ষর চিনতে চিনতে অপ্রত্যাশিতভাবে আমি একটা অক্ষরের মিলের মধ্যে পড়লাম "জল পড়ে, পাতা নড়ে", ঐ শব্দগুলোর মধ্যে এমন একটা চিত্র আছে যাতে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েছিলাম। অর্থহীন অংশগুলো আমার কাছে একটি দৃষ্টির একতা এনে দিল। এই ভাবেই সেদিন গ্রামের সকালে জীবনের ঘটনা সত্যের এক উজ্জ্বল সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হল। বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মত সব জিনিস সীমাহীন সমুদ্রে সম্পর্কিত হয়ে উঠল। সেই সময় থেকে মানুষ অথবা প্রকৃতি আমার সব অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমি আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মৌলিক সত্যকে বিশ্বাস করে আসছি।

আমি স্বীকার করি, আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অনুভবের মতই আমায় কবিত্বশক্তি আছে। শিশুকাল থেকে আমার চারপাশের মানুষ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে আমার একটা সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ছিল।

আমাদের বাড়ি সংলগ্ন ছিল একটি ছোট বাগান। আমার কাছে ছিল, সেটা পরীর দেশ, যেখানে রোজ নানা সুন্দর অদ্ভুত ঘটনা ঘটত। প্রায় রোজ খুব সকালে বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে চলে যেতাম সেখানে যেখানে নারকেল গাছের পাতার কাঁপনের মধ্য দিয়ে সূর্য উঠত আর ঘাসের উপর শিশিরকণা সূর্যালোকে সকালের হাওয়ায় কেঁপে উঠত। আকাশটাকে মনে হত আমার নিজের সম্পত্তি। আমি আমার সব দেহ মন দিয়ে সকালের সেই শান্ত অবসর পান করতাম। কৃপণের কাছে সোনার চেয়েও আমার কাছে ঐ সকালটা ছিল দামী। সেজন্য আমি কোন সকালই ব্যর্থ হতে দিতাম না।

আমি বিস্ময় অনুভব করার ক্ষমতা পেয়েছিলাম। এই ক্ষমতা নিয়েই একটি শিশু রহস্যময় জগতে প্রবেশ করতে পারে। আমার পড়াশোনায় অবহেলা হচ্ছিল কারণ সেটা আমাকে আমার জগৎ থেকে আমার বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গীদের জোর করে সরিয়ে নিচ্ছিল। সেজন্য আমার যখন তের বছর বয়স তখন যে শিক্ষাপ্রণালী আমাকে পাঠের দেওয়ালে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলাম।

এতেই হয়ত আপনারা আমার ধর্মের অর্থ খুঁজে পাবেন। এই জগৎ আমার কাছে জীবন্ত, আমার জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ। আমার এখনও মনে আছে, যখন কোন ডাক্তারী ছাত্র আমাকে কোন মানুষের কণ্ঠনালী এনে দেখিয়ে ছিল তখন আমি কী বিরক্ত হয়েছিলাম। আমি মিস্ত্রীর নৈপুণ্য ভালোবাসি না, আমি পছন্দ করি শিল্পীর আনন্দ। ভগবান ভূতাত্ত্বিক শিরোনামে তাঁর শক্তি প্রকাশ করেন না, বরং সবুজ ঘাসে, ফুলে, আকাশের নানা রঙে জলের কল্লোলসংগীতে যে সৌন্দর্য আছে তাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। শিশু যেমন তার মায়ের নাম জানে না তেমনি আমিও জানি না কে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে সুর বাজিয়েছে। আমার চারপাশে যে জীবনের সংস্পর্শ আছে তার মধ্যে আমি একটা গভীর ব্যক্তিত্বের সন্ধান উপলব্ধি করি।

আমার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমার চেতনা কখনো একপেশে নয়। আকাশকে কেবল আকাশ, ফুলকে কেবল ফুল বলে মনে করি না। কারণ তারা আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি তাদের সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি না। আমি এখনো স্মরণ করি, একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নেমে হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে দেখি আমাদের উঁচু ছাদের পিছনে জলভরা এক কালো মেঘ হঠাৎ শীতল বাতাস ছেড়েছে, তার অপূর্ব সৌন্দর্য আমাকে এমন আনন্দ দিয়েছে যাতে বলতে পারি মুক্তি; আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে ভালোবাসায় যে মুক্তি সেই মুক্তি।

এই পৃথিবীর কোথাও আমাদের আনন্দ দেবার জন্য একটা উদ্দেশ্যের ব্যবস্থা আছে, শক্তি এবং গতির বাইরেও ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে তা ঘোষিত হয়, এই স্পর্শ কেবল অনুভব করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায় না।

আপনারা এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না যে একটি গোলাপ একখণ্ড সোনার চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। আমি অবশ্য কোন কৃত্রিম মূল্যের কথা বলছি না। আমাদের যদি কোন সোনার বালুময় মরুভূমি অতিক্রম করতে হয় তাহলে ঐ মৃত

কণাগুলো আমাদের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠবে কিন্তু একটি গোলাপের দর্শন আমাদের কাছে স্বর্গীয় সঙ্গীত নিয়ে আসবে। গ্রামোফোন ডিস্ক দিয়ে যেমন সঙ্গীতের আনন্দের অর্থ বোঝায় না তেমনি গোলাপের আনন্দ তার কোন পাপড়ির মধ্যে নয়। গোলাপের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসাকে বুঝি। একটি গোলাপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আনন্দের বিশ্বজনীন ভাষাকে প্রকাশ করি।

ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মে পরম প্রেমিকের প্রতীকের মধ্যে একটি বাঁশি আছে তার বিভিন্ন সুরে প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। এই সুর আমাদের কাছে এক আমন্ত্রণের সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে। তারা আমাদের স্বার্থমগ্ন বিচ্ছিন্নতা থেকে সত্য ও প্রেমের জগতে বেরিয়ে আসতে প্রেরণা দেয়। আমরা প্রেমের এই সুর শুনতে পাই না। সেইজন্য আমরা যুদ্ধ করি, লুণ্ঠন করি, দুর্বলকে শোষণ করি, চতুরি দ্বারা অন্যের জিনিস করায়ত্ত করি, নীল আকাশ এবং ধরণীর বক্ষভেদী ফোয়ারা থেকে যে প্রেমস্রোত আসে তার থেকে সরিয়ে আমাদের জীবনকে মরুভূমিতে পরিণত করি।

বাস্তব জগতে কারখানার গোপন দরজা খুলে আপনি মেকানিকের কাছে এসে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারেন কিন্তু সেটা চরম নয়। গুদাম ঘরে অনেক তথ্য আছে, তা যত প্রয়োজনীয় হোক না কেন তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যে অস্তিত্বের হৃদয়ে প্রেমিক বাস করে সেখানে আছে মিলনের সম্পূর্ণতা। সেখানে পৌঁছে আপনি উপলব্ধি করবেন আপনি সত্যের কাছে, অমরত্বের কাছে এসেছেন। আপনি এক অসীম আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

নিছক তথ্য, নিছক ক্ষমতার আবিষ্কার বাইরের জিনিস, সেখানে অন্তরাত্মার বার্তা নেই। আনন্দই সত্যের এক বৈশিষ্ট্য, আমরা যখন সত্যকে স্পর্শ করি তখন আনন্দের কাছে পৌঁছে যাই। সবধর্মের এটাই মূল ভিত্তি। ঊষা আমাদের কাছে পরিচিত হবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা রাখে না। তেমনি আমরা যখন আমাদের মধ্যেকার চরম বাস্তবতাকে স্পর্শ করি তখন আমরা সৎ বা প্রেমের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করি, তার জন্য কোন তাত্ত্বিকের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

আগেই বলেছি, আমার ধর্ম কবির ধর্ম। আমি যা অনুভব করি তা দৃষ্টি থেকে, কোন জ্ঞান থেকে নয়। মৃত্যুর পরে কি ঘটে কিংবা শয়তান সম্পর্কে আমি আপনাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। তবু আমি নিশ্চিত যে এমন কয়েকটি মুহূর্ত আসে যখন আমার আত্মা অনন্তের স্পর্শ লাভ করে এবং অসীম আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

রাত্রে আমরা চলতে গিয়ে হোঁচট খাই এবং কতগুলি জিনিসের পৃথক সত্তায় সচেতন হয়ে উঠি। কিন্তু দিনের বেলায় সব একাকার হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও যার অন্তর্দৃষ্টি চেতনার আলোকে স্নাত হয় সে তক্ষুণি জাতিভেদাভেদের ঊর্ধ্বে, বস্তুর পৃথক সত্তার ঊর্ধ্বে, অন্তরের সুরলালিত্যের শান্তি উপলব্ধি করে, সত্যকে লাভ করে, সেখানে এমন এক পরম সৌন্দর্য বিরাজ করে, যাকে আধ্যাত্মিক বাস্তবতা বলে। প্রেমের অনুভূতির মধ্যেই তার সার্থকতা।”

২০শে মে রাত্রের ট্রেনে কবি শানসির রাজধানী থাইয়ুয়ান যাত্রা করেন। সেদিন দুপুরে মেই-লান-ফাঙ, লিয়াঙ-ছি-ছাও, ইয়াও-মাঙ-ফু এবং আরও কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদায় ভোজে মিলিত হলেন। এ সম্পর্কে মেই-লান লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেদিন একটা কালো ভেলভেট জুতো পরে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, চীনা জুতো খুব নরম এবং বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে আরামপ্রদ। সেদিন রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে তাও শাঙ বা পশ্চিম পাহাড়ে থাকার সময় চীনের যে সৌন্দর্য দেখেছিলেন তা বলেন। তিনি বলেন, "In the faint warmth of the dawn I have seen there the beauty of a rosy morning, the blue vault in the sky. I also used to gaze silently at the green grasses on the fields and see the willows by the side of the stream just awakened after the dark night, and stirred by the breeze of the dawn. The scenery there has an alluring beauty. ... The other day when I was taking a trip in the suburbs, I saw the peasants squatting on their heels on the mounds of the field holding tobacco pipes by their teeth, and gazing at the far limit of the horizon; they were in a very poetic mood."

রবীন্দ্রনাথ সেদিন The Goddess of the Lo River অপেরা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন। বললেন, চমৎকার পৌরাণিক নাট্যকাব্যের তুলনায় মঞ্চে ব্যবহৃত দৃশ্যগুলি ছিল খুব সাধারণ। রবীন্দ্রনাথ কি করে ছবি আঁকা শুরু করলেন তাও বললেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ মেই লানকে একটি তৎক্ষণাৎ কবিতা লিখে দিলেন :

> অজানা ভাষা দিয়ে,
> পড়েছ ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি প্রিয়ে।
> কুহেলী আছে ঘিরি
> মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি।"

('বিতর্কিত অতিথি' থেকে উদ্ধৃত)

রাত্রে তাঁরা কবিকে বিদায় জানানোর জন্য স্টেশনে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলে বিষাদবোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পেইচিঙ সম্পর্কে বললেন : "After two or three years I intend to come again. I love Peking's simple customs and habits, I love Peking's buildings and monuments, I love friends in Peking; But the trees in Peking have attracted my mind most. I have seen London, Paris, Washington; but I have seen nowhere so many junipers, ceders, pines and willows, Chinese people can be proud of having such an old historical and beautiful capital city like Peking." তিনি মেইলানকে তাঁর অপেরা দল নিয়ে ভারতবর্ষে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

পেইচিং ছেড়ে অন্যান্য শহরে

শানসি প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে কবি ২১শে মে সকালে থাইয়ুয়ানে পৌঁছলেন। শানসির তুচুন বা শাসনকর্তা ছিলেন য়েন শি সান (Yen Shi San)। তিনি ছিলেন কুংফুৎসুর মতাবলম্বী আদর্শ শাসক। কুংফুৎসুর নীতি অনুযায়ী পরিবার হচ্ছে একক, ব্যক্তি নহে; পরিবার সুখি হলে রাষ্ট্রের সবই সুষ্ঠুভাবে চলবে। য়েন-শি-সান তাঁর নতুন রিপাবলিককে ধর্ম ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আন্তরিকভাবে উৎসুক। কবির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি খুব খুশি। কারণ এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘকাল পূর্বে যে আত্মিক বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তাকে নবীকরণ করা সম্ভব হবে। তিনি মনে করলেন যদি ভারত এবং চীন হাত মেলাতে পারে তাহলে এই বন্ধন এশিয়ার পক্ষে উপকারী হবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, আদর্শের এক মহৎ সভ্যতা গড়ে তুলতেই এর প্রয়োজন। কবি বলেন, সমাজে কিছু জীবন্ত আত্মিক আদর্শের প্রাধান্য থাকা উচিত এবং সমাজের এক অংশের হাতে সব ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। এই ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা উচিত।

কীভাবে আবার এটি হতে পারে গভর্ণরের এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের কথা বলেন। তিনি বলেন, উত্তম আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হলে দেশের মানুষের প্রকৃত জীবন-যাপন সম্ভব। গান, নাচ, নাটক, উৎসব, কাব্যের দ্বারা পূর্ণতাকেই তিনি মহৎ আদর্শ বলেছেন। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে এই উত্তম আদর্শ কেন্দ্রীভূত হলে প্রকৃত সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। গ্রামের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে তাদের ভাগ্য তাদের হাতেই আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "Unless the whole people is happy no individual can have true happiness. Unless all are wealthy no man, however rich, can have real wealth. ... This ideal is waiting for our acceptance. The multi-millionaire possess power in his own hands and raises his tower of strength at the expenses of the world. But I want to give the people the responsibility for their own destiny, so that through their self-respect they may help themselves, In this let us work together.

I have been asking Mr. Elmherst to come with some members of his staff to take up some such work in China, just as I hope the day will come when you will send men to help us. I feel that India did once send of her best to China, and once more she must come both to learn and to give, I shall ask your co-operation in return..."

তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পরে কবি বিদায়কালে বলেন,

"I depart then with the hope that you will make it possible for us to help in this work, the work of building up the life of the soil, and

through this spirit of mutual sympathy and co-operation help us to exchange friends and students. It will be a beautiful sight when Indians come to your Chinese villages and Chinese come to our Indian villages, not in order that they may get rich, but to work together as brothers. It is a great work to produce life together, to come down from our conventional attitude to the soil, not to acquire there learning or science, but to find inspiration, to unite in helping to produce the material and spiritual necessities of life. ... Please accept this ideal not merely for your own people in this particular province but as a service to humanity." (V. B. Qly, Oct, 24)

রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব যে Yen Shi San গ্রহণ করেছিলেন সেই খবর জানা যায় এলমহার্স্টের এক চিঠিতে (২৯ মে, ১৯২৪) ঃ

"We have got a promise from Governor Yen in Shanshi of a headquarter for an experiment along the lines of Sriniketan and a Committee in Peaking is to make all arrangements, supply of funds and men if I can come bringing a couple of men for Surul for a few months, March to September inclusive. I think the Peking people will accept General Yen's offer about the Rural Reconstruction scheme and one of the most beautiful spots in China will be placed at our disposal where the summer climate is good dry and not too hot.

(V. B. Bulletin, June, 1924 P. 45)

ডঃ কালিদাস নাগ এই সাক্ষাৎকারকে একজন হিন্দু কবি এবং চীন প্রশাসকের প্রতীকী সভা বলে অভিহিত করেছেন। (M. R. 1924. P. 30)

সেদিন অপরাহ্নে তাই-আনফু কনফুসিয়াস হলে তিন হাজার নাগরিকের বিরাট সভায় কবি আধুনিক অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, ধর্মনীতিহীন ধনিকরা জগতকে মরুভূমির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এই সভায় তিনি 'শহর এবং গ্রাম' সম্পর্কে আলোচনা করেন। চীনের বক্তৃতামালায় এই বক্তৃতাটা সঙ্কলিত হয়নি। North China Herald (7th June) এই দিনের সংবাদ দিয়ে লিখেছিলেন, "The theme of Dr. Tagore on this occasion was village as contrasted with city life. He pleaded for the conservation of village habits, customs and standard of living, opposing the rush of population to the cities." ৯ই জুন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

২২শে মে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কবিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। কবি তাও মন্দির দেখতে গেলেন। সন্ধ্যায় বিদেশী ভাষা বিদ্যালয় গভর্নর য়েনের প্রাসাদে কবির নাটক 'সন্ন্যাসী' অভিনীত করল।

২৩শে মে কবি থাইয়ুয়ান থেকে ট্রেনে উঠে দুদিন কাটিয়ে ২৫শে মে পৌঁছলেন হুপে প্রদেশের প্রধান নগরী হান কৌ। ইয়াং-ৎসে ও হান নদীর সংগমক্ষেত্রে উত্তর ও

দক্ষিণ চীনের মধ্যস্থানে শহরটি অবস্থিত। Hankow, Hanyang and Wuchang-এই তিন শহরকে বলা হোত চীনের শিকাগো। এখানে অক্টোবর, ১৯১১ মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে সফল বিপ্লব শুরু হয়েছিল। এখানে ছাত্র ও বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্যবাদী আন্দোলন দৃঢ়মূল হয়েছিল। অন্যদিকে মধ্য চীনে Abbot Tai Hsi-র নেতৃত্বে বৌদ্ধ পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছিল।

২৫শে মে সকালে Supporting Virtue Middle School-এর প্রাঙ্গণে হানকৌর বৌদ্ধরা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। বিরাট জনসভা হোল। রবীন্দ্রনাথ সবসময় যুবক ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে ভালবাসতেন। বলতেন, চীনে আসার তাঁর দুটি কারণ। এক, চীনের যুবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং দুই, ভারতের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এর প্রাচীন সংস্কৃতিকে জানা।

কবি সেদিনও বলেছেন, "On your shoulders, my beloved young people, lies this responsibility. Like the dawning of the rising sun, you young people are full of promise. You have a great responsibility and you should advance with determination. Do not let our Eastern civilization imitate whatever is done on Western civilization. I hope very much that more Chinese students will come to India to study the principles of Chinese and Indian culture, for these two cultures are intimately related. Young people, I urge you to exert your-selves." (Hay P. 181)

কবির এই বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই দর্শকের মধ্য থেকে চীনা ভাষায় কিছু যুবক চিৎকার করে বলল, "পরাধীন দেশের দাস ফিরে যাও।" "আমরা দর্শন চাই না, বস্তুবাদ চাই।" এই স্লোগানের সঙ্গে তারা প্লাকার্ড নাড়তে লাগল। কালিদাস নাগ দ্রুত ছুটে গেলেন এবং স্লোগানগুলির অর্থ বুঝতে পেরে শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন এরা হয়ত কবিকে আক্রমণ করতে পারে কিন্তু তার কিছুই হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ অপরিকল্পিতভাবে সেদিন বিকেলে হঠাৎ পাশের শহর উচাঙে শ-পাঁচেক লোকের এক সমাবেশে পেইচিঙে ছাত্রদের সামনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা পড়ে বললেন, "শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বর্বরতার লক্ষণ; যে সব জাতি এর উপর নির্ভরশীল তারা ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অথবা বর্বর থেকে গিয়েছে।"

সেদিন রাতেই নদীপথে সাংহাই-এর দিকে কবি যাত্রা করলেন।

২৮শে মে কবি সকালে সাংহাই পৌঁছলেন। এবার তিনি বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইতালিয়ান জি. এ. বেণার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

২৯শে মে জাপানী বিদ্যালয়ে এক সম্বর্ধনায় কবি ভাষণ দেন। সম্ভবত মিসেস বেণা এর উদ্যোগী ছিলেন। এই সভায় কবি শিশু শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন। পেইচিঙে ইংরেজী শিক্ষকদের কাছে যা বলেছিলেন এখানে সে কথাই বললেন। বললেন, শিশুমনের উপর কৃত্রিম এবং যান্ত্রিক শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

সেদিন বিকেলে চীনের বুদ্ধিজীবীরা সাংহাই-এর চাঙ চুন মাই-র বাড়ির উদ্যানে

যেখানে সাত সপ্তাহ আগে কবিকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল সেখানেই কবিকে বিদায় জানাতে এলেন। এই সভায় চাঙ চুঙ মাই অতিমিত প্রশংসা করে তাঁকে খোলাখুলি চীনের বর্তমান ধারা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা জানাতে বললেন। বিদায়বেলায় কবির কণ্ঠে ছিল বিষণ্ণতার সুর। তিনি বলেছেন :

"এই সভা আমাকে যে দিন চীনে এসেছিলাম তার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি এসেছিলাম অপরিচিতের মত। যারা আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছিল আমি তাদের কাউকে চিনতাম না। আমি ভাবলাম আমি যে ছবি দেখেছি চীন কি সত্যি তার মত এবং আমি কি এই দেশের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারব। আমার মন ছিল উদ্বিগ্ন, আমি সব সময় ভাবতাম তোমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যাবে সেজন্য আমি আমার সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে তোমাদের বলেছিলাম আমি একজন কবি ছাড়া কেউ নই।

আমি জানতাম সারা পৃথিবী থেকে বড় বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমাদের দেশে এসেছে যাদের জ্ঞানের কথা তোমরা শুনেছ, সেখানে আমি তোমাদের কাছে একজন বিনীত মানুষ। আমি একটা মিথ্যা পরিচয়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি বলে লজ্জিত ছিলাম। আমার নাটকের চিত্রার কথা মনে পড়ল, সে মদন দেবতার কৃপায় তার সৌন্দর্য লাভ করেছিল। তার এই স্বর্গীয় মোহের দ্বারা সে তার প্রেমিকের হৃদয় জয় করেছিল; কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল এই ছদ্মবেশের জন্য সে তার প্রেমিকের সব ভালোবাসা গ্রহণ করতে পারছে না তখন সে ঐ সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

চীনে অবস্থানের শেষ দিনে উপনীত হয়েও আমি যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা আগের মতই আমাকে মধুর কথায় গ্রহণ করছেন তখন মনে হয় আমি আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আজ আমি আপনাদের প্রেম সহযোগিতা এবং প্রশংসার জন্য আরো লোভী হয়ে উঠেছি। আমি দূরে চলে গেলেও এই সন্ধ্যাকে নানা বর্ণে অত্যুজ্জ্বল সূর্যাস্তের মত মনে রাখব। অবশ্য আমার কিছু সংশয় আছে। আপনাদের যারা আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন তারা এখনো কিছু বলেননি। আমাদের সঙ্গে থেকে যে বন্ধুদের দুর্ভাগ্যজনক অসুবিধে হয়েছে তাদের কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় আছি।

আমারও কিছু প্রত্যাশা ছিল। আমি যৌবনে যখন আরব্যরজনী পড়ি তখন রোমান্টিক চীন সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব ধারণা ছিল, তারপরে যখন জাপানে এলাম তখন আরেক চীন সম্পর্কে ধারণা পেলাম।

সেখানে আমার আশ্রয়দাতার চীনের চিত্রকলার একটা সংগ্রহ ছিল। তিনি এক এক করে আমাকে দেখিয়ে ঐ সব মহান শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে বিস্মিত করেছিলেন। এ ভাবে আমার বৃদ্ধ বয়সে আপনাদের মহান শিল্পীদের চিত্রের মধ্য দিয়ে আমার চীনকে গ্রহণ করেছিলাম। আমি নিজে নিজেই বলতাম চীনারা মহান। তাঁরা এক সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। যারা আপনাদের সম্পর্কে অসম্মানকর কথা বলত, যারা আপনাদের শোষণ এবং ধর্ষণ করতে এসেছে, যারা আপনাদের মহান সভ্যতার কাছে

ঋণী হয়েও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত আমি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতাম।

অবশ্য আমি জানতাম আপনাদের অতীত এবং আপনাদের ইতিহাসের এই উত্তম সৃষ্টি আপনাদের জনগণের প্রকৃত অবস্থাকে প্রতিফলিত করে না তবু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই আদর্শ থেকেই আপনাদের বাস্তব অবস্থাকে ভালভাবে বোঝা যাবে। একজন বিদেশীর পক্ষে অন্তর্গূঢ় সত্যকে আবিষ্কার করা শক্ত কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তার ক্ষীণ আলো গ্রহণ করতে পেরেছি।

আপনারা অত্যন্ত মানবিক। অন্যান্য বিদেশীর মত আমিও আপনাদের মধ্যে এই মানবিক স্পর্শ লাভ করেছি এবং আপনাদের হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছি। আমি যাদের সংস্পর্শে এসেছি তাদের কেবল প্রশংসায় আমি তুষ্ট নই, আমি তাদের ভালোবাসায় মুগ্ধ। এই ব্যক্তিগত স্পর্শলাভ সহজ কথা নয়।

অনেকে বলেন আপনারা আপনাদের সামনে আকর্ষণীয় নয় বাস্তবকেও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন। এই গুণের জন্যই আপনারা আমাকে কবি হিসেবে নয়, কিছু লোকদের মতে দার্শনিক হিসেবে নয় কিংবা আরো লোকদের মতে ঋষি হিসেবে নয়, একজন ব্যক্তি হিসেবেই গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি চীনের কিছু যুবক বন্ধু আমার বয়স এবং গুরু খ্যাতি উপেক্ষা করেও তারা আমাকে তাদের বয়সী মনে করে গ্রহণ করতে পেরেছে।

আপনারা আমাকে কিছু সমালোচনা করতে বলেছেন। আপনাদের অনেক সমালোচক আছেন, আমি তার সংখ্যা বাড়াতে চাই না। মানুষ হিসেবে আপনাদের কিছু ত্রুটি থাকলেও সেগুলি নিয়েই আমি আপনাদের ভালবাসি।

আপনারা আমার কাছ থেকে কোন সমালোচনা পাবেন না, আপনারাও আমাকে কোন সমালোচনা করবেন না। আমি নিজেকে দার্শনিক হিসেবে মনে করি না। আমি কোন পাদভূমির উপরে বাস করি না, তাই সেখান থেকে ফেলে দেওয়ার প্রশ্নও উঠে না। আমি যেহেতু একই স্তরে বাস করি সেজন্য আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি।

আমার যা সম্ভব তা করেছি, আমি বন্ধু করেছি। আমি খুব বেশি বুঝতে চেষ্টা করিনি, আপনারা যেমন আছেন সেভাবেই আমি গ্রহণ করে এই বন্ধুত্বের স্মৃতি নিয়ে যাচ্ছি।

আপনাদের কিছু দেশপ্রেমিক ভীত হয়ে মনে করেছিলেন আমি ভারতবর্ষ থেকে কিছু আধ্যাত্মিক রোগ নিয়ে এসে আপনাদের অর্থ এবং বস্তুনীতিকে দুর্বল করে ফেলব। আমি তাদের আশ্বস্ত করে বলতে পারি আমার থেকে কোন অন্যায় হবে না, আমি আপনাদের অগ্রগতি রোধ করে দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি কোন নাস্তিককে বলি নি যে তার আত্মা আছে, আমি বলিনি বস্তুগত শক্তির চেয়ে নৈতিক মূল্য বেশি। আমি নিশ্চিত যে তারা যখন পরিণামের কথা জানতে পারবেন তখন তারা আমায় ক্ষমা করবেন।" (T. C.)

রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা সম্পর্কে শু-চি-মো বললেন, রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর অনুভূতি,

হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তাঁর হাসি সেই হাসি ছিল না। হাসির মধ্যেও আমরা কখনো কখনো অশ্রু দেখতে পাই।

এই শেষ দৃশ্যের পরে কবিকে আন্তরিক বিদায় জানাল শহরের ভারতীয় সম্প্রদায়। মুসলমান, পার্শী এবং হিন্দুরা পৃথক পৃথকভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ দান করে কবির আদর্শের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল।

জাপান কবির আগমনের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল। সাংহাই-এর জাপানী বস্ত্র শিল্পের প্রধান সাংহাই-মারু নামে এক বিশেষ জাহাজে করে কবিকে বিনাব্যয়ে জাপানে পৌঁছে দিলেন।

চার সপ্তাহ পরে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় কবির জাহাজ একদিন সাংহাই বন্দরে ছিল। কবি অসুস্থতার জন্য বন্দরে নামেন নি। তারপর যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং-এ পৌঁছলেন তখন তিনি বন্দরে নেমে কনফুসিয়াস ক্লাবে এক চীনা সমাবেশে বললেন, "I am nothing but a poet. But let my poet's verses represent the great heart of Asia brooding on immortality–that voice, silent for centuries yet again speaking in no uncertain tones today. For I assure you, I feel the need of it in my wanderings around the world." (Shanghai Times, 11 July, 1924)

চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালেও তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন :

"চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।... নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয়নি, এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখ স্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিকসের ইতিহাসে স্থান পায়নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।" (বৃহত্তর ভারত, কালান্তর)

চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার কথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যখনই সুযোগ পেয়েছেন, প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তা ছড়িয়ে আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

কবির চীন ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া

কবি মোট বাহান্ন দিন চীনে ঘুরলেন। তাঁর এই ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি জাপান ঘুরে চারমাস পরে ২১শে জুলাই, ১৯২৪ ফিরে এসেই য়ুনিভার্সিটিইনস্টিটিউটের এক বিরাট জনসভায় বারবার চীনের শ্রমজীবী মানুষের কথা বললেন, "মালয় উপদ্বীপে শ্রমজীবীদের যে দৃশ্য দেখেছি চীন দেশে দেখেছি ঠিক তার উল্টো। মালয়বাসীরা যেরূপ শ্রমবিমুখ, চীনেরা ঠিক বিপরীত। এমন শ্রমশীল ও কর্মঠ জাত পৃথিবীতে বোধ হয় আর দুটি নাই। ... সেই জন্য আমেরিকা চীনদের ঢুকতে দিতে ভয় পায়। ... কয়লা, কেরসিন তৈল, পেট্রোল এই সমস্ত মানুষের কাজে লাগে। যেখানে এই সব খনি আছে, সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে ধনীরা এসে হাজির হয়। চীনের মানুষের শ্রমশক্তিও ঠিক তেল-কয়লার মত সঞ্চিত পুঞ্জীভূত জিনিস, মানুষের লোভের জিনিস, তাই আমেরিকান ও ইউরোপীয় ধনীরা ওখানে এসে জুটেছে। আমেরিকায় ইউরোপে শ্রমজীবীদের সঙ্ঘ আছে। একটা সুগঠিত দাবী আছে ওখানে ও সে সব কিছু নাই, তাই শোষণের সুবিধা হয়।" (ভূমিলক্ষ্মী নবপর্যায় ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

সেদিন রবীন্দ্রনাথ আরও বললেন, "নিছক সম্মান পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সেখানেও একদল লোক আছে, তাও বলি তাদের দল খুব ভারি নয়—তারা বললে এ লোকটি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করছে, এখন আমরা এই সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী, বৌদ্ধধর্ম যা দিয়েছে শুনতে পারিনে। তাতে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা প্রভৃতি খর্ব করেছে। এ লোকটি একে কবি তাতে ভারতবাসী ও আমাদের মাথা খারাপ করতে পারে।"

"...একটি কথা আপনাদের কাছে বলব, এরা কিম্বা আর যে-কোন বিরুদ্ধবাদী কেউ থাকুক না, আমাকে কেউই অসম্মান-সূচক কিছু বলে নি, Personality নিয়ে কিছু বলেনি। বারবার বলেছে, 'আমরা এঁকে অপমান করতে চাইনে, এঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে।' আতিথ্যের বিরোধী কোন কাজ তারা করেনি, ভদ্রতা রক্ষা করেছে। তারা বলছে' এতে তাদের ক্ষতি হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি তাদের কোন বিরোধ নেই। যদিও বক্তৃতার ফলাফল লক্ষ ক'রে তা'রা বিচলিত হয়েছে। কটু কথা বলে নি,

চিরাচরিত হলতা বিস্তৃত হয় নি। সুতরাং এ যুগের যে-সাধনা সেইটিই সর্বপ্রথম জাপানে তা দেখেছি।" (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩১)

রবীন্দ্রনাথ চীনে যাওয়ার আগের থেকে তাঁর সম্পর্কে একদিকে যেমন প্রবল উচ্ছ্বাস অন্যদিকে কিছু আশঙ্কা এবং বিরূপ সমালোচনাও দেখা দেয়। এই সম্পর্কে আমরা আগে কিছু উল্লেখ করেছি।

তানচুঙ লিখেছেন (স্টেটসম্যান ২০ জুলাই ১৯৮৬) চীনের একজন প্রধান কমিউনিস্ট নেতা ছু-চি ১৯২১ সালে লক্ষ্য করেছেন এক যুগ আগে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণ চীনে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। তারা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে একজন প্রতিবেশী এশিয়ান ইউরোপের সর্বত্র এমন আগ্রহী অভ্যর্থনা লাভ করছেন, সেখানে হাজার হাজার মানুষ প্রাচ্যের সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর কথা শুনবার জন্য ভীড় করছে। তারা লক্ষ্য করেছে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে তাদের জড়বাদের সমন্বয় করার জন্য প্রাচ্যের সংস্কৃতি গ্রহণের উপর জোর দিচ্ছেন।

প্রখ্যাত তরুণ কবি শু চি মো ১৯২৪ সালে লিখেছিলেন, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে যিনি বিশ্বজনীন শ্রদ্ধা ও খ্যাতি লাভ করতে পারেন তিনি ধনী এবং বাহ বলে বলীয়ান জাপান কিংবা স্বাধীন সার্বভৌম চীন দেশ থেকে হবেন না, যে দেশ মরে গিয়েছে সেই ভারত থেকেই আবির্ভূত হবেন, এই ঘটনা কি আমাদের মধ্যে আত্মসমীক্ষার কারণ হবে না। ১৯৮৩ সালে হংকং থেকে প্রকাশিত শু চি মো-র রচনাবলীতে এসব কথা আছে। শু চি মো ছিলেন যথার্থ রবীন্দ্র অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, "He is a live fountain, every running drop from his heart is the seed of life, He is the roaring of the waterfall, running unceasingly among the white clouds, in the green forests and rocky caves. He is the song of the lark with his joy and fury blending into loud harmony and lingering in the boundless sunny sky." (Hay)

বৈদেশিক কয়েকজন পর্যবেক্ষকের মতে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ খুবই সার্থক। এলমহার্স্ট বন্ধা রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, এই ভ্রমণ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে, ভবিষ্যতে এর ফল খুবই ভাল হবে। এই ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি Modern Review July, 1924 পত্রিকায় লিখেছিলেন, "India lives in the mind of China to-day. "Indolaide" from India is the remark constantly heard as we passed through the streets and the words are full of a meaning which however sentimental, however tinged with the associations of time worn ceremony and convention is apparently very real."

Tientsin-এর একজন ইংরেজ শিক্ষক লিখেছেন, "The coming of Tagore from India with his great awakening light was halied with rejoining by Govt. students and scholars." (Hay)

আমেরিকান প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের মুখপত্র Chinese Recorder লিখেছে, "the

visit of Dr. Rabindranath Tagore to China during the month of May called forth such a welcome as has been given to few visitors in recent years."

আমেরিকান রিপোর্টার লিখেছিল রবীন্দ্রনাথ যেমন তার বিরোধী সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি গবেষক এবং ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জাগিয়েছিলেন। সাংহাই-এর একজন ব্রিটিশ ডাক্তার অবশ্য মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ চীনের বর্তমান তীব্র জাতীয়তাবাদের সঙ্কটে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেন নি। China Journal of Science and Arts সহানুভূতির সঙ্গে লিখেছেন, "Tagore is an exponent of the belief that the Asiatic, be he Indian Chinese or Japanese, should endeavour to live up to all that is best in his own rich but serene culture rather than to strive so ardently after the hectic civillization of the West with all its engines of war and restlessness." অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এঁরাও লিখেছিলেন যে এই কারণেই তিনি তাঁর সাম্প্রতিক ভ্রমণে চীনা যুবকদের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

চীনাদের সংবাদপত্র পিকিং ডেইলি লিখেছেন, "This is a moment when acute materialism needs to be supplemented by the merits of Oriental culture. It is exactly in this respect that Tagore is the man of the hour."

Ta Wen Pao (great culture) কবিকে পিকিঙে সাদর অভ্যর্থনা জানালেও সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কতা চীনাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

চীনের বৃহত্তম শহর সাংহাই-এর সবচেয়ে সম্মানিত দৈনিক শেন পাও প্রথমে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করলেও পরেরদিন পরে তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা 'শিয়াও শুও য়ুএ পাও' বা মাসিক ছোট গল্প (বিতর্কিত অভিধিতে বলা হয়েছে 'কথা সাহিত্য')-এর সম্পাদক চেঙ চেন তো-র কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তিনি সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, "পশ্চিম, এমন কি সমস্ত পৃথিবী আজ রক্ত-লাল মেঘে এবং ঈর্ষার ঘূর্ণি-ঝড়ে আবর্তিত। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে, গলকণ্ঠে প্রতিহিংসার গান গাইছে, লোহা ও বন্দুকের সুরের সঙ্গে মত্ত হয়ে নাচছে। তাদের অপরিমাণ লোভ বিষধর ড্রাগনের মতো মুখ ব্যাদান করে পরস্পরকে কামড় দিচ্ছে। সমস্ত মানবজাতি, সমস্ত পৃথিবীকে তারা গ্রাস করতে চায়। কত শক্তিশালী সুপুরুষ মৃত্যুবরণ করেছে, কত শান্তিকামী মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, কত সুদৃশ্য গৃহ ধ্বংস হয়ে গেছে, কত জেড ও মুক্তোর মতো প্রস্রবণ শুকিয়ে গিয়েছে, কত সবুজ ঘাস রক্তের দাগে লাল হয়ে গেছে। কত দূর-প্রসারিত অরণ্য বারুদের আগুনে জ্বলে খাক হয়ে গেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট পুরুষের মতো

হিমালয় ও আলপ্সের চূড়ায়, ভোরের শান্ত উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে মানুষের কাছে শান্তি ও প্রেমের বাণী উচ্চারণ করছেন।..." (মূল চীনা থেকে তান ওয়েন দুয় অনুবাদ। বিতর্কিত অতিথি)

চেঙ ফেন ভো ছিলেন সাহিত্য গবেষণা-সভা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, মাও তুন এর নিউর সহকর্মী, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

চীনের ঔপন্যাসিক শেন ইয়েন পিং যিনি পরে 'মা তুন' নামে বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংহাই পৌঁছবার পরে লিখেছিলেন, "আমরা শুধু ব্যক্তিত্বের কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি, যিনি দুর্বলের প্রতি সংবেদনশীল, অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতিশীল, তিনি কৃষকদের সহায়ক, তিনি দেশপ্রেমের উদ্দীপক এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় তরুণদের জাগিয়ে তোলেন।"

"কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে প্রাচ্য সভ্যতার জয়গান করেন, যিনি কাব্য এবং প্রেমের স্বর্গ রচনা করে আমাদের তরুণদের তন্ময় পাগল এবং আত্মসন্তুষ্ট করে তোলেন তাঁকে আমরা কিছুতেই স্বাগত জানাব না।...দেশের ভিতরে যুদ্ধবাজ এবং দেশের বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা যখন আমরা নির্যাতিত তখন স্বপ্ন দেখার সময় নয়।" বরং এই সময়ে উ ছি-হুই (Wu Chih-hui) যেমন বলেছেন "শত্রুর মেশিনগানের মোকাবিলা চীনের মেশিনগান এবং ওদের কামানের উত্তর আমাদের কামান দিয়ে দাও" সেটাই বলাই ভাল। (ঐ)

জাপান যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ আবার যখন সাংহাই এলেন তখন মা তুন লিখেছেন, "আমি একজন প্রাচ্যদেশীয়, চীনে জন্ম এবং বড় হয়েছি তবু আমি স্বীকার করছি প্রাচ্য সভ্যতা কি আমি জানি না। আমি চীনা এবং বিদেশী বইয়ের মধ্যে তাকে জানতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। আমি রবীন্দ্রনাথের বই বিশেষ করে জার্মানীতে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা পড়েছি। আমি মনে করি তিনি প্রাচ্য সভ্যতা প্রচার করার জন্য চীনে এসেছেন তিনি আমাকে এই সম্পর্কে অন্যের চেয়ে ভাল বলতে পারবেন। সেজন্য আমি সতর্কভাবে সাংহাই, পিকিং এবং অন্যত্র তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার বিবরণ পড়েছি।...এই সব বিবরণের মধ্যে আমি কবিত্ব হেঁয়ালি ছাড়া আর কিছু পাইনি। এভাবে আমি হতাশ এবং অসুখী হয়েছি। এর চেয়ে বেশি বললে আমার মনে হয় এই লোকটি একজন প্রতারক।" (Hay P 201)

মাও তুনের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের পাঁচ দিন পরে রবীন্দ্রনাথ যখন নানচিংয়ের দিকে যাচ্ছেন তখন 'চীনা যুবা পত্রিকা'র সম্পাদক এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা য়ুন তাই ইঙ (১৮৯৫—১৯৩১) লিখেছেন, "আমরা কোনো বিদ্বেষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করব না। তবে অন্যরা তাঁকে ব্যবহার করতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলেই আমাদের তাঁকে সমালোচনা না করে উপায় নেই।" (বিতর্কিত অতিথি পৃঃ ৫০)

গুয়ো মোরো-র (১৮৯২—১৯৭৮) কথা আগে লেখা হয়েছে। তিনি ১৯১৪ সালে

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নুশেন' বা দেবীগণ-এ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। তিনি ১৯২৩ সালের অক্টোবরে 'রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ সম্পর্কে আমার অভিমত' শীর্ষক দীর্ঘ রচনায় তাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্বীকার করেও লিখেছেন, "আমার বিশ্বাস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে দেখলে আমরা সংসারের যাবতীয় ঘটনার একমাত্র নির্ধারিত যাত্রাপথ যে কি তা নিরূপণ করতে পারবো। জগতে এখনও যখন অর্থশাস্ত্রের নিয়ম কানুন বদলায় নি, সেই সময় ব্রহ্মার প্রয়াস, 'আত্মন'-এর গরিমা 'প্রেম'-এর বাণী কেবলমাত্র কর্মবিকল মনুষ্যদের অহিফেন বা তাড়ি; নিঃস্বদের পক্ষে অনবরত শরীরের ঘাম আর রক্তক্ষয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সমন্বয়ের প্রচার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক বিষ; সমন্বয়ের প্রচার হচ্ছে বিত্তবানদের ছলনার আশ্রয়, নিঃস্বদের লৌহশৃঙ্খল। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় চীন দেশে আসছেন বললে আহ্বানকারীর মতে আমাদের যথেষ্ট অভিযোগ থেকে যায়। যে ব্যবস্থাপকরা আমন্ত্রিত করে রবীন্দ্রনাথকে চীন দেশে নিয়ে আসছেন সে তাঁর চিন্তাধারার কোন্ দিকটি দেখে? ওঁর কাছ থেকে কি প্রকার উপদেশ তারা আশা করেন? আমাদের এই মতামত সম্পর্কে বক্তব্য শুনবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম।" (অনুবাদক অমিতেন্দ্র ঠাকুর, ভারত-চীন পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০ শকাব্দ)

ঝাঙ ওয়েনতিয়ান (Zaang Wentian) ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করে লিখেছিলেন, "His songs are permeated with lively words and burning thoughts. His words gladden our ears. His thoughts penetrate into our hearts. His poetry is also the light that shines upon our hearts, the song that stirs human blood, the hymn that excites people. Oh, Tagore, the Tagore of the Indians, the Tagore of entire mankind! He unfolds his talent and unfolds his life to offer to Indians, to offer to the world!" দু বছর পরে ঝাঙ ওয়েনতিয়ান চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং তারও ১০ বছর পরে মাওৎসে তুঙকে পার্টির সভাপতি করার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। (তান চুঙের লেখা)

কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্ভবত চীনদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবাদক চেন তু শিউ (Chen Duxiu) চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র 'শিয়াং তাও' (Xiangdao) পত্রিকায় 'শিয়ান' (Shian) এর ছদ্মনামে আক্রমণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের কার্যসূচী পড়তে পড়তে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন, "চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে যুবকদের উপর নির্ভর করে, রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব তাদের উপর একটা অসুস্থ তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা Qu Quibai এপ্রিল, ১৯২৪ The Guide Weekly পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য সংস্কৃতির সমালোচনা করে বলেছিলেন, "ধন্যবাদ, মিঃ টেগোর! চীনে অনেক কনফুসিয়াস এবং মেনসিয়াস আমরা পেয়েছি।"

Hu Shih যিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে John Dewey-র অধীনে পি.এইচ.ডি. করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারপত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন, Whether you approve or disapprove of his way of teaching matters little ... China is known as a country of people who act properly and we must deserve this reputation. If we wish to live up to our traditional politeness and hospitality, we must receive Dr. Tagore with respect.

Furthermore, Tagore's personality ... his spirit of literary revolution, his sacrifice for rural education, his movement of rural co-operation, all deserve our respect, to say nothing of his personality, his benevolent countenance, and his humanitarian spirit." (Hay P 217)

কুয়োমিনটাং দলের দার্শনিক নেতা, Wu Chi hui ১৯১৫ সালের নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গোঁড়া সমর্থক যিনি বলতেন "Take all those old books and throw them into the privy for thirty years" তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "Mr. Tagore ... a pertrified fossil of India's national past has retreated into the tearful eyes and dripping noses of the slave people of a conquered country, seeking happiness in a future life, squeaking like the hub of a wagon wheel that needs oil..." (Hay).

রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে আসেন চৌ ভ্রাতারা তখন পেইচিংএ ছিলেন। এই চৌ ভ্রাতারা হলেন চৌ শুরেন (Chow shu-jen) যিনি লু শুন নামে বিখ্যাত, অপরজন হলেন চৌ-শো-জেন। দুইজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লু শুন আধুনিক চীনের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় নাম। তিনি সেই সময় এবং পরেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। ৮ই মে-র রবীন্দ্র জন্মদিন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আগেই উদ্ধৃত করেছি। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "গত দু বছরে যে চারজন বিখ্যাত লেখকের চীনে এসে দেওয়া ভাষণ শুনেছি তার মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন সেই বিখ্যাততম রবীন্দ্রনাথ, চু চেন তান, দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ভারতীয় টুপি-পরা অনুচরেরা এমন গোল পাকাল যে তিনি বিভ্রান্ত অবস্থায় চলে গেলেন।" (লু শুন চুয়ান চি ৩ পৃঃ ২৫১) ২৭মে, ১৯২৪ ঘনিষ্ঠে এক চিঠিতে লু শুন প্রায় এই কথাই বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথকে যদি জীবন্ত দেবতায় পরিণত না করা হত, তাহলে হয়ত আমাদের তরুণেরা আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি থেকে এত বিচ্ছিন্নতা বোধ করত না।" (লু শুন চুয়ানচি, ২১, পৃঃ ৪২৭) তিন বছর পরে (১৯২৭) লু শুন হংকংএ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "মূক জাতিগুলির মধ্যে আজ একটিই কণ্ঠস্বর শোনা যায়— সেই কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের।" এই বছরেই তিনি "The old song has been sung long enough" রচনায় লিখেছেন, "Almost all of those who praise the old Chinese culture are the rich who are residing in the concessions or other safe places. They praise it because they have money and do not suffer from the civil wars. ... Chinese culture is a culture of serving one's masters, who are triumphant at the cost of the misery of the multitude. Those who praise Chinese culture whether they be Chinese or foreigners, conceive of themselves as belonging to the ruling class."

লু শুনের ছোট ভাই পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Chow Tao-jen বারবার বলেছেন, আমি ঠাকুরের বুঝি না। তাঁকে নিয়ে এত আলোড়নের কোন অর্থ হয় না। অতিথি হিসাবে আমরা তাকে স্বাগত জানাব। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তৃতায়ও তিনি যোগ দিতে নারাজ।

এই প্রসঙ্গে অনেক চীনা সাহিত্যিক সেন-না-কাল লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ যখন চীন ভ্রমণে এলেন তখন চীনের সাহিত্যিক সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত। সাহিত্য সৃষ্টির পন্থার তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে মতবিরোধ থাকায় চীনের কবি ও লেখকগণ তখন ভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করছিলেন। ডাঃ হু শু, লিয়াং চি চাও, শু চুমো প্রভৃতি 'শিল্পের জন্যই শিল্পসৃষ্টি' এই মতবাদ প্রচার করছিলেন। আর লু শুন, মাও তুন, কুও মোজোওজেন চি-ৎসে প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ প্রচার করছিলেন, 'বাস্তবধর্মী ও বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টিই সাহিত্যিকের ধর্ম।' এরা সকলেই অবশ্য প্রথম যুগে একযোগে কাজ করেন নি। সাহিত্যের এই মূল তত্ত্বগত প্রশ্ন নিয়ে চীনের সাহিত্যিক মহলে যখন তুমুল আলোড়ন চলছে তখনই রবীন্দ্রনাথের চীনে আগমনের কথা ঘোষিত হল।

"রবীন্দ্রনাথকে চীনে যারা আহ্বান জানালেন তারা ছিলেন উপরোক্ত প্রথম দলের নেতৃবর্গ। কবি সুই চি মো ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দোভাষী। এঁরা ভাবলেন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও সাহিত্য সৃষ্টিতে এই বিশ্ববিখ্যাত কবির অভিমত তাদেরই মতবাদের সহায়ক হবে। অপরপক্ষ তখন রবীন্দ্রনাথের মতবাদ চীনের গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রচার করতে শুরু করেন। ফলে তৎকালীন চীনের সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে আলোচনার অবতারণা তারা করলেন তাতে আক্রোশটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ততটা ছিল না যতটা ছিল প্রতিপক্ষকে এই সুযোগ থেকে নিরস্ত করবার প্রয়াস। আসলে কিন্তু এই দু-দলের কোন সাহিত্যিকেরই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তখন সঠিক কোন ধারণা ছিল না। এরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'প্রকৃতির কবি' বা 'প্রেমের কবি' বলেই জেনেছিলেন।..." (আন্তর্জাতিক পত্রিকা রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা)

তিনি চীনা সমালোচকদের বিশেষ করে ওয়েন-য়ি তোর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে লিখেছেন "ওয়েন-য়ি তোর রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান গীতাঞ্জলি, 'Fruit gathering', 'Gardener', এবং 'Cresent Moon' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।..."

রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া ঃ

মিঃ হে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় প্রধানত তিন ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা এবং সংগঠন ছিল।

তখন সর্বত্রই যুদ্ধবাজ রক্ষণশীলরা ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা লড়াই করছিল। তৃতীয়, ছোট হলেও ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টি।

ঘটনাক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আচরণ এবং কথাবার্তায় রক্ষণশীলদের সঙ্গেই নিজেকে জড়িত করে ফেলেছিলেন। যে-কোন পর্যটকের মত তিনি দেখলেন চিনের প্রাচীন সংস্কৃতি, কনফুসিয়াসের কবর, সাক্ষাৎ করলেন রাজতন্ত্র এবং প্রাচীন রীতি নীতির প্রতীক প্রাক্তন মাঞ্চু-সম্রাটের সঙ্গে, আলোচনা করলেন যুদ্ধবাজ প্রদেশপালের সঙ্গে। তিনি চাইলেন চিনের গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে যাতে ঐক্যবদ্ধ একটা দেশ তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে পারে, প্রশংসা করলেন শানসির কনফুসিয়াসের মতবাদের অন্ধ শাসক য়েনশিশান তু চুন বা যুদ্ধবাজকে। তিনি বক্তৃতা দিলেন জাপানী এবং আমেরিকানদের কাছে যাঁদের জাতীয়তাবাদীরা যাদের বিদেশী শক্তি মনে করে এবং যে বিদেশীরা চিনের মাটিতে থেকে নানা প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে চিনকে শোষণ করছে, হংকং থেকে তিনি তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য দান গ্রহণ করলেন। এভাবে কবি প্রায় অজ্ঞাতেই চিনের জাতীয় আন্দোলনের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রুদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। এই জটিল পরিস্থিতিতে যারা বিদেশী শক্তির প্রভাব থেকে একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল চীন সরকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই সব বুদ্ধিজীবীর পক্ষে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

অথচ সান ইয়াৎ সেনের আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের অনেক মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন আর সান চেয়েছিলেন চিনের রাজনৈতিক সত্তার পুনর্জাগরণ। তবু সান রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তুলছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে ক্যান্টনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে তাঁর একান্ত আপনজনকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও সঙ্গীদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন চিনে যান তখন আধুনিক চিনা দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সাম্যবাদের আদর্শ ছিল বেশ জোরালো। তাঁরা তার মধ্যে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের এক সুন্দর সমন্বয় দেখতে পেয়েছিলেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন চেন-তু-সিউ। তিনি রবীন্দ্রনাথের তখন কড়া সমালোচক। ১৯১৫ সালেই মাসিক নতুন যৌবন পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতের পলায়নবাদী কবি' বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার তিনি এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে দেশাত্মবোধক কবিতা নির্বাচিত করে অনুবাদ করেছিলেন। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সংবাদ শুনেই তিনি লিখেছিলেন, "বৌদ্ধবাদ, লাওৎসু এবং চুয়াংৎসুর বিশৃঙ্খল চিন্তাধারায় আমরা অনেক ভুগেছি, ভারতবর্ষ থেকে আমরা যে দান পেয়েছি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাকে বাড়ানোর জন্য আর আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন নেই।"

রবীন্দ্রনাথের সাংহাই পৌঁছবার পরেই চেনের নেতৃত্বে প্রচার শুরু হয়। তার প্রধান মুখপত্র হলো পার্টির দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা চুঙ-কুও চিঙ-নিয়েন (চিনের যৌবন) এবং প্রজাতন্ত্রবাদী ছাত্রদের কাগজ সিঙ তাও (Hsing Tao) or Guide পত্রিকায়। এই সব পত্রিকা পার্টির লোকদের মধ্যেই চলত। তৃতীয় কাগজটি ছিল কুওমিনটাঙ কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক সম্পূরক জুয়ে-উ Chueh-Wu (Awakening)

তখন তরুণদের 'Oppose Tagore' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই সম্পর্কে হি হে লিখেছেন, "The author put in their strongest from three objections which China's nationlist and leftist intellectuals held against Tagore's program of reviving Eastern spiritual civilisation : his indifference to the demands of the body would discourae China's material progress; his principle that only love gives meaning to life would encourage the imperialists to devour China; and his ideal of harmony with nature leads only to individual solace at the expense of society."

কারণ তাদের ভয় ছিল সাহিত্য যেহেতু যুবকদের কাছে খুব জনপ্রিয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে একটা বড় আকর্ষণ হবে। এটা একটা দুর্ভাগ্য। সেজন্য তারা ছাত্রদের সাবধান করে দিয়ে বললেন তোমরা যদি ভারতবর্ষের মত তোমাদের দুয়ারে ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত দেশ কবর দিতে না চাও তাহলে তোমরা ভারতবাসীর মত হবে না।

১৯২৮ সালে Chen এর জায়গায় Chu Chin-Pai কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি 16th এবং 18th April, 1924 দুটো প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল : "Can the East and the West be harmonized? As there is no so-called East and no so-called West, therefore there is no such problem as harmonizing them : If Tagore is truely "a singer of the common people" and "a poet a slaves" then he should encourage the spirit of aggressiveness, courage, revolt, and activism among the slaves and the common people so that they will unite shoulder to shoulder to overthrow the capitalist state system, and will manage their common life in a systematic and organised way. At this stage, in order to repress the reaction of the capitalist class, we especially need to organise our own state. This is the true road leading us to a universal culture. However, Tagore is different : he merely wishes to harmonize East and West."

দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিখেছেন, "India has already become a part of the British industrial economy, but Tagore, living in the world of the past, still dreams that the message of 'love and light' 'can win over the hearts of the English capitalist class. So he tries hard to ignore India's political struggle. India has already become modern India but Tagore still seems

to want to return to the abode of Brahma. No wonder he and India are moving to opposite directions-he has already retrogressed several hundred years." (Hay P. 231)

মাও ৎসে তুঙ এই সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। তবে তাঁর সঙ্গী মাও এর চেয়ে বয়সে ৪ বৎসরের ছোট, সাংহাই এর একজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট লিখেছেন, "It is the neglect of our industries which has brought about the present importation of foreign goods. We are now only half tributaries. If we were to listen to Tagore's doctrine, we would soon be completely colonized. What we need is exactly the opposite of that doctrine. Resist! Fight until we bleed! ... We want none of Mr. Tagore's 'Eastern Civilization!" It is as much out-of-date in China as in India. Mr. Tagore wants us to love old bones. To conclude : If our students listen to Mr. Tagore, his coming will not benefit our country, but will be a misfortune." (May 17, 1924. Hay P. 240)

অনেক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সঙ্গী ডঃ কালিদাস নাগ সাহিত্য আকাদেমির রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংকলনগ্রন্থে 'টেগোর ইন এশিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সম্পর্কে লিখেছেন, "মধ্যবয়সী শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখন আমেরিকার প্রয়োগবাদ এবং মার্কসবাদের চিন্তায় দোদুল্যমান ছিল। বিদেশী-মালিকের কারখানা এবং অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের নিয়ে আমরা দেখেছি সাংহাই এশিয়ার সর্বহারার প্রতীকী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চারদিকে অশুভ চিহ্ন দেখা দিয়েছিল।

সাংহাই থেকে পিকিং এসে পুরানো এবং নবীন চিনের দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ উপলব্ধি করলাম। সেখানকার প্রাসাদ মিউজিয়ামে দূর প্রাচ্য, রোমান প্রাচ্য, ইরান, মধ্য এশিয়া এবং বৌদ্ধ ভারতের বহু প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন আছে কিন্তু পিকিং এবং ছিংহোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন যুবকেরা প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন ছিল। তারা ভবিষ্যতের চিন্তা করছিল।

রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা থেকে চয়ন নির্বাচিত 'চীনের বক্তৃতামালা' গ্রন্থে চীনা যুবকদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন প্রতিফলন নেই। কবি সাংহাই, পিকিং, হ্যাংচাউ এবং নানকিঙের যুবকদের কাছে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তারা মতভেদের প্রকাশ করছিল।"

নানা প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ যে সার্থকতা লাভ করেছিল সে সম্পর্কে এলমহার্স্ট লিখেছেন, "There are men in China who are still convinced that civilisation must have a moral basis and that material prosperity is prone to lead a nation to destruction if it lacks that moral balance which alone can give it poise and harmony. ... To such men the voice of Tagore has come ... as voice of a friend.

"These cannot but bear fruit in the future. The future of the world

already lies in the hands of Asia. Russia, China and India will have to decide what that future is to be. The old ideal of exploiting imperialism is struggling for breath upon its death bed. Disregarding the warning of the catastrophy of five years ago, it has set its face once more upon the same road to destruction. Are we, the nations of East and West, to be swept a second time into this maelstrom of selfish aggrandisement and thereby to build our own tombs? Or, meeting in friendship, based on a mutual understanding and appreciation, can we rescue humanity and give to the world a new lease of life." (M. R. August. 1924)

এই ভ্রমণের ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। ঐ বৎসরেই (১৯২৪) সেপ্টেম্বর মাসে সাংহাইতে প্রথম Asiatic Association গঠিত হয়। এ সম্পর্কে আমেরিকান বিখ্যাত দৈনিক Christian Science Monitor (৩ অক্টোবর) লিখেছিল,

"There is on foot an important movement to establish Asiatic concord through the common culture of Asiatic nations. ... It has been ... stimulated by the recent visit to the Far East of Rabindranath Tagore, who preached the doctrine of idealism opposed to western materialism.

"The new feeling is shown in the formation of Asiatic association in the principal centres, the first of which is located in Shanghai ... At the inauguration representatives of all Asiatic countries were present.

"Inspiration for the movement is acknowledged to Tagore whose teachings permeate the issued declarations."

এদেশে চীন-ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া ঃ

কলিকাতার দৈনিক Hindustan Standard লিখেছিল (১১মে ১৯৪৭),

"It is now widely known that soon after the Poet's return from China, an Asiatic Association acknowledging its inspiration to the teaching of Tagore, was organised in Shanghai in 1924 at the inauguration of which representatives of all Asian Countries were present. This convention was thus a predecessor to the Asian Relation Conference held in Delhi 23 years later."

১৯৪৭ সালের জুন মাসে দিল্লীতে যে Asian Relation Conference অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপন করেন। এই সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দ্বীপময় ভারতে' লিখেছেন,

"কবি চীনে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান আকর্ষণ করেছেন। চীনা ভাষায় তাঁর বইও অনেক অনূদিত হয়েছে, চীনাদের মধ্যে ভক্ত পাঠক অনেক আছে। তা ছাড়া, ভারত আর চীন, এই দুই প্রাচীন জাত, যারা এক সময়ে ঘনিষ্ঠভাবে সৌহার্দ্যসূত্রে গ্রথিত ছিল, তাদের মধ্যে আবার যাতে উৎকর্ষের ঐক্য আর মনের মিল নতুন ক'রে হয় তার জন্য কবির যে একান্ত আগ্রহ আছে, তার প্রতি চীনাদেরও পুরা সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। কবি চান, যাতে আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার, চীনা সাহিত্যের আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভালো ক'রে চীনা ভাষার আলোচনার প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছেন; বিখ্যাত ফরাসী চীন-বিদ্যাবিৎ আচার্য সিলভাঁ লেভির সাহায্যে, লেভির উৎসাহে আর শিক্ষায়, আর পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত যুবক অধ্যাপক তুচ্চির, এবং চীন-দেশীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত (Ngo Cheong Lim) ঙো চিয়ঙ্-লিম-এর সহযোগিতায় এখন চীনভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন এই রকম পণ্ডিত একাধিক জন হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে পারা যায়—সুবিখ্যাত আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, আর বিশ্বভারতীর গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এঁদের দু'জনকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত (Ryukwan Kimura) রুখোঙ কিমুরা আগে থেকে একটু চীনা, একটু জাপানী পড়িয়ে আসছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাতে বিশেষ কোন ফল হয়নি। আচার্য শ্রীযুক্ত লেভির প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিন বৎসর প্যারিসে চীনা ভাষা, বৌদ্ধধর্ম আর প্রাচ্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন ক'রে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম Docteur-es-Lettres অর্থাৎ 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। ... ইনি ভারতের চীনা ভাষায় প্রথম বড় পণ্ডিত হয়ে ফিরলেন, এঁর দ্বারা দেশে চীন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হতে অনেক সাহায্য হবে। বাগচী মহাশয়ের চেষ্টার মূলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী।" ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৪৭ সাল থেকে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কবি ২২শে জুলাই, ১৯২৪ শান্তিনিকেতনে ফিরে এলে সেখানেও কবির যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা হল। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকরা চা-চক্র চালু করেছিলেন। কবির ইচ্ছানুসারে ঐ চা-চক্রের নামকরণ করা হল সু-সী-মো চা-চক্র। চীন ভ্রমণকালে সু-সী-মো ছিলেন কবির দোভাষী ও সকল সময়ের সঙ্গী।

১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'The Great Asiatic Federation' গড়ে তুলবার প্রস্তাব করেন। চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনের ফলেই ১৯২৮-২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসে The Great Asiatic Federation গঠনের জন্য কার্যকরী পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য নানা কারণে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে রাজনীতিকদের চিন্তার সবসময়েই পার্থক্য ছিল। রাজনীতিকরা যেখানে প্যান-এশিয়াটিক ফেডারেশনের কথা বলেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ঐক্যের উপর গুরুত্ব

আরোপ করেন। এ সম্পর্কে তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় পরিষ্কার ভাবে বলেন,

"আপনাদের ভিতর কেউ কেউ এমন আছেন যাঁরা বোধ করি ভাবছেন যে, সমস্ত এশিয়া মহাদেশকে এক করলে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে এবং সে-প্রয়োজন সাধনের পক্ষে আমার ভ্রমণ কিছু সহায়তা করেছে কি না, সে সম্বন্ধেও আপনাদের হয়ত একটা জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু আমি আপনাদের এ কথা বলতে চাই যে, আমি কোনরকম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি এবং আপনার দেশের গৌরবকে চতুর্দিকে প্রখ্যাত করবার প্রয়োজন আমি ততটা মনে করিনি।

"আমি বার বার আবার বলছি, আপনারা ভুল করবেন না। প্যান-এশিয়াটিক মিলনের দুঃস্বপ্ন আমি দেখি নে, ওটা নাটক-মেজাজ, প্যান শব্দকে আমি ভয় করি, এটা অবাস্তব কথা, তা'তে সত্যিকার মিলন হবে না। সত্যিকার ইউনিটি হ'লে এর একটা অর্থ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নিরর্থক। যন্ত্র দ্বারা জোর করে মিলন কেবল নিরর্থক তা নয়, তা'তে ক্ষতি আছে। ...অভেদ শরীর বললে ইম্পিরিয়ালিজমকে, দেহকে ভিত্তি করা হবে। সেটা সর্বনাশের কথা, যেখানে দুইটি হৃৎপিণ্ডের এক হৃৎপিণ্ড কাজ করে না। যারা তা করায় তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ... চীনবাসীরা আমাকে বার-বার বলেছে, আপনাদের সঙ্গে আমরা মিলব, হৃদয়ের মিলন হবে, আমাদের পূর্বাপর যে-মিলন আছে, ধর্মগত ঐক্য আছে, সেটাকে সঞ্জীবিত করব। পোলিটিক্যাল শক্তি লাভ করবার জন্য বলছিনে, তা'তে আমি বিশ্বাস করিনে। ... আমাদেরও অনেক জিনিষ দেবার আছে, পরস্পরের এই আদান প্রদানের ভিতর মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধ, ইন্টারডিপেন্ডেন্স—এ সম্বন্ধ চীন-জাপানের সঙ্গে আমাদের হবে।" (প্রবাসী— কার্তিক, ১৩৩১ পৃ. ৯০-৯৯)

পরবর্তীকালে চীনা লেখকদের প্রতিক্রিয়া :

১৯৩১ সালে কবির সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে যে The Golden Book of Tagore প্রকাশিত হয় তাতে চীনের আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য Lim Boon keng যিনি চীন ভ্রমণের সময় কবিকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি 'The Beauty and Value of Tagore's Thoughts' নামে যে রচনা লিখেছিলেন তাতে বলেছেন, "The outstanding feature of the genius of Tagore is the wonderful capacity for minute observation of all aspects of Nature, and of perceiving, true to the instincts of an Indian sage, the mute of language of creation with its infinite variations of melody and harmony.

"So through Tagore's Philosophy everything is worthwhile. Every

man and woman should strive to secure the light of Truth, and live simply and wisely for the common good.

Thus the philosophy of Rabindranath Tagore, in essence, is identical with the profound Monism of the ancient Chinese cult, preserved for the world by Confucius. All existences constitute the one organism of the entire Cosmos, emitting love as the highest manifestation of its vital energy, and having as its rational soul the centre of the spiritual galaxy."

কবির সত্তর বৎসর উপলক্ষে পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Liu Yes Hon কবির প্রশংসায় একটি কবিতা এবং অভিনব একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছিলেন।

Sino-Indian cultural society.

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধ্যাপক তান উন শান ১৯২৮ থেকে ১৯৩১ তিন বছর বিশ্বভারতীর চাইনিজ স্টাডিজের সঙ্গে যুক্ত থেকে চীনে ফিরে যান এবং তাঁর উদ্যোগে ১৯৩৩ সালে নানকিঙে Sino-Indian Cultural Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে এই সব সংবাদ দিতে আসেন। তিনি লিখেছেন, "Gurudeva himself took a very important part in organising the sino-Indian Cultural Society and acted as its President in India." (Tagore & China ed. Kalidas Nag) তাঁর প্রথম কাজ হোল শান্তিনিকেতনে চীনা হল তৈরি করা। এই হল নির্মাণের জন্য কবির এক আবেদন বাণী নিয়ে অধ্যাপক তান চীনে ফিরে গিয়ে চীনা ভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। তাঁদের অর্থ দিয়েই চীনা ভবন তৈরি হয়।

রবীন্দ্রনাথের চীনা কাব্য-প্রীতি

রবীন্দ্রনাথ দেশ বিদেশের খবর যেমন রাখতেন তেমনি দেশবিদেশের সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৩২ সালে মডার্ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।" তিনি লিখেছেন, "এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়।" এই কথা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীনের হাজার বছরের পুরানো কবি লি-পো-র কবিতা উদ্ধৃত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি

লিখছেন—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিইনে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—
সে জগৎ কোনো মানুষের নয়।
পীচ গাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।
আর একটা ছবি—
নীল জল ... নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল—
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।
আর একটা—
নগ্নদেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার 'পরে।
একটি বধূর কথা—
আমার চুল ছিল ছোটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চড়ে
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাংকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট করে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভ্রূকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে

পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাংফেসার দীর্ঘপথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর বলে একটুও ভয় করব না।" (আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্রনাথ এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিলিতি কবিদের তুলনায় চীনে কবিতারির আধুনিকতা যে সহজ সেটাই দেখাতে চেয়েছেন।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধেও ভাবপ্রকাশের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি এক চীন কবির কবিতা অনুবাদ করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

"পাহাড় একটানা উঠে গেছে
কশত হাত উঁচে;
সরোবর তলে গেছে শত মাইল,
কোথাও তার ঢেউ নেই;
বালি ধু ধু করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার-বন;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার;
গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা করে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
ঘুচিয়ে দিলে সব দুঃখবেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।" (র. রচ. ১৪)

রবীন্দ্রনাথ এখানে কবির নাম না করে লিখেছেন " কোনো চীনদেশীয় কবি"। এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ চীনা কবিদের কবিতার কত প্রশংসা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চৌ-এন লাই :

১৯৫৭ সালে চীন গণ সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারত ভ্রমণে এসে শান্তিনিকেতনে যান। ৩০শে জানুয়ারী উত্তরায়ণে এক বিশেষ কনভোকেশনে তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দেওয়া হয়। ঐ সভায় তিনি শান্তিনিকেতনকে যথার্থ শান্তির নিকেতন রূপে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'আমার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেই, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান পাওয়ার কোন যোগ্যতা আমার নেই। আমি এই সম্মানকে চীন জনগণের প্রতি ভারতীয় জনগণের গভীর বন্ধুত্বের এবং চীন জনগণের মুক্তির সংগ্রাম এবং জাতীয় পুর্গঠনে ভারতীয় জনগণের প্রশংসার প্রকাশ বলে শ্রদ্ধা করি।' তিনি বলেন, "Coming to this centre of learning of India, one is bound to think first of the founder of this University, India's great patriotic poet Rabindranath Tagore. He is a talented poet who made outstanding contributions to world literatures. He is furthermore a distinguished representative of the great Indian people who loathe darkness and seek light. The Chinese people cherish a profound feeling for Tagore, the Chinese people can never forget Tagore's affection for them. Nor can they forget the support which Tagore gave them for their hard struggle for national independence. Till now, the Chinese people have the best memory of Tagore's visit to China in 1924. The Chinese versions of many of Tagore's works, published recently in China, have been very popular among the Chinese readers. Tagore is the pride of the Indian people, and the pride of Visva-Bharati. Now, as an alumni of this University, I am also privileged to share this pride." (V. B. News, 1957)

তিনি আরও বলেন, 'চীন সর্বদাই ভারতের চমৎকার সংস্কৃতির প্রশংসা করে। অনেক হাজার বছর ধরে আমরা ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। ... বিশ্বভারতী যেমন চীনা সংস্কৃতি পঠনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমরাও তেমনি চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি পঠনের ব্যবস্থার উপর জোর দেব, ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উন্নতির জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে :

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে চীনদেশেও ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনার নানা অনুবাদ ছাড়াও দশখণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীর চীনা অনুবাদ হয়।

এই উপলক্ষে চীন সাধারণতন্ত্রের সংস্কৃতি বিভাগের উপমন্ত্রী চীনের সাহিত্যিক, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক, পিকিংয়ের চীন-ভারত মৈত্রী সমিতির

প্রেসিডেন্ট Ting Hai-Lin 'ভারতের মহান কবি' শীর্ষক রচনায় বলেছেন, 'ভারতবর্ষের এই মহান দেশপ্রেমিক লেখক রবীন্দ্রনাথের নাম চীনা জনগণের কাছে খুব পরিচিত। তিনি ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে ঘৃণা করতেন এবং তাঁর বহু লেখায় ঔপনিবেশিকতার অধীনে ভারতীয় জনগণের চরম দুঃখের কথা আছে। তিনি এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশ এবং দেশবাসীকেই কেবল ভালবাসতেন না, অন্যান্য দেশের নিপীড়িত মানুষের প্রতিও তাঁর গভীর সহানুভূতি এবং সমর্থন ছিল।'

তিনি বলেন, "In 1924 Tagore was invited to visit China and give a series of lectures. The Great ovation tendered to Tagore at that time left a deep impression on me. Even to-day that happy event is still fresh in my memory. He gave many lectures in colleges, academic institutions and other organisations. He stressed the friendship between China and India, and his visit truly promoted and strengthened this friendship. At that time Chinese newspapers and magazines published many of his writings which had been translated into Chinese; and for the first time Tagore's plays were staged in Chinese theatres. His famous works, such as Gitanjali, the Gardener, the Crescent Moon, Cycle of Spring, and Stray birds were all translated into Chinese. Since the founding of New China, even greater emphasis has been given to the study, translation and publication of Tagore's works. New editions and new translations of his works have appeared, which are loved by the broad masses of the Chinese people."

"প্রাচ্য জনগণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি চীন সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতেন। যখন জাপান সাম্রাজ্যবাদ চীনকে আক্রমণ করল, তখন তারা চীনে যে জঘন্য অপরাধ করছিল তিনি তীব্রভাবে তার নিন্দা করেন। এমনকি যখন তিনি মৃত্যু শয্যায় তখনও তিনি চীনে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করেছেন। তিনি প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আশা ত্যাগ করেন নি। তিনি প্রাচ্যের অরুণোদয়ের গান গাইতেন এবং বলতেন এই প্রাচ্য থেকে একদিন আবার আলো আসবে।" ... "তাঁর নাম প্রগতিশীল মানবিকতার স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল থাকবে এবং তাঁর অমর বাণী সমগ্র পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।" (India Literature. Vol 4. 1961).

চীনের বিখ্যাত অপেরা অভিনেতা Mei Lan Fang এর কথা আগে উল্লেখ করেছি। কবির শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি Recollection of Rabindranath Tagore নামে এক দীর্ঘ স্মৃতি কথা লিখেছেন। (Tagore Centenary Peace Festival All India Committee, Calcutta থেকে প্রকাশিত In Homage to Tagore গ্রন্থে সংকলিত) তিনি রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের কথা বিশেষ করে ১৯২৪ সালে কবির জন্মদিনের কথা বলেছেন। তিনি চীনের কোন অস্বস্তিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করেননি।

তাঁর লেখা থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালের বসন্তকালে যখন আবার ঘুরে সাংহাইতে আসেন তখন সান ইয়াৎ সেনের স্ত্রী মাদাম Sung Ching-ling কবির সম্মানে এক বিদায় ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে তিনি কবিকে কিছু চীনা জিনিস উপহার দেন। অবশ্য সেবার কুওমিনটাং সরকার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব "কার্ল মার্কসের মতবাদের মতই বিপজ্জনক এবং বিনাশক (Hay P. 223) মনে করে তাঁর বক্তৃতা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আশ্চর্য, সেই সময়েই "চীনের প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের লেখক, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তিয়েন হান বলেন, রবীন্দ্র বিরোধীরা রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিল।" (বিতর্কিত অতিথি)

চীনের মুক্তির পরে চীন এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৯৫৪ সালের শীতকালে পিকিং অপেরার দল ভারতের নানা শহরে তাদের অভিনয় প্রদর্শন করে। মিসেস Shih Chen বিশ্বভারতীতে থেকে (১৯৪১-৪৫) বাংলাভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মেই লান ফাংকে যে তাৎক্ষণিক কবিতা লিখে দিয়েছিলেন তাকে শী চেন চমৎকার একটি বাংলা কবিতা বলে অভিহিত করেন। এই কবিতার সঙ্গে প্রাচীন চীনা কবিতার ছন্দের মিল আছে।

মিসেস শী চেন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ চীনের প্রাচীন কবিতা এবং সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। চীনা ভাষা না জানলেও তিনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে Ch'u Yuan, Li Pai, Tu Fu এবং Pai Chu-yi-র অনেক কবিতা পড়েছেন।

সাহিত্য গবেষণা পরিষদের Hsiao-ling বলেছেন রবীন্দ্রনাথের উদয়নের বসবার ঘরের এক তাকে যেখানে গ্রামোফোন রেকর্ড থাকত সেখানে মেই লান ফাঙের দেওয়া অপেরা সঙ্গীতের রেকর্ডও ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেগুলো বাজিয়ে শুনতেন। এবং মাদাম সু চি লিঙের দেওয়া অপেরার মাটির মুখোশের অনুসরণে অবনীন্দ্রনাথ মাটির মুখোশ তৈরি করেছেন।

সবশেষে মেই লান ফাঙ লিখেছেন, "Though it is already twenty years since the passing away of Mr. Tagore, his ardent and sincere love for China, his sense of justice–in words and actions–have left a deep impression in my mind. Examples are indeed too many to cite. I think, if Mr. Tagore were still alive, he would have endeavoured to make greater contribution for the cultural exchange between China and India."

চীনের বিখ্যাত মহিলা কবি এবং রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার অনুবাদক Ping Hsin সাহিত্য আকাদেমির শত বার্ষিকী সংকলনে "Let's Commemorate Tagore with unity and friendship' নামক রচনায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং গভীর মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধের উদাহরণ সহ আলোচনা করে লিখেছেন,

"Tagore was a great patriot as well as anti-imperialist poet, and that is also why the Chinese people love to read his poems. In his

youth, Tagore began to take an active part in the various struggles against imperialism–the anti-British movement in Bengal in 1905. With his poems, he sounded the bugle call for battle and kindled flaming torches in the people's anti-imperialist ranks."

তিনি রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমন সম্পর্কে লিখেছেন, "Tagore's visit to China in 1924 left he most precious memories on the poet himself as well as among the Chinese people. Tagore, who deeply loved Chinese culture and people, visited seven cities, including Peking, Nanking and Hangchow. His several lectures at universities and cultural organisations were enthusiastically acclaimed by the Chinese people."

এখানে লক্ষণীয়, মুক্তিসংগ্রামের পরে এঁরা কেউ ১৯২৪ সালের চীন ভ্রমণের বিতর্ক বা বিরোধিতার কোন উল্লেখ করেন নি। সম্প্রতি শিশির কুমার দাস ও তানওয়েন তাঁদের 'বিতর্কিত অতিথি' গ্রন্থে ১৯১৫-১৯২৪ এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চীনা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যে বইগুলি অনুদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা দিয়েছেন। তার থেকে দেখা যায়, ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিতর্কই হোক না কেন চীনা জনগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহ কমে নি। চীন গণসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই আগ্রহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে চাইনিজ ড্রামা পাবলিশার চার খণ্ডে রবীন্দ্র নাট্য সংকলন এবং ১৯৬১ সালে পেইচিঙ গণসাহিত্য প্রকাশনালয় থেকে দশ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশ বৎসর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। ১৯৭৮ সাল থেকে আবার রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থের অনুবাদ এবং পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে 'বিশ্বসাহিত্যে ভারত' শীর্ষক এক দীর্ঘ আলোচনা সভা হয়। সেখানে জানা যায় চি সেন লিন (Ji xianlin)-এর উদ্যোগে ১৯৮১ সালের মে মাসে পেইচিঙে রবীন্দ্রনাথের ১২০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক জনসভা হয় এবং আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের উপর এক সেমিনার হয়। এই আলোচনা থেকেই ১৯৮২ সালে চাইনিজ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চি সেন লিন তার সভাপতি হয়েছেন।

দিল্লির আলোচনা সভায় Ni Peigeng এবং Hua Yuqing নামে দুই জন চীনের পণ্ডিত ব্যক্তি 'চীনে রবীন্দ্র প্রভাব' শীর্ষক একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তাঁরা বলেছেন, চীনে রবীন্দ্র চর্চার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় ১৯১৩ থেকে ১৯৪০, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৪৯ থেকে ১৯৬০ এবং তৃতীয় পর্যায় ১৯৭০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে। এই সময়কার রবীন্দ্র আলোচনারও দুইটি ভাগ আছে। একদল রবীন্দ্রনাথের স্তুতি বা প্রশংসায় ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় দল রবীন্দ্রনাথের সমালোচক। অবশ্য তাদের মধ্যেও কোন রবীন্দ্র বিরোধী প্রভাব ছিল না। শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী চীনা বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামে

জড়িত হয়ে পড়লেন। তার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। মাও তুনের লেখায় এর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে চীন মুক্ত হওয়ার পরে জনগণ একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়া আরম্ভ করলেন। চীনা গণসাহিত্য প্রকাশন রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল বাঙলা থেকে কয়েকজন পণ্ডিত অনুবাদ শুরু করলেন। চি সেন লিন-এর মত পণ্ডিতেরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ বিরোধিতার ভূমিকার উপরই জোর দেন নি, তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্য বিকাশে এবং শিল্পকর্মে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি ছাত্রের দশকের গোড়ায় পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি অনেক বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। 'চীনে রবীন্দ্র প্রভাব' নামে একটা বইও লিখেছেন।

১৯৭৯ এবং ১৯৮১ সালে চি সেন লিন দুটো গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখেছেন যাতে দুইয়ের দশকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের একটা সমালোচনামূলক পর্যালোচনা আছে। অধ্যাপক চি-র রচনা রবীন্দ্র উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে চীনা মনকে মুক্ত করে একটা নতুন যুগে নিয়ে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পঠন-পাঠনে প্রসারিত হয়েছে। বহু প্রকাশক রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস, নাটক, এবং প্রবন্ধের নতুন প্রকাশনার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিতীয় শাখায় চীনের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রতিষ্ঠানে টেগোর স্টাডিজের ব্যবস্থা হচ্ছে। হাঙচৌ বিশ্ববিদ্যালয় তার চীনা বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইতিমধ্যেই টেগোর স্টাডিজকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আনহুই বিশ্ববিদ্যালয়, শিয়ামেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেইচিঙ নরম্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান টেগোর বিষয় খোলার পরিকল্পনা করেছেন। কেন্দ্রীয় দূরদর্শন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রধান লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সম্প্রতি চীনের প্রবীণ ঔপন্যাসিক Jianxian Ai (৭৭ বৎসর বয়স), Li Lianqing এবং নবীন কবি Yang Mou-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক সুযোগ হয়েছিল। চিয়ান সিয়ান আই রবীন্দ্রনাথ যখন চীন ভ্রমণে গিয়েছেন তখন মিডল স্কুলের ছাত্র। তিনি রবীন্দ্র বিরোধী বিতর্কের কথা শোনেন নি। অন্যদের কাছে ১৯২৪ সালের ঘটনা জানা নেই। লু শুনের মন্তব্য লি লিয়ানচিং জানেন। তাঁরা বলেন চীনের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে গভীর মানবিকতাবোধের কবি বলেই জানেন। তিনি সর্বদা নির্যাতীত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইয়াঙ মৌ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভারতীয় জনগণের সামাজিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি চীনে খুব জনপ্রিয়। যদি তার মধ্যে খারাপ কিছু থাকত বা এর সম্পর্কে যদি কোন বিরূপ মনোভাব থাকত তাহলে গীতাঞ্জলি চীনে এত জনপ্রিয় হোত না। রবীন্দ্রনাথকে তারা কেবল শুধু ভারতীয় কবি বলে মনে করেন না, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের কবি। তাঁর লেখার মধ্যে তাঁরা

ভারতীয় মাটির গন্ধ পান। তাঁর ছিন্নপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মানুষের প্রতি যে কত মমত্ব ছিল তা উপলব্ধি করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিতর্কের প্রকাশ ঃ

স্টীফেন হে নামে একজন আমেরিকান গবেষক ১৯৫৭ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন ও জাপানে ভ্রমণ ও তাঁর বক্তব্যে নানা প্রতিক্রিয়া নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৭০ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে তাঁর Asian Ideas of East and West নামে কেটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের সময় যে বিরোধিতা হয়েছিল তাকেই বেশি তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে সাহিত্য আকাদমির Indian Literature পত্রিকায় Patricia Uberai 'Tagore in China : A Chinese Poet's view' নামে এক রচনায় ওয়েন ই তোর রবীন্দ্রসমালোচনার কথা প্রচার করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ''Wen I to's essay on Tagore, which I have quoted in detail above, was typical of the kind of criticism which brought the "Tagorian" era of Chinese poetry to a close.'' ওয়েন-ই-তো তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন সেই কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্যাট্রিসিয়া উবেরই তাকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ওয়েন-ই-তো-র সমালোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক এবং কতটা সত্য উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা উপলব্ধি করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

চীনবাসীদের দুর্দিনে

চীন ভ্রমণের নানা বিতর্ক রবীন্দ্রনাথের মনে কোন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয় না। কারণ পরবর্তী বৎসর থেকেই চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়।

১৯২৫ সালে সাংহাই এবং অন্যান্য অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়। মে মাসে জাপানি পুঁজিপতিরা সাংহাইতে একজন শ্রমিককে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ৩০ মে দশ সহস্রাধিক ছাত্র এবং শ্রমিকরা প্রতিবাদ মিছিল করে। ব্রিটিশ পুলিশ তাদের উপরে গুলি চালায়, ১১ জন মিছিলকারীকে হত্যা করে এবং অনেক আহত হয়। জানা যায় একজন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারের আদেশে ভারতীয় শিখ সৈন্যবাহিনী সেদিনের এই নিরস্ত্র ছাত্র ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলের উপর নৃশংসভাবে গুলিবর্ষণ করে। সমগ্র চীনে জাপানি ব্রিটিশ পণ্য বয়কট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের সম্পর্কেও সেখানে তীব্র ঘৃণা ও নিন্দাবাদ হতে থাকে। এই সংবাদে অধীর হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সৈন্যদের ঘৃণ্য দাসবৃত্তির নিন্দা করে 'শূদ্রধর্ম' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন ঃ (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২)

"প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল দেখলুম, সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাঞ্ছনধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশে বিদেশে এরা শূদ্রধর্ম পালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে; সে সম্বন্ধে এরা কোন বিচার করতেই চায় না। কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ।...

"চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকং কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন সাঙের চীন।"

এশিয়ার দেশ চিরকাল পড়ে পড়ে মার খাবে না। জাপান জেগে উঠেছে, চীনও

একদিন জেগে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত তা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষ তখনো ইংরেজের দাসত্ব করে যাবে। তিনি লিখেছেন, "পূর্ব মহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা লুট করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন এশিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কি কাজ? তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে করে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। ... ইংরেজ সাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না; ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা বয়ে মরে, যে বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়, যে পর তার শত্রু নয়; কাজ সিদ্ধ হবা মাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোশাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা।"

ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে

সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর বিপ্লবীর ছদ্মবেশে চিয়াংকাইশেক কুওমিনটাঙ দল এবং সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দখল করে। সান ইয়াৎ সেনের তিনটি প্রধান নীতি ছিল: রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিত্রতা এবং কৃষক-শ্রমিকদের সাহায্য করা। সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পরে কুয়োমিনটাঙ দল দ্বিধাবিভক্ত হয়। যারা সানের নীতির অনুগামী তারা হল বামপন্থী। অপরদল এবং দক্ষিণপন্থী। চিয়াং কাইশেক ছিলেন দক্ষিণপন্থীর দলে। কিন্তু বিপ্লবীর ছদ্মবেশে তিনি নানা কৌশল করে কুওমিনটাঙ দল এবং সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৬ সালের শেষভাগে জাতীয় সরকার উত্তরাভিযানের প্রস্তাব এবং ঘোষণা গ্রহণ করে তখন চিয়াং কাইশেক ছিলেন তার চেয়ারম্যান।

১৯২৬ সালের শেষভাগে জেনারেল চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাঙ বাহিনী সমগ্র উত্তর চীন অভিযানে দ্রুত অগ্রসর ও সাফল্যলাভ করতে থাকে। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল উত্তরের যুদ্ধবাজদের শায়েস্তা করা। ক্রমে তারা ১৯২৭ সালের প্রথম ভাগে হাঙ-চৌ, সাংহাই প্রভৃতি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত শহরগুলো দখল করতে অগ্রসর হয়। এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশরা ১৯২৭ সালের জানুয়ারীর শেষভাগে (২৪শে) ভারতবর্ষ থেকে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী এবং গোলাবারুদপূর্ণ রণতরী-ভারতের জনমতকে উপেক্ষা করেই সাংহাইতে পাঠায়। এই সংবাদে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়।

"ঠিক সেই সময়ই কমিউনিস্ট নেতা সাপুরজী শাকলাতওয়ালা বিলেত হইতে মাসখানেকের জন্য ভারত সফরে আসেন। (১৪ই জানুয়ারি, ১৯২৭)। ভারতে পদার্পণ করিয়াই তিনি ব্রিটিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি—সর্বত্রই তাঁহার আলোচনাসভায়, বিবৃতি এবং সম্বর্ধনাসভায় তিনি একদিকে যেমন ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির নিন্দা ও সমালোচনা করেন, অপরদিকে চীনের সমর্থনে জনমত গঠন এবং সেই সঙ্গে চীনে সাহায্য প্রেরণেরও আবেদন জানান। চীনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন এবং ভারতের সেনাদল ও শক্তি সম্পদকে যাহাতে চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয়, সেই মর্মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।" (ভারতে জাতীয়তা (৬) পৃ. ৬৫৭)

চীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই অভিযানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য ৩০শে জানুয়ারী Forward পত্রিকার পক্ষে তাঁদের বিশেষ প্রতিনিধি চপলাকান্ত ভট্টাচার্য কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবির এই সাক্ষাৎকার Forward পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে বিবৃতি আকারে তা দেশে-বিদেশে প্রচারিত হয়। ক্যান্টন সরকার কবির এই বিবৃতি চীনের পত্র-পত্রিকায় এবং বেতারে পুনঃ পুনঃ প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

ঐ সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে, "চীন সম্পর্কে তাঁর রয়েছে এক গভীর বেদনা। চীনের ওপর যে অমানবিক প্রক্রিয়ায় একটা অসাম্য চাপিয়ে রাখা হয়েছে তিনি তার কথাই বলতে চাইছিলেন। কবির গভীর কালো চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল আর তাঁর শান্ত অথচ ধারালো কণ্ঠস্বর আবেগে উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি গভীর ভাবে ভেবেছি, তাছাড়া, ওখানে যে নীতি চালানো হচ্ছে তার প্রতি আমার ধিক্কার ব্যক্ত করতে আমি কখনও পিছপা হইনি। চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান অভিযান এক মানবিক অপরাধ, এবং লজ্জার কথা যে, ভারতকে এই খেলায় ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

ঘৃণ্যনামক ভারতীয়রা: "চীনদেশে যারা স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে, সেই অত্যাচারী লুণ্ঠকের দল সর্বদা নিজেদের কিছু আড়াল করে রাখে। তাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপের যন্ত্র হিসেবে ভারতীয়দের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং চীনাদের সঙ্গে তাদেরই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। ফলে তাদের ক্রোধ এবং ঘৃণার সবটাই বর্ষিত হত ভারতীয়দের ওপর এবং তারা এদের দৈত্য নামে অভিহিত করত। প্রায় বিনা কারণে শিখ পুলিশেরা চীনাদের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বা লাথি মারছে এরকম দৃশ্য চীনদেশে মোটেই অপরিচিত ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদেরকেও ওই নামে অভিহিত করা হোত।...

"এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিগত জাপান ভ্রমণের সময়কার একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। হংকং-এ একজন চীনা ফেরিওয়ালা তাঁদের স্টীমারের দিকে আসতে চেষ্টা করেছিল, সম্ভবত তার জিনিসপত্র বিক্রির আশায়। কিন্তু সেই সময় প্রহরারত একজন শিখ কনস্টেবল সম্পূর্ণ খেয়ালখুশির বশে তার চুল ধরে টেনে এনে একটা লাথি মেরে

তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দৃশ্যটি কবির কাছে তীব্র বেদনাদায়ক হয়েছিল। সেদিন তিনি যদি স্টিমার থেকে নামতে পারতেন তা হলে নিজেই সেই গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়তেন এবং কনস্টেবলটিকে ঐ অমানুষিক আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে একজন পরাধীন দাস তার নিজের শৃঙ্খলের কলঙ্ক ভুলে গিয়ে তার প্রভু-প্রদত্ত মেকি অধিকারের দম্ভ প্রকাশ করছে এবং এটা আরও দুঃখজনক যে সে আবার সেই অধিকার অকারণে অন্যের ওপর প্রয়োগ করছে।

ট্র্যাজেডি : তিনি বলে চললেন, "এই হচ্ছে ভারতের বর্তমান অসহায় দুরবস্থার ট্র্যাজেডি। লজ্জার কথা, আমরা যেহেতু দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ, অন্যান্য দেশের জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালানোর যন্ত্র হিসেবে তাই আমাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা এবং নৈতিকতার জন্য যে ধর্মযুদ্ধ চলছে এবং যেখানে ইংরেজরা হচ্ছে আক্রমণকারী, সেখানে ভারতকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে টেনে নামানো হয়েছে। এটা আমাদের মনুষ্যত্বের প্রতি ঘৃণ্য অপমান এবং আরো বলতে গেলে যে দুর্নাম আমাদের প্রভুদের পুরোপুরি পাওয়া উচিত তার অংশভাগ আমাদেরও নিতে হচ্ছে। বিগত যুদ্ধের সময় জার্মানদের রাগ ইংরেজদের ওপর যত না পড়েছিল তার চেয়ে বেশি বেশি পড়েছিল ভারতীয় সৈন্যদের ওপর। কারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে তারা অনর্থক এবং অকারণ আক্রমণ চালিয়েছিল।

আত্মঘাতী না আরও কিছু : "কবি আরো একধাপ এগিয়ে একে আত্মঘাতী হওয়ার চেয়ে খারাপ বলে চিহ্নিত করলেন। এত অর্থবল ও এত লোকবলের অপচয় ঘটিয়ে ভারতের কী লাভ হচ্ছে? এই রকম অসম্মানজনক একটা কারণে লড়াই করে তার সন্তানেরা 'বীর' আখ্যা লাভ করতে পারে না এবং বিদেশী আধিপত্যের যে জোয়াল ভারতের বুকে চেপে বসেছে তাকেও ঝেড়ে ফেলার ক্ষেত্রে কোনো সুরাহা এতে হবে না। কোন কৃতজ্ঞতাও তার প্রাপ্য নয় কারণ তার এই সহযোগিতাটি হচ্ছে জোর করে আদায় করা—কোনো স্বতঃপ্রণোদিত অবদান নয়। ভারতবর্ষ তো অস্ট্রেলিয়া নয় যে সে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং চীনের বিরুদ্ধে অশুভ প্রচারের জন্য যাবতীয় সাহায্যের ব্রিটিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তাই এই আত্মত্যাগ ভস্মে ঘি ঢালা, কারণ দর কষাকষিতে সে কি পায়—যা বেহিসেবী ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে এক বন্ধমূল সংস্কার জন্মলাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপের দরুণ প্রতিবেশীদের সহানুভূতি হারায়।

এশিয়াটিক ফেডারেশনে একটি বিপদ : "এই কারণেই এশিয়ার অন্যান্য শক্তি ভারতকে তাদের স্বাধীনতার পথে একটি বিপদ হিসেবে মনে করে, তার বিশাল সম্পদ তাদের আশঙ্কার অন্যতম ভিত্তি এবং যতদিন এই সম্পদের ব্যবহার তার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে ততদিন তারা ভারতকে সন্দেহ এবং ঘৃণার চোখে দেখবে।

ফল হয়েছে এই যে, এশিয়ায় মানবাত্মার দূত হিসেবে ভারতই একমাত্র যে সম্মানের অধিকারী ছিল, তা সে দ্রুত হারিয়ে ফেলছে। অথচ সে যুগ যুগ ধরে আধ্যাত্মিকতার

দূতী চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে পৌঁছে দিয়েছে এবং প্রেম ও মিলনের বাণী প্রচার করার জন্য ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছে। কিন্তু আজ যদি চীনের বিপদের দিনে ভারতের এই ভ্রষ্টপতিত জীবেরা রাজনৈতিক নিপীড়নের মূর্ত প্রতীক হয়ে সেখানে যায়, তাহলে বহুকালের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা মুহূর্ত মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এর থেকে দুর্দশার আর কি হতে পারে?

প্রতিরোধী চীন : ইংরেজরা প্রতিরোধের লড়াই লড়ছে এই অজুহাত সম্পর্কে কবি বললেন, "কিন্তু কে আগ্রাসী হল? চীনের সমগ্র জনসাধারণকে বেয়নেটের মুখে রেখে কে তাদের গলায় আফিমের বিষ ঢেলে দিল এবং তারা বশ্যতা মানলো না বলে তাদের দেশের সবচেয়ে মূল্যবান ভূ-খণ্ডকে দখল করে নিল। চীনের জনসাধারণের কাছ থেকে কে জোর করে হংকং ছিনিয়ে নিল? চীনের দুর্বলতা এই যে তারা তখন সেটা মেনে নিয়েছিল, আগে যে অংশ তাদেরই ছিল তা পুনরুদ্ধারের জন্য আজ বলশালী চীন নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে—দীর্ঘকাল ওদের দখলে ছিল বলেই কি তা একটা জবরদখল সম্পত্তি হিসেবে যুক্তিসঙ্গতভাবে মেনে নিতে হবে?

"ইংরেজরাই হল মূলত আগ্রাসী এবং প্রতিরোধের লড়াই বলে প্রচার চালিয়ে তার আড়ালে তাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে চীনই প্রতিরোধী ভূমিকায় রয়েছে।"

সাম্রাজ্যের স্বার্থে : একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে এই অজুহাতের উত্তরে কবি বলেন, "এই সাম্রাজ্যের সদস্য হিসেবে আমরা অর্জন করি যাবতীয় নিন্দা-গ্লানি, পক্ষান্তরে গৌরবের কোনো অংশভাগ আমাদের মেলে না। রামায়ণে আছে, দস্যু রত্নাকর পরিবার পরিজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। মুক্তির দিন যখন এল, যারা তার উপার্জনের অংশে ভোগ করত, সেই আত্মীয়-স্বজনেরা তার পাপের অংশ নিতে রাজী হল না এবং তাকে সমস্ত পাপের বোঝা একলা বইতে হয়েছিল তবু, সেই পাপী লোকটির একটা সান্ত্বনা ছিল যে, সে তার পাপ কর্মের মাধ্যমে কিছু উপকার করতে পেরেছিল। কিন্তু আমরা স্পষ্টতই নিজের এবং আমাদের সকলের জন্য যে অন্যায় করছি তা কোনো উপকারে না লেগেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। সত্যকার জীবন্ত সম্পর্ক যদি থাকত তাহলে যখন খুশি সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নেবার অধিকারও থাকত। যেমন অন্যান্য স্বশাসিত সদস্যদেশগুলির আছে। আসলে আমাদের কোন অধিকার নেই এবং আমরা চাই বা না চাই, ইংরেজ প্রভুদের খেয়াল-খুশিমত নির্দেশ মেনে চলতে হবে, আমাদের সদস্যপদের এই হচ্ছে আসল রূপ। ফল দাঁড়াচ্ছে এই—অস্ট্রেলিয়া যখন ব্রিটিশ সরকারকে কোনো তোয়াক্কা করছে না, তখন আমরা সৈন্য-সামগ্রী দিয়ে সাম্রাজ্যের সেবা করছি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের পুরস্কার পাচ্ছি।"

ভারতীয়দের জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে : চীন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের কোন প্রয়োজন ছিল বলে কবি মনে

করেননি। কারণ "তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে চীনদেশে ভারতীয়দের জীবন সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করার কিছু ছিল না। ভারতীয় বলতে সেখানে দেখা যেত কেবলমাত্র শিখ কনস্টেবলদের যাদের আমদানী করা হয়েছিল, আর ছিল কয়েকজন ব্যবসায়ী। শিখ কনস্টেবলদের রক্ষা করার কোনো ব্যাপারই ছিল না, আর যে সব ব্যবসায়ী ভাগ্যান্বেষণে এ রকম জায়গায় চলে আসে, দুঃসহ জীবন কাটাবার ঝুঁকি তারা নিয়েই থাকে।"

ধর্মের কোনো প্রশ্ন নেই : চীনা জনসাধারণের ধর্ম প্রসঙ্গে কবি বললেন, "এটা মূল সমস্যাকে আড়াল করছে এবং সমস্ত পরিস্থিতিকে একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখানো হচ্ছে। চীন যে ধর্মই প্রচার করুক না কেন, আমরা সকল ক্ষেত্রেই সেদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো। এক্ষেত্রে আমরা মানবিকতার প্রশস্ত ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়াতেই চাই। তাই আমরা অন্যান্য যে-কোন দেশেই আমাদের সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে। বরং চীনের কৃতিত্ব হিসেবে একথা বলা যায় যে সেখানে এমন অনেক চীনা আছেন, যাঁরা মহম্মদের বাণী প্রচার করেন যদিও তাঁরা খুবই সংখ্যালঘু, ত্রিশ শতাংশেরও কম, তবু চীনদেশকে কখনোই মুসলমান—অমুসলমান সমস্যা নিয়ে ভুগতে হয় নি।"

"কবির সর্বশেষ বক্তব্য ছিল বেদনাবেগে পরিপূর্ণ; "এদেশের ভেতর তারা তাদের স্বেচ্ছাচার অবাধে চালিয়ে যাক। কিন্তু তারা যেন মানবিকতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধগুলিতে অংশ নেবার জন্য আমাদের বাধ্য না করে। একটা অংশের মানুষের অসহায় অবস্থাকে নিয়ে অন্য অংশের মানুষের ঐতিহ্য কেড়ে নেবার অশুভ প্রচেষ্টা থেকে তারা বিরত হোক। তোমাদের অধীন শৃঙ্খলার যন্ত্রগুলিকে অমিত শক্তিধর ও বলশালী করে তুলতে চাও তোলো। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, এই দেশের চতুঃসীমার মধ্যে থেকেই শুধু আমাদেরই যাবতীয় অপমানের বিষ পান করাও, বিশ্বের প্রাঙ্গণে আমাদের এই ভূমিকায় টেনে নামিও না।" (ভারতে জাতীয়তা (৬) পৃ. ৬৬৩-৬৬৯ থেকে উদ্ধৃত)

চীনের এই অভ্যুত্থানের পিছনে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম ছিল। তারা প্রথম উহান, চিউ চিয়াঙ এবং সাংহাই-এ বিদ্রোহ করেছিল। লিউ শাওচির নেতৃত্বে প্রথম দুটি শহরে তারা সাফল্য লাভ করে। কিন্তু সাংহাই শহরে অক্টোবর, ১৯২৬ এবং ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ দুইবার তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বার তারা চৌ এন লাই এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে বিদ্রোহ করে এবং তিরিশ দিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে জয়লাভ করে। ২২শে মার্চ চীনের জাতীয়তাবাদী বাহিনী অংশত সাংহাই দখল করে এবং ২৪শে মার্চ নানকিং দখল করে। এর পরেই ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান এবং ইটালির যুদ্ধ জাহাজ থেকে শহরে বোমা বর্ষণ করে দু'হাজারের উপর মানুষকে হত্যা করে। মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার জুলাই, ১৯২৭ সংখ্যায় চীনের পক্ষ অবলম্বন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথের এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে কবি চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন সেই কথাই বলেন।

চীনাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয়দের ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ শূদ্রধর্ম প্রবন্ধে যে ধিক্কার জানিয়েছিলেন এই বিবৃতির মধ্যেও তা আছে। ইংরেজ শাসকেরা তাদের আগ্রাসনে ভারতীয়দের এই অন্যায় কাজে ব্যবহার করছে। এর দ্বারা ভারতীয়দের কোন লাভ হয় নি। এ ছাড়া ব্রিটিশরা চীনাদের উপর আক্রমণের জন্য যে মিথ্যা অজুহাত খাড়া করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধেও বলেছিলেন।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ আসন্ন মহাযুদ্ধ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "War clouds hover to day over the sky of humanity. The cry resounds in the West and Asia both prepare weapons in her armouries of which the target is to be the heart of Europe; and nests are being built on the shores of the Pacific for the ravening vulture-ships of England..." (M.R. – July 1927. Pp. 94-95).

১৯২৮ সালে অক্টোবরের শেষভাগে ডঃ সু-চি-মো ইউরোপ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। চীনের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিবাদ বিবৃতি দিয়েছিলেন তা চীন সরকার পত্রিকা এবং রেডিও-র মাধ্যমে বারবার প্রচার করেন। চীনের জনগণ গভীর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ করেন। ডঃ সু-চি-মো, চীনবাসীদের পক্ষ থেকে কবিকে তাঁর গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তা ছাড়া ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যাতে দৃঢ় হয়, তার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। শান্তিনিকেতনে এক মনোরম সম্বর্ধনা সভায় তাঁকে আপ্যায়িত করা হয়।

কানাডা যাওয়ার পথে মার্চ, ১৯২৯ সাংহাই-এ জাহাজের অপেক্ষায় কবিকে দু'দিন থাকতে হয়। এ সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "দু'দিনের জন্য সু-র বাড়িতে ছিলুম—ভালো লাগে নি; অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল; তার প্রধান কারণ নূতন জায়গায় মন তার খাতের রাশ পায় নি, চার দিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে আর তার উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল।" এখানে জেনারেল চিয়াং-কাও চেন্ কবিকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন, রাত্রে ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ।

১৯২৯ সালে কবি আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে আবার জাপানে যান। এই সময় চীনা সরকার কবিকে এক আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কবির শারীরিক অসুস্থতার দরুণ এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে ১৪ই মে চীনের জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল কবির সঙ্গে টোকিও-র ইম্পীরিয়াল হোটেলে সাক্ষাৎ করেন। ডঃ সান ইয়াৎ সেনের মৃতদেহ নানকিং-এ স্থানান্তর উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন হয় সেখানে রবীন্দ্রনাথকে যোগদানের জন্য তারা অনুরোধ করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চীন ও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা আলোচনা করে গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচীর উপর

জোর দেন। তবে এই গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায় হল গ্রামবাসী জনতার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হয় ততদিন স্বাধীন স্বরাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বহু দূরে থাকবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চাইলে কবি বলেন,

"You in China have certain advantages which we in India lack. You are not under foreign subjection .... But you are suffering from a conflict of ambitions harassing the whole country, and it seems to be following an interminably vicious circle. With all their strength of determination and power of self-sacrifice, let your people effectively decide to have a long period of settled government even if it is not the best government possible. Let it only give you sufficient time completely to irrigate the mind of your people, to develop its potential wealth and thus enable your nation to realise the majesty of its humanity." (V. B. Bulletin, P. 66-72 ভারতে জাতীয়তা (২) পৃ. ৪৪৩)

ভারত-চীন সাংস্কৃতিক সমিতি ও চীনাভবন

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন চর্চাও শুরু হয়। প্রথমে পড়াতেন ডঃ লিন ও আং-চিয়াং, তারপর ১৯২১ সালের শেষভাগে অধ্যাপক সিলভাঁ এসে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে রেঙ্গুন থেকে অধ্যাপক ডো-লিম্ এসে বৈজ্ঞানিকভাবে চীনা ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করেন। ১৯২৫ সালে আসেন ইতালীয় অধ্যাপক তুচ্চি। তিনি চীনা ক্লাসিকস ও চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যাপনা করেন। লিম ও তুচ্চি চলে যাওয়ার পর সাময়িকভাবে চীনা অধ্যাপনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৭ সালে সিঙ্গাপুর ভ্রমণকালে তান-য়ুন শান (T'an Yun-Shan) নামে এক উজ্জ্বল যুবকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। তাঁকে কবি শান্তিনিকেতনে চীনা শিক্ষক হিসেবে আসবার জন্য আহ্বান জানালেন। কবির আমন্ত্রণেই তান-য়ুন-শান ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি এখানে প্রায় তিন বছর ইংরেজি ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চা অনুশীলন করে ১৯৩১ সালে দেশে ফিরে যান। তাঁকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র স্থাপনের চিন্তা দানা বেঁধে উঠে।

১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগেই চীনের জাতীয় সরকারের পক্ষে তাই চুয়ান হেসিয়েন (Tai Chuan Hesien) চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্য কবির কাছে প্রস্তাব দেন। তাতে কবি সানন্দে সম্মতি জানান। সে অনুযায়ী ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক তান তাঁর সহযোগী বন্ধু অধ্যাপক চেন্ ইউ-সেনকে সঙ্গে নিয়ে আবার শান্তিনিকেতনে আসেন এবং এখানে

ভারত-চীন সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কবির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর 'ভারত চীন সংস্কৃতিক সমিতি' (Sino-Indian Cultural Society) গঠনের উদ্দেশ্যে কবির উপস্থিতিতে ১৯শে ও ২৬শে আগস্ট, ১৯৩৪ দুটি আলোচনা সভা হয়। সভায় এই সমিতির কর্মকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কার্যসূচী হিসেবে শান্তিনিকেতনে একটি চীনা ভবন বা অট্টালিকা নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। চীনা অধ্যাপকদ্বয় এর ব্যয়ভার বহনের জন্য চীনদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের আশ্বাস দেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও তাঁর চীনদেশীয় বন্ধুদের উদ্দেশ্যে এক আবেদন জানান। তাতে তিনি বলেন,

"It gives me great pleasure to hail you as co-workers for the cause with which I have identified myself all my life, and I am proud to offer our Santiniketan as the centre for the activities of a Sino-Indian Cultural Society which will embrdy the cause for which we are striving.

"It will take some time to build up this great society, which should insure a continual interflow of cultures; but we would be wise to make beginning immediately in the form of erecting h e a hall called the Chinese Hall, where students and scholars from China could stay and co-operate with us. That Hall will serve as a foundation on which to build our higher hope.

"I appeal to my friends in china to help in the working out of this plan, with their sympathy and their fonds."

(The Christian Science Monitor-28th Sept., 1934)

কবির এই আবেদনবাণী নিয়ে তান-য়ুন-শান ও অধ্যাপক চেন-ইউ-সেন ফিরে গেলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের এক ইন্টিক্লোজে সম্বর্ধিত করেন। ফিরে এলেন ১৯৩৬-এ বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ ও গ্রন্থ সংগৃহীত করে। শুরু হল চীনভবনের নির্মাণ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ এর আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শুরু হয় চীনা, তিব্বতী, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা চর্চা, বৌদ্ধ ও অন্যান্য প্রাচ্য ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা।

চীন বিদ্যা প্রসার সূত্রে অধ্যাপক চান চিয়াংকাইশেক এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডা চেন লি-ফুর সাহায্যে চীনা বৌদ্ধ ত্রিপিটক সাংহাই সংস্করণের বিশাল গ্রন্থ নিয়ে এখানে আসেন। এই চীনা ত্রিপিটক ছাড়াও চীনভবন গ্রন্থাগারে আছে দুষ্প্রাপ্য কাঠের ব্লকে ছাপান সমগ্র তিব্বতী তাঞ্জুর এবং কাঞ্জুর সংস্করণ ত্রিপিটক। এদেশে চীনভবনের গ্রন্থাগারকে প্রাচীন এবং একালীন গ্রন্থ সংগ্রহে সব থেকে বিশিষ্ট বলা চলে। চীনভবন ও তার গ্রন্থাগারের জন্য তখন চিয়াং কাই-শেক দেন পঞ্চাশ হাজার টাকা, চীন সরকার দেন দুই লক্ষ টাকা, এবং সিঙ্গাপুর ও চীনের অন্যান্য কিছু বিদ্যাপ্রেমীর কাছ থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দান আসে। দান আসে এদেশীয় বিড়লা, সিংহানিয়া প্রমুখদের কাছ থেকেও।

বিশ্বভারতীকে চীনে বলা হত 'কুয়ো চি তা শু' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনভবন 'চুং কুয়ো শুয়ে য়ুয়ান'। চীনভবনের ক্রিয়াকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় চীন-ভারত সংস্কৃতি পরিষদ। প্রতি বৎসর পৌষ উৎসবের সময় পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হত। এই পরিষদ থেকে অধ্যাপক তানের অনেক বই বা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনের কথা ছিল জওহরলাল নেহেরুর। জওহরলাল তাঁর সম্মতিও জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটাকে কি ভাবে দেখতেন সে সম্পর্কে ২৮ মার্চ, ১৯৩৭ তারিখে তিনি জওহরলালকে লিখেছেন,

"চীন বাসীরা এক বিরাট লাইব্রেরি ও সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা ভারতকে দান করেছেন। আমরা যদি এটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে না দেখি তবে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। এই ব্যাপারে উদ্যোক্তা হচ্ছেন চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি। মার্শাল চিয়াং কাইশেক, প্রেসিডেন্ট লাই চি-তাও এবং চীনা জাতীয় গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর প্রভৃতি চীন দেশের জনজীবনের নেতারাই এই সাংস্কৃতিক সমিতির সংগঠক। অতএব বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার যথাযোগ্য মনোভাব নিয়েই এ দানকে গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এবং এই সমিতির কার্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এমনভাবে করা দরকার যাতে আমাদের চীনা বন্ধুদের এই ধারণা হয় যে, ভারত তাঁদের এই মহান দানের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত লোক ত আমি ভেবে পাচ্ছিনে। তুমি অবশ্যই আসবে।..."

এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের জন্য চীন থেকে প্রায় ৮০ হাজার পুস্তক সংগ্রহ করে অধ্যাপক তানের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে পাঠান হয়। এতে কবির উৎসাহ ও আনন্দের সীমা ছিল না।

১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন চীনাভবনের দ্বার উদ্ঘাটন হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য জওহরলাল উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে বলেছিলেন :

"ইতিহাসের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চীন এবং ভারত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। উভয়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য আছে। এই দুই দেশ তাহাদের সংস্কৃতি ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ লইয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

"আজও এই দুইটি দেশ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে। পরস্পরকে নূতনভাবে চিনিবে এবং জানিবে এবং অতীত ও বর্তমান হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে। প্রত্যেকেই উহার নিজের আদর্শ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে পরস্পরের সহিত বুঝাপড়া করিবে। শান্তিনিকেতনে যে চীনা-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। আমি এই ভবনের উদ্বোধনকে অভিনন্দিত করি। এই 'চীনাভবনই' চীন এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মেলনস্থান হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। যে সকল চৈনিক পণ্ডিত ও বন্ধু এই ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"...

যাই হোক বৈদিক শ্লোক ও মন্ত্র উচ্চারণ এবং বুদ্ধের স্তুতিমূলক গানের দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর China and India নামক দীর্ঘ ভাষণে বলেন,

"আজ আমার জীবনের একটা বড় দিন। আমাদের অতীত ইতিহাসের মধ্যে চীনের সহিত আমাদের সংস্কৃতি ও বন্ধুত্বের যোগ রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে। বহুদিন হইতে আমি সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যখন আমাদের জাতির পক্ষে আমি এই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ হইব।...

প্রসঙ্গত তিনি তাঁর চীন ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেন, "বহু বৎসর পূর্বে" আমি যখন চীনে গিয়েছিলাম তখন ভারতের হৃদয় হইতে উৎসারিত যে প্রাণ-প্রবাহ গিরিমালা অতিক্রম করিয়া সুদূর দেশের একটি জাতির মানসক্ষেত্র উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই। আমার সেই মহান তীর্থযাত্রীদের কথা মনে হইল।...

"সেইবার আমি চীন জাতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলাম, 'বন্ধুগণ, — সংযোগের সেই স্রোতোপথ মুক্তধারা করিবার অনুরোধ জানাইবার জন্য আমি আসিয়াছি। আমার আশা আছে, আজও সেইপথ বিলীন হইয়া যায় নাই।...

"আমার সেই আমন্ত্রণের ফল আজ দেখিতেছি। চীন হইতে বন্ধুগণ তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চীন হইতে ছাত্র ও পণ্ডিতগণ এখানে আসিবেন, —আমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিবেন। দশ শতাব্দী ধরিয়া এই দুই জাতির মধ্যে যে সংযোগ ব্যাহত হইয়াছে ধীরে ধীরে আবার তাহা গড়িয়া উঠিবে। এই জন্যই বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হইয়াছে। এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতেও মানবজাতির ঐক্যে বিশ্বাসী এবং নিজেদের বিশ্বাসের জন্য দুঃখবরণ করিতে প্রস্তুত ব্যক্তিগণের ইহা মিলনস্থল হইয়া রহিবে।"...

প্রসঙ্গত কবি সমকালীন বিশ্বের সঙ্কটের কথাও উল্লেখ করেন, ... "অন্ধকার জগতে জাতিগুলি দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; — একদল অপরের স্বাধীনতা পদদলিত করে, অপর দল নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। ফলে অপরের অধিকারের উপর জবরদস্তি বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের সংস্কৃতির সহিত আমাদের কোন পরিচয় নাই। সন্ত্রাস কবলিত এই জগৎ—ভীতি ও সন্দেহে ইহার আকাশ কালো হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিকামী জাতিগুলি পরস্বলুব্ধদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে।

"যে যুগে আমরা বাস করিতেছি তাহা কি মানবীয় জগতের রাত্রি নহে—জগৎ কি নিদ্রাচ্ছন্ন নহে? নিরাময় কুটীরগুলির অর্গলিত দ্বারগুলোর মত কি বিচ্ছিন্ন জাতিগুলি শত বিধিনিষেধের অন্তরালে নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখে নাই। ইহা কি সভ্যতার তামসময় যুগের নির্দেশ করিতেছে না? আমরা কি এই কথা বুঝিতে আরম্ভ করি নাই যে, কেবল ডাকাতের দলই আজ জাগ্রত।

"কিন্তু আমি নৈরাশ্যগ্রস্ত নহি। প্রভাতের আলো যখন ফোটে নাই তখন যেমন

পাখির কণ্ঠস্বরে অনাগত উষার বন্দনা গান ধ্বনিত হয় তেমনি আমাদিগকে নবযুগের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"...

অবশেষে কবি চীনের ঐতিহ্যপূর্ণ মহান সংস্কৃতির উল্লেখ করে বলেন, ... "বিশ্বমানবের কল্যাণের দিক হইতে যাহার একটা চিরস্থায়ী সার্থকতা আছে তাহা পুরাতন কি আধুনিক তাহা বিচার না করিয়া সেই জিনিসকেই আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে। চীনের সংস্কৃতি জাতিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রেরণা দিয়াছে এবং বিশ্বের কল্যাণসাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এই চীনা সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অপেক্ষা অন্য কোন্ জিনিসের প্রতি মানবচিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে? চীনের সংস্কৃতি নিখিল হিয়ার গোপন ছন্দের যে সন্ধান দিয়াছে তাহা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নহে। উহা বিশ্বপতির দান। কারণ একমাত্র তিনিই এই গোপন রহস্য অবগত আছেন।

"চীন জাতির সহিত আমার দেশবাসীরাও এই দানের অংশ গ্রহণ করুক, ইহাই আমার কামনা।" — (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭)

এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক তান-য়ুন-শান চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সভা ও চীনাভবন প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "এই মিলন কেন্দ্রে চীন হইতে ছাত্রগণ আসিয়া ভারতীয় ভাষা, দর্শন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে এবং ভারতীয় বিদ্যার্থী চীনের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া চীন দেশে যাইয়া চৈনিক সভ্যতা সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে চীনদেশে যাইবার প্রেরণা লাভ করিবে। চীনের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম সম্বন্ধে এই চীনাভবনে আমরা লক্ষাধিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি; এবং আরও বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। এই চীনাভবনে চীন-ভারত সভ্যতার এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। এখানে আমরা চীন ও ভারতের প্রাচীন যুগের মৈত্রী ও সংস্কৃতির বন্ধন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব এবং তৎকালে উভয় দেশের মধ্যে সংস্কৃতিমূলক নূতন সৌহার্দ্য সৃষ্টি করিব।"—(ঐ)

তাছাড়া চীনের প্রধান গবেষণাকেন্দ্র 'চাইনীজ ন্যাশনাল সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'—-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ সাই ইউয়ান-পি, 'ন্যাশনাল এগজামিনেশন ইউনিয়ন' এর প্রেসিডেন্ট মিঃ তাই চি তাও এবং ন্যাশনাল এগজামিনেশন কমিশন-এর চেয়ারম্যান ও চীনের 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের' সেক্রেটারী মিঃ চিন তা-চি একত্রে একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছিলেন। চীনের কনসাল জেনারেল সভায় এই সব বাণী পাঠ করেন। কলকাতা থেকেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধ বাগচি, অধ্যাপক সত্যেন বসু, সত্যেন মজুমদার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীকালে বেশ কয়টি চীনা শুভেচ্ছা মিশন বিশ্বভারতীতে এসেছে। "যেমন, বৌদ্ধ মিশন (১৯৪০), তাই চি তাও পরিচালিত চীনা শুভেচ্ছা দলের মিশন সফর (১৯৪০), সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা মিশন (১৯৪৩) ইত্যাদি। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক সদলে আসেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫১-তেও বিশিষ্ট একটি চীনা সাংস্কৃতিক মিশন আসেন এখানে।" (উদীচী, পৌষ, ১৩৯২)

চীনে জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে

চীনা ভবন প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পরেই ৭ই জুলাই, ১৯৩৭ ফ্যাসিস্ট জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে চীনে ভয়াবহ ও পৈশাচিক আক্রমণ শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে এই আক্রমণ এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা চরমাকার ধারণ করে। জাপান চীনের একের পর এক শহর দখল করে নেয়। সাংহাই-এর উপকণ্ঠে তখন চীন ও জাপ সেনার প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

চীনে জাপানিদের এই আক্রমণে ভারতবর্ষে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের মনও অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। কিন্তু প্রতিকারের উপায় নেই। হঠাৎ কবি ১০ই সেপ্টেম্বর অসুস্থ হয়ে অচৈতন্য হয়ে যান। কবির এই অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে 'চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি'র অন্যতম পরিচালক এবং ন্যাশনাল সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর সভাপতি ডাঃ সাই ইউয়ান পেই (D. Tsai Yuan Pei) এবং চীনের জাতীয় সরকারের 'বোর্ড অব এগজামিনেশনের'র সভাপতি তাই-চি-তাও (Tai-Chi-Tao) টেলিগ্রাম পাঠান।

এই তারবার্তা পেয়ে কবি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করেন এবং রোগশয্যা থেকেই চীনা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ২১ সেপ্টেম্বর এক বাণী প্রেরণ করেন :

"আমার জন্য আপনাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, আমি আরোগ্যের পথে। দেশের এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলেও যে আমার চিন্তা আপনাদের মনে স্থান পায় ইহা বস্তুতই বিস্ময়কর। আপনাদের মহীয়সী জন্মভূমির উপর অন্যায় ও অযৌক্তিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনারা যে অসীম সাহসিকতার সহিত বাধাদান করিতেছেন আমি মুক্তকণ্ঠে তাদের প্রশংসা করিতেছি এবং আপনাদের জয় কামনা করিতেছি। আপনাদের জয়ে ন্যায় ও মানবতা জয়যুক্ত হউক—জাপানেও আমার বিস্তর বন্ধুবান্ধব বিদ্যমান—জাপানের সাহসী সন্তানগণ তাহার শাসকগণ কর্তৃক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়া প্রাচ্যের মহান্ আদর্শের অসম্মান করিতেছে, দেখিয়া আমি অতিমাত্র বেদনা অনুভব করিতেছি। আজ আমাদিগকেই—যাহারা একদিন তাহাদিগকে ভালবাসিয়া আসিয়াছি—তাহাদের কৃত অন্যায় সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবার জন্য এই সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় কামনা করিতে হইতেছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

এই চিঠির মধ্যে চীনে জাপ আক্রমণের সম্পর্কে কবির যে কত উদ্বেগ তা সহজেই বুঝা যায়। আশ্চর্য ঐ তারিখেই (২১শে সেপ্টেম্বর) মধ্যরাত্রি থেকে নানকিং এবং ক্যান্টনের উপর জাপান অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ করতে থাকে। এই সংবাদে ভারতবর্ষেও প্রবল উত্তেজনা দেখা যায়। ২৬শে সেপ্টেম্বর দেশের সর্বত্র জাপ-আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও বিক্ষোভ করে 'চীন দিবস' পালিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত এখানেও

জাপানী পণ্য বর্জন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতে এই জাপ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু।

ভারতবর্ষে যখন জাপ-বিরোধী আন্দোলন চলছিল তখন হঠাৎ টোকিও থেকে রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথকে এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে তার পাঠান :

"ব্যবসায়ী, ছাত্র ও অন্যান্য যে সকল ভারতবাসী এখানে আছেন, তাঁহারা আপনাকে ভারতের স্বার্থের খাতিরে এবং জাপ-ভারত বন্ধুত্বের খাতিরে আপনাকে কংগ্রেসের ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জাপ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের বাধা দিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লালসার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে আন্দোলন চলছিল রবীন্দ্রনাথের তার প্রতি সমর্থন ছিল। তা ছাড়া যেখানে অমানুষিক বর্বরতা এবং দস্যুতা সেখানে রবীন্দ্রনাথের মানবিকবোধ কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ভদ্র অথচ বেশ কঠোর ভাষায় রাসবিহারীকে এক পত্র লিখে জানালেন,

"তোমার তার পাইয়া আমি অনেকক্ষণ অস্বস্তি ভোগ করিয়াছি। তোমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে হইল বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। যাহা আমার মনোবৃত্তির বিরোধী নয়, তুমি যদি তেমন কোনও উদ্দেশ্যে আমার সহযোগিতা চাহিতে তবে ভালো করিতে। ... এশিয়ার অন্যান্য সকলের ন্যায় আমিও একদিন জাপানের অনুরাগী ছিলাম, জাপানকে স্বপ্ন দেখাইতাম এবং সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতাম যে, এতদিনে এশিয়া জাপানকে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ পাইয়াছে এবং নববলে বলীয়ান জাপান বৈদেশিক আক্রমণ হইতে প্রাচ্যের সংস্কৃতি রক্ষা করিবে। কিন্তু ... জাপান তাহার সমস্তই ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। আজ জাপানই অসহায় প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই নিষ্ঠুর দৈনন্দিন হত্যাকাণ্ড এবং বর্বরতার এই নির্লজ্জ সমর্থন তাহার অর্থনৈতিক শোষণ এবং ভৌগোলিক আধিপত্যবিস্তার অপেক্ষাও নিদারুণ। ... বিজ্ঞান যতদিন পর্যন্ত মানুষের বর্বরতাকে বর্তমান যুগের ন্যায় এমন অমোঘ করিয়া তোলে নাই, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ এমন নিষ্ঠুর ছিল না।

"কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমান যুগে যদি কোনও জাতি অপর জাতিকে আক্রমণ করে, তবে সে শুধু সাম্রাজ্যবাদী দুরাকাঙ্ক্ষার অপরাধেই অপরাধী হয় না, নির্বিচারে এমন ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায় যাহার তুলনায় প্রাণঘাতী মহামারীও তুচ্ছ। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বিবেক যদি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া প্রতিবাদধ্বনি তোলে, তবে আমি কেন তাহাতে বাধা দিতে যাইব? কোনও ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এই প্রতিবাদ হইতেছে না,...

"আমি যে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে। বিশ্বাস করিও জাপানিদের প্রতি আমার যেমন সহানুভূতি আছে, জাপানপ্রবাসী আমার স্বদেশবাসীদের প্রতিও আমার তদ্রূপ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন,

মুমূর্ষু চীন হইতে যে বুকফাটা করুণ আর্তনাদ আসিতেছে, তাহা এমন মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক যে তাহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ নভেম্বর, ১৯৩৭)

দুনিয়াতে চীনের উপর জাপানের আক্রমণ ও বর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংহাই, নানকিং প্রভৃতি শহরেরও পতন ঘটেছে। তবু চীনের মানুষ বিশেষ করে চীনা অষ্টম রুট সেনাবাহিনী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে জাপ-সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিল। এই অষ্টম রুট বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন চু-তে, মাও-সে তুঙ, চৌ এন লাই প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। চিয়াং কাইশেক তো জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই খবর আমাদের দেশে আসে নি। জওহরলাল নেহেরু তখন কংগ্রেসের সভাপতি। এঁর কাছে ভারতবর্ষ থেকে সাহায্য পাঠানোর জন্য এগনেস স্মেডলি, মিস এগনেস স্মেডলি, জেনারেল চু তে, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ অনেকে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। এসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন। ৭ই পৌষ উৎসবের দিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথ চীন-জাপ আক্রমণের এই বীভৎসতার কথা উল্লেখ করে বললেন,

"আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তার খবর পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আজ এই সংগীতমুখর শান্ত প্রভাতে আমরা যখন উৎসবে যোগ দিয়েছি এই মুহূর্তেই চীনে কত লোকের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে—পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে, ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যাচ্ছে, যেন মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নাই—সে কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। অপরদিকে আছে আপন-সাম্রাজ্যলোভী-উদ্ধত দল, তারা এই দানবের কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের স্বাক্ষর লুপ্ত। চীনকে যখন জাপান অপমান করেছে সিনেমার ভিতর দিয়ে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—যেমন অপমান আমাদের দেশেও হয়ে থাকে—তখন এই প্রতাপশালীর দল কোনো বাধা দেয়নি, বরং চীনকে শাসিয়ে দিয়েছে, বলেছে চীনের চঞ্চল হবার কোনো অধিকার নেই। আমাদের দেশেও দেখি, দুর্বলকে অবমাননার কোনো প্রতিকার নেই। তবুও একথা বলব, যারা আজ দুঃখ পাচ্ছে প্রাণ বিসর্জন করছে, সৃষ্টি করছে তারাই। এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপমানিত জাতিরাই নূতন যুগকে রচনা করছে। প্রতাপশীল উদ্ধতরা তাদের ঐশ্বর্যভারে নত, পাছে কোনো জায়গায় তাদের কোনো ক্ষতি হয় এইজন্য তারা দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ালো না। তবু হতাশ হব না। যারা পীড়িত হচ্ছে, মৃত্যুকে বরণ করেই তারা নূতনকে সৃষ্টি করছে, যারা দুঃখ পেল তারাই ধন্য। যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ আশা দুরাশা নয়—বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না, তাহলে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ, তবু তার বড়ো বড়ো কামনা মরে নি। কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণার জন্য না যে, এখনো মানুষ চলেছে; এখনো তার মহত্ত্বের উৎস শুকোয় নি। মনুষ্যের

ইতিহাসের অন্তরে যদি মহত্তের কোনো স্থান না থাকত তবে মনুষ্যের ইতিহাস এত অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণশীল থাকত না। আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এটাই মানুষের আশ্বাসবাণী। সমস্ত সংঘাতের মধ্যেও কল্যাণের রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে— সমস্ত দুঃখের মধ্যে সমস্ত পাপের মধ্যে পুণ্যের আবির্ভাব এই আমাদের আশা।

চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু, আমাদের কী করবার আছে? আমরা কী করতে পারি? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি—কিন্তু বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ? এই দুঃখবোধ দ্বারা, দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে, আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি—এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির অঙ্গ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে। আমরা লড়াই করতে না পারি, কিন্তু এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ—যদি এ কথা বিস্মৃত না হই যে মানব ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—এ কথা মেনে নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিন-গান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।" (ক্রান্তের সৃষ্টি: মাঘ, ১৩৪৪)।

কেবল চীনদেশে নয়, ফ্যাসিস্ত দানবিকতা আবিসিনিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশেও বিশ্বআতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীব্যাপী এক উদ্দাম নিষ্ঠুরতা এবং হিংস্রতা নিয়ে দৈত্যেরা মানব সমাজে জেগে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সব খবরে অত্যন্ত বিচলিত। গত শতাব্দীর শেষভাগে যেমন একটা প্রচণ্ড হিংস্রতা এবং নিষ্ঠুরতা দেখা দিয়েছিল চতুর্দিকে তেমনি এই দানবিকতা সকলকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে 'প্রান্তিকের' শেষ কয়েকটি কবিতায়। আকস্মিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভ করার পর কবি অনুভব করলেন বিশ্বের চারিদিকে নরকাগ্নি জ্বলে উঠেছে। সেজন্য তিনি লিখলেন—

"দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল—সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা।...
এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,

আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

২৫।১২।৩৭, ১৭ নং কবিতা

শুধু বিক্ষোভ নয়, ধিক্কার নয়। একই সঙ্গে কবি এই সাম্রাজ্যলোলুপ ফ্যাসিস্ত দানবশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন—

"নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

(২৫।১২।১৯৩৭, ১৮ নং কবিতা)

৯ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ দেশের সর্বত্র 'চীন দিবস' পালিত হয়। চীন সাহায্য তহবিলে অর্থ ঔষধ পত্রাদি সংগ্রহ চলতে থাকে। কবি স্বয়ং এই তহবিলে ৫০০ টাকা দান করেন।

চীন দিবস

চীন-জাপান যুদ্ধের ভয়াবহতা যেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল তেমনি জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট গেরিলা এবং অষ্টম রুট আর্মির অসীম বীরত্ব ও দক্ষতারও পরিচয় পাওয়া গেল। এ্যাগনেস স্মেডলি এই অসীম বীরত্বের কাহিনী ভারতবর্ষে নিয়মিত পাঠাতেন। সেগুলি এদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অসীম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এই সব খবর পাঠ করতেন। জাপানীদের বর্বরতায় তিনি খুবই বিচলিত। এরই মধ্যে একদিন তিনি সংবাদপত্রে পাঠ করেন, জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে; ভক্তির বাণ মারছে বুদ্ধকে।" এই ঘটনাকে বিদ্রূপ করে কবি 'বুদ্ধভক্তি' নামে একটি কবিতা লেখেন ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৮। কবিতাটি 'নবজাতক' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

"হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।

বিভীষিকা ঘনিয়ে এসেছে। ১২ মার্চ হিটলারের নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। সেখানে নাৎসীরা ইহুদিদের উপর প্রবল নির্যাতন ও পীড়ন শুরু করে।

শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে এই সব খবর পড়ে খুবই অশান্ত ও বিচলিত হয়ে ওঠেন। সব চেয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলোও এগিয়ে আসছে না। বরং পরোক্ষে তাদেরই তোয়াজ করে চলেছে। নববর্ষের দিনে (১৩৪৫) অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির এক পত্রে তার পরিচয় আছে ঃ

"আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে একী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রমিত হয়ে চলেছে—দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে। জগৎজোড়া গুণ্ডা তার তাড়নায় একপক্ষে অভ্রভেদী-স্পর্ধা অন্যপক্ষে ভূলুণ্ঠিত সেলাম—কী অসহ্য কুশ্রী। ধ্বংসে মহাসাগরের মুখের এই ভাঁটার টান একদিন হয়তো থমকে যাবে; একদিন হয়তো উল্টো স্রোতের জোয়ারে কল্লোলিত হয়ে উঠবে—সেই শুভ লক্ষণ দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে। ... এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে—এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না—মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে।" (কবিতা—আশ্বিন, ১৩৫০, ভারতে জাতীয়তা (৪) পৃঃ ৩৫০)

কবি সেবার গ্রীষ্মকালে ছিলেন কালিম্পঙে। এবার জন্মদিন উপলক্ষে কবি যে কবিতা এবং বাণী পাঠান তাতেও এই মানসিক যন্ত্রণা এবং ক্ষোভের কথা আছে। বাণীতে বলেন, "মানবের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যাহা কিছু মহান তাহার প্রতি এই কুৎসিত ব্যঙ্গ আজ দানবীয় ভ্রূকুটিতে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। এই প্রেতচ্ছায়া ধ্বংসের সমান আন্দোলিত করিয়া আমার চক্ষের সম্মুখে বিভীষিকা সঞ্চার করিতেছে। জীবনসায়াহ্নে এই দৃশ্য দেখিয়া কি আমায় জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে?" (আনন্দবাজার ১২-৫-১৯৩৮)

সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থের প্রথম 'জন্মদিন' কবিতায় লিখেছেন ঃ

ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুনে তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে

পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

কিছুদিন পরেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল ক্যান্টন শহরে জাপানীদের পৈশাচিকতা আগেকার সীমাকেও অতিক্রম করেছে। এক সপ্তাহ ধরে জাপানী বোমারু বাহিনী উপর্যুপরি প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করে (২৬মে—৩রা জুন) সব কিছু বিধ্বস্ত করে দেয়। জনশূন্য ক্যান্টন নগরীর রাজপথে শিশু আর নারীদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে। এই সংবাদে সমগ্র জগৎ শিহরিত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ব্রিটেন ফ্রান্স প্রমুখ বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্রপ্রধানেরা অবশ্য এর কেবল মৌখিক প্রতিবাদ এবং চীনাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেই তাদের কর্তব্য শেষ করল।

ভারতবর্ষে তখন চীনের জন্য সাহায্য সংগ্রহের অভিযান চলছিল। ক্যান্টনে জাপানীদের বীভৎস তাণ্ডবলীলার সংবাদে সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে চীনে এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ১২ই জুন দেশের সর্বত্র 'চীন দিবস' পালনের আবেদন জানান। দেশে ব্যাপক সাড়া জাগে। ঐদিন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে বঃ প্রাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির আহ্বানে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলের সভায় মেডিকেল মিশন পাঠাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, চীন সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য এবং জাপানী পণ্যদ্রব্য বর্জনের জন্য আবেদন জানানো হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী অষ্টম রুট বাহিনীর সাহায্যে চীনে যান। তার মধ্যে ছিলেন ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস। তিনি ১৯৪২ সালে চীনেই মৃত্যুবরণ করেন। ঐ টীমের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিজয় বসু। সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বে গিয়ে ঐ মেডিক্যাল মিশনকে শুভযাত্রা করিয়ে দেন। সেখানে সরোজিনী নাইডুও উপস্থিত ছিলেন। বাকি চারজনই ভারতে ফিরে আসেন।

১২ই জুনের চীন দিবসে আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র ৭ই, ৮ই এবং ৯ই জুলাই তিন দিন চীন সাহায্য তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবার আবেদন জানান।

এই বৎসর অধ্যাপক তান য়ুন শান চীনে যান। কবি কালিম্পঙ যাওয়ার আগেই তাঁর মাধ্যমে চীনের জনগণের উদ্দেশ্যে এক বাণী পাঠান। এই বাণীতে কবি জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং চীনাদের জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন

জানান। খবর আসে চিয়াং কাইসেকের নির্দেশে চীনের বেতারে এই বাণী প্রচারিত হওয়ায় চীনা জনগণ এতে খুবই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কবি তখন ২৬শে জুন এই বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেন। ২৮শে জুন আনন্দবাজারে এই বাণীটি প্রকাশিত হয়। সেই বাণীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"সংস্কৃতির সম্পদে সম্পদশালী করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রতিবেশী যে জাতি আপনাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই যাহাদের কর্তব্য ছিল আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাহারা হঠাৎ আজ পশ্চিম হইতে আমদানী করা সাম্রাজ্যলুব্ধতায় প্রলুব্ধ হইয়া প্রাচ্যের অদৃষ্টকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলার বিরাট সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছে। তাহাদের মদমত্ত তর্জন গর্জন নির্মম এবং নির্বিচার নরমেধ, শিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, মানব সভ্যতার সাধারণ নিয়মের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা এশিয়ার নূতন ভাবধারাকে কলঙ্কিত করিয়াছে...জাপান তাহার ভবিষ্যৎকে হেলায় নষ্ট করিয়াছে।

"জাপান তাহার 'বুসিদোর' ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাহাদের নিন্দনীয় অভিযান যে-ভাবে আমাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়াছে তাহা বড়ই পীড়াদায়ক। জাপানের আপাতত যে সমস্ত ক্ষেত্রে জয় হইয়াছে, তাহা মারাত্মক পরাজয়ের মধ্যে ধূলায় বিলীন হইতে বাধ্য।

"আমরা একমাত্র এই আশায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি যে, হিংসাপ্রণোদিত যে সুপরিকল্পিত আক্রমণ আপনাদের দেশের উপর চলিয়াছে (the deliberate aggression of violence that has assailed your country) তাহাতে জনগণ বীরত্বের সহিত দুঃখকে বরণ করিয়া লইবে এবং সেই দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া জাতির নূতন জীবন লাভের সম্ভাবনা আছে। আপনারাই পৃথিবীর একমাত্র মহান জাতি, যাঁহারা সামরিক শক্তিকে কোনদিন জাতির গৌরবময় বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রশংসা করেন নাই। সেই সামরিক পশুশক্তি উহার ঘৃণ্য প্রতিপত্তিতে আজ যখন আপনাদের দেশ দখল করিতেছে তখন ইহাই আমাদের একমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা যে, আপনারা এই শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হন এবং আর একবার ইহাই প্রমাণ করুন যে, দুর্বল পৃথিবী তাহার উচ্চ আদর্শকে যেখানে বিসর্জন দিতেছে, সেখানে আপনারা শ্রেষ্ঠ মানবতার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান। যদি আপনারা এক্ষণেই বাহ্যত জয়লাভ নাও করিতে পারেন তথাপি আপনাদের নৈতিক জয় মলিন হইবে না। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে জয়ের বীজ আপনাদের গভীরতম অন্তরে ছড়াইয়া পড়িবে তাহা পুনঃ পুনঃ অমর বলিয়া প্রমাণিত হইবে।"

নোগুচির পত্রের প্রতিবাদ

জাপ আক্রমণের নিন্দা করে অধ্যাপক তান-এর মারফৎ রবীন্দ্রনাথ চীনে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তা চীনের বেতার মারফৎ প্রচারিত হয় এবং তা প্রাচ্য এশিয়ার সংবাদপত্রে

প্রকাশিত হয়। তাতে স্বাভাবিকভাবেই জাপানে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়। জাপান তথা প্রাচ্য এশিয়ার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও মনীষী অধ্যাপক নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে ২৮ আগস্ট, ১৯৩৮ একটি খোলা পত্র লেখেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে এই পত্রের কপি রবীন্দ্রনাথের অনুমতি না নিয়েই বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন :

"১৯১৬ সালে যখন আপনি টোকিওতে এক জনসভায় বক্তৃতামঞ্চ হইতে জাপানের পাশ্চাত্যানুকরণপ্রিয়তার নিন্দা করিয়াছিলেন তখন আমি আপনার মত সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছিলাম ও আপনার নির্ভীক উক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...কিন্তু আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্তমান চীন-যুদ্ধ পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের ফল, তবে আপনি ভুল করিয়াছেন। আমার মতে এই যুদ্ধ তো উন্মত্ত কলহবৃত্তি নয়ই, বরং ইহা বিরাট এশিয়া মহাদেশে এমন এক জগৎ রচনার একমাত্র উপায়—ভয়ঙ্কর হইলেও একমাত্র উপায়—যে জগতে নিজে বাঁচিয়া থাকা ও অপরকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়ার নীতি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এশিয়া যাহাতে এশিয়াবাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তজ্জন্যই এই যুদ্ধ। ধর্মযোদ্ধার দৃঢ়তা ও শহীদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ এই পত্র পেয়ে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কোন শিল্পী বা সাহিত্যিক এভাবে কোন আগ্রাসী যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেন তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ নোগুচিকে এক দীর্ঘ উত্তর দেন। তিনি লিখেছেন :

"আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি, আপনার লেখার মধ্য দিয়া ও আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমি জাপানের যে প্রশংসনীয় ভাবধারার পরিচয় পাইয়াছিলাম, এই পত্রের সুর ও বিষয়বস্তুর সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ইহা চিন্তা করিতে দুঃখ হয় যে, যুদ্ধের নেশা সৃজনশক্তিসম্পন্ন কলাবিদকে পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে অসহায়ভাবে অভিভূত করে এবং প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন শক্তি নিজ মর্যাদা ও ন্যায়নিষ্ঠা যুদ্ধ দানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করে।

ফ্যাসিস্ট ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়ার ধ্বংসের নিন্দা আমার ন্যায় আপনিও করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু চীনের উপর আক্রমণ সম্বন্ধে আপনি ভিন্ন দিক হইতে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। নীতির উপরই বিচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, —পাশ্চাত্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া মারাত্মক প্রণালীতে চীনের মানবতার উপর সংগ্রামে জাপান সভ্যতার প্রত্যেক নৈতিক আদর্শ যে লঙ্ঘন করিতেছে, এই সত্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে না। আপনি জাপানের অবস্থা অতুলনীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তুমি সামরিক অবস্থা সকল সময়েই অতুলনীয়, ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। পবিত্র সমরনায়কগণ তাহাদের অত্যাচারের জন্য অভিনব যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী হইয়া ব্যাপকভাবে ধ্বংস ও অত্যাচারের উদ্দেশ্যে উহার উপর দেবত্বের আরোপ করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।

মানবতার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমাজের নৈতিক কাঠামোয় বিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং আপনি যখন 'এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য উহাই হইলেও অনিবার্য উপায়ের' কথা যাহার অর্থ আমার মনে হয় যে, এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষা করার উপায়স্বরূপে চীনা নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ধ্বংসের কথা বলেন, তখন আপনি মানবতার উপরই এমন একটি জীবনধারা আরোপ করেন, যাহা প্রাণীদের মধ্যেও অনিবার্য নহে এবং মধ্যে মধ্যে নীতি হইতে স্খলিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্যে তাহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য হইবে না। আপনি এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিতেছেন, যাহা নরকপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে। আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাসবান, ইহা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; কিন্তু বীভৎস নরহত্যার কার্যে তৈমুরলঙ্গের হৃদয়ে আনন্দ জাগিত, সেই কার্যের সহিত এই বাণী এক শ্রেণীভুক্ত করিবার চিন্তা আমি কখনও করি নাই। জাপানে আমার বক্তৃতায় আমি যখন 'পাশ্চাত্যের অনুকরণের' বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তখন ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সাম্রাজ্যস্পৃহার সহিত বুদ্ধ ও খ্রিস্ট প্রচারিত পূর্ণতার আদর্শ এবং যে মহান সংস্কৃতি ও প্রতিবেশী-প্রীতি লইয়া এশিয়া ও অন্যান্য স্থানের সভ্যতা গঠিত, তাহার তুলনা করিয়াছিলাম। যখন বীরত্বের খ্যাতিসম্পন্ন বুশিদোর দেশকে আমি সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়াছিলাম যে, এই বৈজ্ঞানিক বর্বরতা যাহা পাশ্চাত্যের মানবতাকে গ্রাস করিয়াছে এবং তাহার অসহায় জনসাধারণকে নৃশংস করিয়া তুলিয়াছে তাহা কোন পৌরুষসম্পন্ন জাতির পক্ষে—যে জাতি অভ্যুদয়ের পথে চলিয়াছে ও যাহার সম্মুখে বিরাট ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, কখনও অনুকরণযোগ্য হইতে পারে না। 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই নীতি আপনি আপনার পত্রে যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে উহা রাজনৈতিক লুণ্ঠনের অস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইউরোপের নিন্দনীয় অনুকরণ রহিয়াছে। রাজনৈতিক গণ্ডী ছাড়াইয়া যে বৃহত্তর মানবতা আমাদিগকে এক করিয়া দেয়, উহার মধ্যে তাহার কিছুই নাই।

টোকিওর এক রাজনীতিবিদ সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি কৌতুক বোধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, ইতালি ও জার্মানীর সহিত জাপানের সামরিক মৈত্রীবন্ধন "উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণে হইয়াছে এবং ইহার অন্তরালে পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন নাই।" ঠিক কথা। কিন্তু যে মনোভাব সামরিক স্পর্ধাকে আধ্যাত্মিক বড়াইয়ে পরিণত করে, কলাবিদ্ ও চিন্তানায়কগণ সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিবেন, ইহা লঘুভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্যে, এমন কি রণোন্মাদনার সঙ্কটপূর্ণ সময়েও রণহুঙ্কার ছাপাইয়া উচ্চকণ্ঠে মানবতার নামে নিজ দেশের যোদ্ধাদের কার্যের নিন্দা করিতে পারেন, এমন মহাপ্রাণ লোকের অভাব কখনও হয় নাই। এইরূপ লোক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের জাতির বিবেককে কখনও প্রতারিত করেন নাই। এশিয়া যদি এই সব ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিবে না। আমি এখনও

বিশ্বাস করি যে, জাপানেও এইরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি আছেন; তবে সংবাদপত্রে আমরা তাঁহাদের বিষয় শুনতে পাই না, কারণ সেই সব সংবাদপত্র নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় তাহাদের সামরিক প্রভুদের কথার প্রতিধ্বনি করিতে বাধ্য হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পর বিখ্যাত ফরাসী লেখক যে 'বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতার' (The betrayal of intellectuals) কথা বলিয়াছেন, তাহা বর্তমান যুগের একটি ঘোর দুর্লক্ষণ। আপনি দরিদ্র জাপানীদের ক্লিষ্ট সঞ্চয়, তাহাদের নীরব আত্মত্যাগ ও মৃত্যুবরণের কথা বলিয়াছেন এবং এই করুণ আত্মত্যাগের সুযোগ লইয়া যে সমরসজ্জা করিয়া প্রতিবেশীর উপর আক্রমণ চালান হইতেছে, অমানুষিক উদ্দেশ্যে মানবীয় শ্রেষ্ঠতার সম্পদ লুণ্ঠন করা হইতেছে তাহা আপনি গর্বভরে স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি নিপুণ প্রচারকার্য আজকাল যেন সুকুমারকলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রচারকার্য দ্বারা প্রতিনিয়ত যে বিষ বিস্তার করা হইতেছে, গণতন্ত্রের স্পর্শশূন্য দেশগুলির অধিবাসীদের পক্ষে তদ্দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া প্রায় উপায় নাই; যাহা হউক, অন্তত বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকেরা তাহাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ইহাই লোকে আশা করে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সকল সময় তাহা সম্ভব হয় না। কূটযুক্তিজালের পিছনে রহিয়াছে স্বদেশভক্তির এক বিকৃত আদর্শ; সেই আদর্শে বিভ্রান্ত হইয়া বর্তমান যুগের 'বুদ্ধিজীবীরা' তাহাদের আদর্শবাদের বড়াই করে এবং তাহাদের দেশের জনসাধারণকে ধ্বংসের পথ অবলম্বনে বাধ্য করে। আপনাদের দেশের লোকদিগকে আমি বেশ জানি সুতরাং চীনের নর-নারীদিগকে আফিং প্রভৃতি নেশায় অভ্যস্ত করার পরিকল্পনায় আপনার দেশবাসী যে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতেছে, তাহা ভাবিতেও আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়; কিন্তু তাহারা না বুঝিয়াই তাহা করিতেছে। এদিকে, বর্তমানে চীনে যাহারা জাপানী সংস্কৃতির প্রতিনিধি, তাহারা মানবজাতিকে কলুষিত করার একটা ব্যাপক চক্রান্তজালে আবদ্ধ হতভাগ্য নর-নারীদের উপর তাহাদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করিতেছে। চীন ও মাঞ্চুকুওতে যে লোকদিগকে এইরূপ বলপূর্বক নেশায় আসক্ত করিয়া তোলা হইতেছে, সম্পূর্ণ বিশ্বস্তসূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অথচ জাপান হইতে কোনও প্রতিবাদ আসে নাই—এমন কি জাপানের কবিরাও প্রতিবাদ করেন নাই।

আপনাদের দেশের বহু বুদ্ধিজীবীই এইরূপ মত পোষণ করেন, সুতরাং আপনাদের গভর্নমেন্ট যে তাঁহাদিগকে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে দেন, তাহাতে আমি বিস্মিত নহি। আমি আশা করি, এই স্বাধীনতালাভে তাঁহারা আনন্দিত। গতানুগতিক জীবনে একটু বৈচিত্র্যের জন্য যদিও আপনি আপনাদের দেশের কলাবিদ্‌গণকে 'সুখময় ভবিষ্যতের' অন্তরানন্দলাভের উদ্দেশ্যে এই স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমার মতে তাহা নিষ্প্রয়োজন। কলাবিদের কাজ ও তাহার বিবেকের মধ্যে এইরূপ ভেদ কল্পনা আমি সমর্থন করি না। যে গভর্নমেন্ট তাহার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে জীবনের মূল ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংসসাধনে ব্রতী সেই গভর্নমেন্টের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হইয়া তাহার বিশেষ অনুগ্রহলাভ এবং সেই সঙ্গে ফাঁকিবাজিকে

আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানোকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মানবতার প্রতি কৃতঘ্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি। দুঃখের বিষয় ন্যায্য মতামত প্রকাশ করিতে গেলে ভবিষ্যতে নিজেদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া অন্যান্য দেশগুলি কাপুরুষভাবে নীরবতা অবলম্বন করে। কাজেই দুষ্কৃতিকারীরা নির্বিবাদে তাহাদের ইতিহাস কলঙ্কিত করে এবং চিরদিনের জন্য তাহাদের সুনাম মসীলিপ্ত করে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন পীড়া যেমন রোগীর অজ্ঞাতসারে ধ্বংসলীলা চালাইয়া যায়, দুষ্কৃতকারীর এই দণ্ডভয়হীনতাও তদ্রূপ পরিণামে তাহার বিপদ ডাকিয়া আনে।

আপনার স্বদেশবাসীদের জন্য আমি যারপর নাই দুঃখিত, আপনার পত্র পাইয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। আমি জানি একদিন আপনার দেশবাসীদের মোহ ঘুচিবে এবং রণোন্মত্ত সমরনায়কগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত আপনাদের সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ তাহাদের শত শত বৎসর ধরিয়া দূর করিতে হইবে। তাহারা বুঝিতে পারিবে, আজ জাপানের সৌভাগ্য যে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, সেই ক্ষতির তুলনায় অভিযান নিতান্ত তুচ্ছ। চীন অজেয়। চিয়াং কাই-শেকের নির্ভীক নেতৃত্বে তাহার সভ্যতা অতুল সম্পদের নিদর্শন দেখাইতেছে। অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ চীনাবাসীদের নেতার প্রতি অটুট অনুরক্তি আজ চীনে নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে। অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও চীন প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছে। তাহার পূর্ণজাগ্রত চেতনা সাময়িক পরাজয়ে কিছুতেই দমিত হইবে না। নিছক পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত জাপানের ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান চীন আজ জাপান অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের পরিচয় দিতেছে। চীন মহান— উদারচেতা জাপানী মনীষী ওকাকুরা কেন যে আমাকে পরম উৎসাহভরে এই কথা বলিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ যেরূপ সুস্পষ্ট বুঝিতেছি, পূর্বে আর কখনও তেমন বুঝি নাই।

আপনি বুঝিতেছেন না যে, আপনি আপনার দেশের গৌরব করিতে গিয়া আপনার প্রতিবেশীরই গৌরব করিয়াছেন। কিন্তু আপাতত এই প্রসঙ্গ থাকুক। আক্ষেপ এই যে, আজ জাপান কতকগুলি প্রেত সৃষ্টি করিতেছে; আপনি বোধহয় 'স্পেক্টেটর'-এ মাদাম চিয়াং কাই-শেকের এই কথাগুলি পড়িয়াছেন। চিরস্মরণীয় চৈনিক শিক্ষাকলার প্রেত, তুলনাহীন চীনা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রেত, নেশার বিষে জর্জরিত নিপীড়িত ও উৎপীড়িত শান্তিপ্রিয় নর-নারীর প্রেত। মাদাম চিয়াং কাই-শেক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'এই প্রেত তাড়াইবে কে? অদূর ভবিষ্যতেই যেন চীন ও জাপান পরস্পর মিলিত হইয়া মর্মপীড়াকর অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলে। খাঁটি এশিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবে, কবিরা শান্তির গীত গাহিবে এবং যে মানবসমাজে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রে ব্যাপক ভ্রাতৃহত্যার স্থান নাই, সেই মানবসমাজে পুনরায় তাঁহাদের আস্থা ঘোষণা করিতে লজ্জিত হইবেন না।" ইতি — ভবদীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যেহেতু নোগুচি তাঁর পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন সেজন্য রবীন্দ্রনাথও তাঁর উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিলেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের নানা ঘটনায় আন্তর্জাতিক অবস্থা অবনতির দিকে যায়। ইউরোপে হিটলারের চাপে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে তার সুদেতেন অঞ্চলকে ভাগ করে দেওয়ার জন্য কুখ্যাত মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত হোল। এই সুযোগে জাপানী দ্রুত জয় লাভের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড আক্রমণে চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ আক্রমণের মুখে চীনাদের দ্রুত ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে থাকে। ২১শে অক্টোবর ক্যান্টনের পতন হয়। এই ঘটনায় কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও চীনের মর্মান্তিক বিপর্যয়ে কবির হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল।

এই সময়ে জাপান থেকে রাসবিহারী বসু ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে কবিকে আবার জাপান ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং কবিকে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা দেবেন বলে জানান। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি পেয়ে বিস্মিত হন। তিনি ২৪শে অক্টোবর তারিখে উত্তরে জানালেন, যদি কবিকে ইচ্ছামত পরিদর্শন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি বর্তমান স্বাস্থ্য নিয়েও যেতে রাজী আছেন। তিনি লিখেছিলেন, "জাপানকে আমি আন্তরিক ভালোবাসি। কাজেই এখন যদি সেখানে যাই তবে আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হবে যে, শাসকবর্গের আদেশে এমন এক অমানুষিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য জাপানীরা দলে দলে তাহাদের পার্শ্ববর্তী দেশে যাচ্ছে, যার জন্য মনুষ্যজাতির ইতিহাসে তাদের নাম চিরদিনের জন্য কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখবার বেদনা আমি সহ্য করতে পারব না।"

এই সময়ে নোগুচি রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবে আরেকখানা দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই চিঠিও তিনি পূর্বেই সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেন। ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় তাহা ছাপা হয়। এই চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমরা বর্তমানে চীনের বিপথগামী গভর্ণমেন্টের বিরোধিতা করিতে পারিব না কেন তাহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। জাপানের কেহই কদাপি চীন জয়ের স্বপ্ন দেখে নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি জাপান চীনে শুধু চিয়াং কাই-শেকের ভ্রম ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং এজন্য জাপান তাহার সর্বস্বপণ করিয়াছে।...জাপানের মনোভাব প্রকাশের কোন উপযুক্ত মুখপত্র নাই, কাজেই প্রকৃত তথ্য সর্বদাই অব্যক্ত থাকিয়া যায় এবং প্রায়ই চীনাদের প্রচার চাতুর্য বিকৃত রূপ প্রকাশ পায়।...কমিউনিজমের হাত হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? অসার আদর্শবাদের জন্য আমরা আমাদের স্বদেশকে বিকাইয়া দিতে চাহি না। ক্ষান্ত দিন—আপনি আর প্রলাপ বকিবেন না।"

নোগুচির এই চিঠি যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, ঐদিনই চীনের হ্যাঙ্কাউ নগরীর পতন হয়। নোগুচির চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত বোধ করলেন। নোগুচির মত কবি যে এত নগ্নভাবে জাপানের উগ্র আগ্রাসন নীতিকে সমর্থন করতে পারেন কবি তা ভাবতে পারেন নি। তবু তিনি ২৯শে অক্টোবর নোগুচির চিঠির উত্তরে আরেকটি দীর্ঘ খোলা চিঠি লেখেন। কবি লিখেছেন, "আমি এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি যে, আপনি এখনও আমাকে আপনার মত গ্রহণ করাইবার জন্য এরূপ

পরিশ্রম স্বীকার করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। আমি যথার্থই এই জন্য দুঃখিত যে, আপনি আমাকে যেরূপ বুঝাইতে চাহেন আমি সেরূপ বুঝিতে অক্ষম। আমার মনে হয় আমাদের পক্ষে অপরকে স্বমতে আনয়নের চেষ্টা বৃথা; কারণ এশিয়ার অন্যান্য জাতিকে ভয়ে অভিভূত করিয়া আপনার গভর্ণমেন্টের নীতির সমর্থক করিবার জন্য জাপানের অভ্রান্ত অধিকার বিষয়ে আপনার যে বিশ্বাস আছে আমার তাহা নাই। যে স্বদেশপ্রেম দেশের বেদীতে অন্যান্য জাতির অধিকার ও সুখ বলি দিবার দাবী করে তাহার প্রতি আমার অবিশ্বাসকে আপনি "আধ্যাত্মিক ভবঘুরের নীরবতা" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।

আপনি যদি চীনাদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারেন যে, আপনাদের সৈন্যবাহিনী যে তাহাদের শহরসমূহে বোমাবর্ষণ করিতেছে এবং আপনার ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের নারী ও শিশুদের মধ্যে যাহারা 'বিকৃতাঙ্গ' হয় নাই তাহাদিগকে গৃহহীন ভিক্ষুকে পরিণত করিতেছে এবং তাহাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত যে ব্যবহার করা হইতেছে তদ্দ্বারা পরিণামে তাহাদের জাতি 'রক্ষা' পাইবে; তাহা হইলে আর আপনাদের পক্ষে আপনাদের দেশের সাধু উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইবার আবশ্যক হইবে না। আপনাদের সৈন্যদের উপর অপবাদ দিবার জন্য যাহারা নিজেদের শহর ও শিল্পসম্পদ পোড়াইয়া ফেলিতেছে (হয়ত আপন নাগরিকের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে) সেই 'অনুন্নত জাতির' প্রতি আপনার ন্যায়সঙ্গত ঘৃণার দ্বারা আমার—নেপোলিয়ন কর্তৃক জনশূন্য মস্কোতে প্রবেশ করিয়া উহার জ্বলন্ত প্রাসাদসমূহ দর্শন সময়ে তাঁহার মহান ক্রোধের কথা স্মরণ হয়। আপনি কবি বলিয়া আপনার নিকট আমার এই আশা করা উচিত যে, কোন জাতি কিরূপ অমানুষিক নৈরাশ্যপীড়িত হইলে স্বেচ্ছায় আপনাদের প্রাচীন শিল্পসম্পদ পোড়াইয়া ফেলে তাহা অনুভব করিবার মত কল্পনাশক্তি আপনার আছে। একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবেও কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, যে রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপ এবং বোমাবিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত শহরসমূহ প্রত্যহ আপনাদের দুই দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে তাহা দ্বারা আপনাদের দুই জাতির পক্ষে স্থায়ী সদ্ভাব স্থাপনের জন্য হস্ত প্রসারিত করা সহজ হইতেছে?

আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, 'অসাধু' চীনাগণ যখন বিদ্বেষ প্রণোদিত প্রচারকার্য চালাইতেছে, তখন আপনার স্বজাতি 'সাধু' বলিয়া উহা করিতে অনিচ্ছুক। বন্ধু আপনি কি জানেন না যে, সৎকার্যের দ্বারা যেরূপ প্রচারকার্য হয় তদ্রূপ আর কিছু দ্বারা হয় না? যদি আপনাদের কার্য এইরূপ হয় তাহা হইলে আপনাদের চীনা কৌশলে ভয় পাওয়ার কারণ নাই। যদি আপনার দেশে দরিদ্রদিগকে শোষণ করা না হয় এবং শ্রমজীবীগণ মনে করেন যে, তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হইতেছে তাহা হইলে আপনার 'কমিউনিজমরূপ জুজু'কে ভয় করিবার কারণ নাই।

আপনি আমাকে আমাদের ভারতীয় দর্শনের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ায় এবং কালী ও শিবের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা চীনে জাপানের প্রলয় নৃত্য আমাদের অনুমোদন লাভ করিবে, ইহা জানাইয়া দেওয়ায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার মনে হয়,

আপনি আপনার নিকট অধিক পরিচিত এক ধর্ম হইতে একটি উপদেশ বাহির করিয়া আনিয়াছেন এবং আপনার যুক্তির সমর্থনে বুদ্ধের নিকট আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি যে, আপনাদের শিল্পী ও পুরোহিতগণ ইতিপূর্বেই উহা স্থির নিশ্চিত করিয়াছেন। কারণ আমি "ওসাকা মাইনিচি" এবং "টোকিও নিচি নিচি"-র (The Osaka Mainichi & The Tokyo Nichi Nichi) ১৯৩৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বুদ্ধের এক বিরাট মূর্তির ছবি দেখিয়াছি; উহা আপনাদের প্রতিবেশীদের হত্যা বুদ্ধের আশীর্বাদপূত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।

আমার কথাগুলি যদি কটু মনে হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন। নিশ্চিত জানিবেন যে, গভীর দুঃখ ও লজ্জাতেই এই পত্র লিখিতেছি—রাগ করিয়া নহে। চীনারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা বেদনাদায়ক ও মর্মভেদী সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মনঃকষ্টের উহাই একমাত্র কারণ নহে। জাপান মহত্ত্ব দেখাইতেছে, গর্বভরে এমন কোন দৃষ্টান্তের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াও আমি আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছি। অবশ্য একথা সত্য যে, অন্যত্র ইহার অপেক্ষা কোন উচ্চতর আদর্শ দেখা যাইতেছে না এবং পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যজাতিগুলিও কম বর্বরতার পরিচয় দিতেছে না। এমন কি তাহারা হয়ত আরও কম বিশ্বাসভাজন। কাজেই আপনি যদি তাহাদের সঙ্গে আপনার জাতির তুলনা করিতে চান, তবে আমার বলিবার কিছু নাই। তাহাদের সম্মুখে আপনাদের উচ্চতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিলেই আমি সুখী হইতাম। আমার নিজের জাতির কথা আমি বলিতে চাহি না, কেননা শেষ পর্যন্ত নিজের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে সমর্থ হইলে, তবেই বড়াই করা সাজে, তাহার পূর্বে নহে।

যুদ্ধরত জাতিদ্বয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কার্য করিতে বলিয়া আপনি আমাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। যদি আপনাদের জাতি দুইটিকে মিলিত করিয়া তাহাদিগকে এই মারাত্মক সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে এবং 'এশিয়ায় নতুন পৃথিবী সৃষ্টি'র ব্রতে নিয়োজিত করিতে পারিতাম, তবে সে উদ্দেশ্যে আমার জীবনপাতও আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু আপনি তো জানেন, যে নৈতিক প্রভাব বিস্তারকে আপনি এতে বিশদভাবে শ্লেষ করিয়াছেন তাহা ছাড়া আমার অন্য কোন শক্তিই নাই। আপনি আমাকে নিরপেক্ষভাবে কার্য করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু আক্রমণকারীরা যদি প্রথমে আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে আপনি কি করিয়া বলেন যে, আমি চিয়াং কাই-শেককে আত্মরক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতে পারি? আপনি শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য বোধ করিবেন যে, গত সপ্তাহে আমি আমার এক জাপানস্থিত বন্ধুর নিকট হইতে আপনাদের দেশে যাইবার আমন্ত্রণ পাইয়া নির্বোধ আদর্শবাদীর মত ক্ষণেকের তরে মনে করিয়াছিলাম যে, এশিয়ার রক্তাক্ত মর্মস্থানে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাইবার জন্য এবং তাহার ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে হিংসার গুলি বাহির করিবার জন্য হয়ত বা সত্য সত্যই আমি আপনার জাতির সেবায় লাগিতে পারি। উক্ত বন্ধুকে আমি যে উত্তর দিয়াছি তাহা এই :

'আমার বর্তমান স্বাস্থ্য দীর্ঘ বিদেশযাত্রার পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। তথাপি এশিয়ার যে দুইটি মহান জাতি বর্তমানে পরস্পরের সহিত আত্মঘাতী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাবের সম্পর্ক এবং জাতীয় বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে যদি আমার ইচ্ছামত প্রচার করিতে দেওয়া হয়, তবে আমি আপনার প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ— যাঁহারা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চীনকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়—আমাকে নিজ অভিপ্রায়মত কার্য করিতে দিবেন কিনা সন্দেহ। বর্তমানে সৌজন্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাপান ভ্রমণে যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। তাহাতে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে; আর যে-কোন কারণেই হউক, এই জাপান ভ্রমণের লোভ যদি আমি সম্বরণ করিতে না পারি, তবে কোনদিনই আমি নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না। আপনি জানেন, জাপানকে আমি আন্তরিক ভালবাসি। কাজেই এখন যদি আমি জাপানে যাই, তবে আমাকে স্বচক্ষে দেখিতে হইবে যে, শাসকবর্গের আদেশে এমন এক অমানুষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য জাপানীরা দলে দলে তাহাদের পার্শ্ববর্তী দেশে যাইতেছে, যাহার জন্য মনুষ্যজাতির ইতিহাসে তাহাদের নাম চিরদিনের জন্য কলঙ্ক-কালিমলিপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিবার বেদনা আমি সহ্য করিতে পারিব না।'

চিঠিখানি ডাকে পাঠাইবার পর, ক্যান্টন ও হ্যাঙ্কাও শহরদ্বয়ের পতন সংবাদ আসিয়াছে। প্রত্যাঘাত করিতে অক্ষম যে পঙ্গু, শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণে ভূপতিত হওয়া তাহার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নহে কিন্তু তাহার অঙ্গচ্ছেদের কথা ভুলিয়া যাইতে বলা, আপনি যতটা সহজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, আমি তাহা পারিতেছি না। যিনি সে কথা বলিতে পারেন আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই মনে করি।

আপনার জাতিকে আমি ভালবাসি; কাজেই আমি তাহার সাফল্য কামনা করিতে পারি না। প্রার্থনা করি তাহার মনে যেন অনুতাপ আসে।

—ভবদীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

নোগুচিকে রবীন্দ্রনাথের দুইটি পত্রই শুধু রবীন্দ্র সাহিত্যের নয়, মানবিকতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল। এই পত্র প্রকাশের পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একযোগে নোগুচির পত্রের সমালোচনা ও নিন্দা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে চীন থেকে মিঃ ওজবেক (Mr. K. L. Ozbek, Member Chinese League of Nations Union) এবং মিঃ আইসা (Mr. Y. Aisa, Member, Legislative Yunan of the Republic, China) এক সদিচ্ছা মিশনে ভারত সফরে আসেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা করতে আসেন। সংবাদপত্রের পাতায় সেই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "In an interview granted to Messers. Ozbek and Aisa the Poet recalled his visit to China and the warm reception that the people of that far Eastern country had given him. He also referred to the struggle that

the Chinese were now carrying on against Japan. China, added Dr. Tagore, was admired all the world over for her culture and civilisation, and he wished success to the people of China in their fight to preserve freedom. He expressed the desire of visiting China once again after the conclusion of the war." (Hindusthan Standard–6th December, 1938).

ইতিমধ্যে নোগুচি ২৮শে নভেম্বর বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলির উদ্দেশ্যে আর একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তাঁর নতুন কোন বক্তব্য নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা নির্লজ্জ প্রয়াস আছে। ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ আনন্দবাজার, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় এই চিঠি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি দেখেছিলেন কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। (দ্রঃ ভারতে জাতীয়তা ইত্যাদি (৫) পৃ. ১৫৭)

এর পরেও নোগুচি আরেকখানি পত্র লেখেন। এই পত্রটি ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ক্ষোভের কথাই প্রকাশ করেছেন। তখন নোগুচির চিঠিকে আর কেউ গুরুত্ব দিত না। রবীন্দ্রনাথও এ চিঠি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

নোগুচির পত্র প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পর জাপানের বিখ্যাত গ্রন্থকার ওয়াওটোকা আওয়াসা জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে এক প্রেস বিবৃতি দেন। জাপানের সব বুদ্ধিজীবীই নোগুচি নন এটা দেখে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন। সেজন্য জানা যায় তাঁরই নির্দেশে এটা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। আওয়াসা তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "জাপানের চীন আক্রমণের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য চীনকে পদানত করা। জাপানীরা অসহায় নগর-নগরীতে বোমা নিক্ষেপ করে। তাহারা নির্মমভাবে চীনের অধিবাসীদিগকে হত্যা করে। চীনের যে গ্রামেই জাপানীরা যায় তাহারা সেই গ্রামই লুণ্ঠন করে।"—রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই জাপানের এই প্রতিবাদী কণ্ঠের জন্য আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হলেন।

পরবর্তীকালে

অধ্যাপক তান ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র প্রমুখের চীনের প্রতি শুভেচ্ছাবাণী নিয়ে চীন গিয়েছিলেন। তিনি ২৭শে জুলাই, ১৯৩৯ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। তাঁর মারফৎ চীন থেকে কয়েকজন কবির কাছে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। চীনের জাতীয় সরকারের কার্যনির্বাহক সভার সভাপতি এবং তদানীন্তন অর্থসচিব ডাঃ এইচ কুং এক পত্রে কবিকে লিখেছেন, "শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে আপনার সুমহান বাণী এবং চীনের জনগণের প্রতি আপনার অমূল্য শুভেচ্ছা আমাদিগকে অশেষ সাহস ও প্রেরণা দিয়াছে।

"ভারতবর্ষের জনসাধারণের মত চীনের অধিবাসীগণেরও শান্তি ও সাম্যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। তাহা হইতেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, কতদূর অসহ্য হইয়া আজ তাহারা জঙ্গী জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছে।

"জগতের মধ্যে আর কোনও দুটি দেশ ভারতবর্ষ ও চীনের মত ঘনিষ্ঠ নহে। অতীতের মত আজও ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের এই বিপন্নকালে আপনার বন্ধুত্বের মর্যাদা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। প্রাচ্যের সংস্কৃতির উন্নতিবিধান করিবার জন্য আমরা আপনার সহিত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিব, প্রতিশ্রুতি দিতেছি।"

(আনন্দবাজার, ৮ই আগস্ট, ১৯৩৯)

চীনের জাতীয় সরকারের শিক্ষাসচিব মিঃ চেনলি-ফুও এবং পরিষদের সহ-সভাপতি মিঃ ইয়েন চু-স্যাঙও অধ্যাপক তানের মাধ্যমে দু'খানি পত্র কবিকে পাঠিয়েছেন। মিঃ চেন লিখেছিলেন, "আপনার সহৃদয় বাণী সমগ্র চীন জাতির প্রাণে যে গভীর প্রেরণা দান করিয়াছে তাহা আপনাকে জানাইতে চাই।" বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে লিখেছেন, "অতীব দুঃখের কথা, জাপানের আক্রমণের ফলে আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহাতে এই মুহূর্তে চীন ভবনের জন্য আমরা বিশেষ কোন কার্যকরী সাহায্য করিতে অক্ষম। কিন্তু আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদের নৈতিক সমর্থন আপনি যে পাইবেন তাহা সুনিশ্চিত।

ইতিমধ্যে 'লীগ অব নেশনস ইউনিয়ন' এর চীনা শাখা কমিটি, চীন ভারত মৈত্রী সমিতি প্রমুখ চীনের বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জওহরলালকে চীন ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে খুবই খুশি হলেন। জওহরলালের চীন যাত্রার প্রাক্কালে কবি ১৭ই আগস্ট, ১৯৩৯ জওহরলালকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এক পত্র দেন। এই পত্রে তিনি লিখেছেন, "চীনের প্রতি সৌহার্দ্যজ্ঞাপনের কর্তব্যভার লইয়া আপনি তথায় যাইতেছেন। ইহাতে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আছে। আপনি যে, এশিয়ার নূতন ভাবধারার বাহক হইয়া চীনে যাইতেছেন এবং সেখানে অবস্থানকালে আপনি আমাদের চিরাচরিত মনুষ্যত্বের পরিচয় চীনবাসীদিগকে জানাইতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া আমি গৌরব বোধ করিতেছি। আমি নিজে সুদূর প্রাচ্যে ভ্রমণ করিয়া অনুভব করিয়াছি যে, প্রাচ্য জাতিগুলির মধ্যে সংস্কৃতিগত ভাবের আদান প্রদান মোটামুটি অক্ষুণ্ণভাবেই চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জাতিগুলি ইউরোপের ক্ষুধিত জাতীয়তার নামে পরস্পরের সহিত যেভাবে সংগ্রাম করিতেছে, আমরা কখনও সেরূপ করি নাই। আমার মতে, জাপান যে আক্রমণমূলক নীতি অনুসরণ করিতেছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে ধার করা এবং সেইজন্য তাহা জাপানীদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। চীন এবং ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানের সভ্যতারও ভিত্তি এক। জাপানকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে যে, এই ভিত্তি যেন সে ধ্বংস না করে। জাপানি সমরবিদেরা যে পথে চলিতেছেন, তাহার ফলে চীন অপেক্ষা তাহার নিজের মনুষ্যত্বেরই ক্ষতি হইবে অধিক।" (আনন্দবাজার ২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯)

সেজন্য তিনি জওহরলালকে জাপানও ঘুরে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এবং "আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার নামে জাপান এশিয়ার নৈতিক বিবেককে" যে বলি দিতে উদ্যত হয়েছে তার থেকে জাপানকে বিরত হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে বলেছেন।

জওহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের উত্তরে জানিয়েছিলেন, চীন ভ্রমণের পরে তাঁর পক্ষে জাপান ঘুরে আসা বাস্তবসম্মত হবে না। তিনি বরং কবির কথামত শ্যাম জাভা বালী প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের দেশ ঘুরে আসবেন। তারপর চীন যাওয়ার পথে ২০শে আগস্ট জওহরলাল কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এর বিশ্বভারতীর সংবাদ থেকে জানা যায় জওহরলাল তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে যা লিখেছেন ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সেই সব কথাই বলেন। জাপান ও দূর প্রাচ্য দেশগুলি ঘুরে আসার কথা এবং জাপানের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তারের কথা কবি বলেন।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দু'দিন পরেই ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্রান্সও ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই এতে অত্যন্ত বিচলিত ক্ষুব্ধ এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর মংপু থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে এক খোলা চিঠিতে তার মানসিক অবস্থা এবং মনোভাবের কথা জানিয়ে লিখেছেন, "এ যেন বিশ্বজুড়ে একটা দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে মানুষের ভদ্রনীতির মূল কাঠামোটা দেখতে দেখতে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রকমে ভেঙে বেঁকে যাচ্ছে। আর কিছুকাল আগে এই চেহারার বীভৎস ব্যঙ্গ বিকৃতি ভাবতেই পারতুম না।" এই চিঠির মধ্যে স্পর্ধিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এবিসীনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, স্পেন এবং মুনিক চুক্তির কুৎসিৎ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চীন সম্পর্কেই কবির বেদনা বেশি। তিনি লিখেছেন, "দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বার বার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। ... এই যুদ্ধে ইংলন্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্কপ্রলেপ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, আর সহায়শূন্য চীন লড়ছে প্রায় শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীক বীর্যে ভর করে।"

এই যুদ্ধের পৈশাচিকতা এবং ভয়াবহতা যত নির্মমই হোক কবি বিশ্বাস করতেন এটাই ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না। মানবিকতার জয় হবেই। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন :

"স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে, — বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নির্লাজ
তখন গর্জিয়া নামে রুদ্র, তব বাজ।" (প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের উপর তিনি কখনো বিশ্বাস হারান নি।

১৯৩৯ সালের শেষদিকে চীনের বিখ্যাত শিল্পী শু পেইহুঙ (Xu Beihong) রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। ২১শে ডিসেম্বর 'কলাভবনে' শিল্পী সম্বর্ধনা সভায় কবি চীনের মহান সংস্কৃতির উল্লেখ করে বলেছেন, "We welcome you as a messenger of China's great culture; you have brought to us in India the gift of spiritual sympathy which, centuries ago, united our ancient humanities. China and India shared the dawn of a great Renaissance, and even in these days of political cataclysm the memoried light of that comradeship remains.

"True rebirth of a civilisation comes not from a deadly pursuit of power, which alienates and destroys, but from expression of its inner heart; such an expression, generous and ever renewing brings neighbours together in the great adventure of mankind."

"Here in Santiniketan we have striven to maintain that inner spirit of understanding, that integrity of work guided by ideals and linked with service of man, which, we believe Asia has to offer to civilisation. You have come to us with the vision of art, with the sensitive appeal of truth which must trimuph over rude shocks of circumstance; your visit will strengthen us and bring out effort nearer to fulfilment. With great joy I look forward to an era of warm kinship between our neighbouring lands and to the assertion of historical forces in the East that will save us all from the encraoching darkness." (V. B. News–Feb., 1940

চীনের এই বিখ্যাত শিল্পীকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর যুদ্ধের ব্যাপারে যে মানসিক অবসাদ এসেছিল তার থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্ত হয়ে উঠেছেন। মংপুতে থাকবার সময় দেশের সমস্যা, তার উপর দিনের পর দিন চীনের

বিপর্যয়ের সংবাদে কবির মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। একদিন তিনি বলেছিলেন, "চীনদেশের কাহিনী আর শুনতে পারি নে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিয়োর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারি নে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠল। ... বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ... এ নৃশংসতা আর কত দেখব।" (র. চী-৪) শিল্পীকে অভ্যর্থনা জানাবার সময়ও কবির মনে শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ ছিল।

সেদিন শু পেইহুঙ তাঁর প্রতিভাষণে বললেন, "My visit here is that of a pilgrim. I have come not to give but to receive the great gifts that India may bestow upon my country and people as she did in the days gone by." চীন ভারত সাংস্কৃতিক সমিতির প্রচেষ্টার ফলেই শু পেইহুঙ বিশ্বভারতীতে আসতে পেরেছিলেন।

সম্প্রতি চীন থেকে প্রকাশিত শু পেইহুঙের ছবির এ্যালবাম থেকে জানা যায় তিনি ভারতে থাকার সময়ে যুদ্ধেলিপ্ত তার দেশের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সে সময় তিনি তার বিখ্যাত বিরাট ঐতিহ্যবাহী চিত্র 'বোকা বৃদ্ধ যে পাহাড় সরিয়েছিল' এখানে বসে এঁকেছিলেন। এ ছবির মধ্যে চীন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেই এই বিশ্বাসই ফুটে উঠেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথেরও একটি ছবি এঁকেছিলেন।

ডিসেম্বরের শেষদিকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কবির সঙ্গে দেখা করে চীন গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ক্রিপসের মাধ্যমে চীনের মহান জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর শুভেচ্ছা ও দৃঢ় বিশ্বাস জানিয়ে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের কাছে এক পত্র পাঠান। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "China is great. Everyday you are proving it at the cost of an incredible suffering and sacrifice. The heroism your people are displaying is epic in reality. I feel sure whatever may happen your victory will ever remain resplendent in the moral field of human endeavour."

১৯৪০ এর জানুয়ারীর মাঝামাঝি বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত তাই-সুর (Tai Hsu) নেতৃত্বে একটি বৌদ্ধ শুভেচ্ছা মিশন ভারতে আসেন। শান্তিনিকেতনে কবি নিজে তাঁদের সম্বর্ধনা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "You have come as an ambassador of love from your country to ours. As I welcome you I recall the vision of pilgrims coming from your country, through dangerous and difficulties in order to interchange with their Indian brethren the highest gifts of man. We offer to you and through you to your country the gift of our love." বৌদ্ধ আচার্য প্রত্যভিভাষণে বলেন, "প্রভু বুদ্ধ ভারতীয় জীবনে এক নূতন ভাব বন্যা আনিয়াছিলেন। বর্তমান ভারতে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার মূর্ত প্রতীক।" (র. চী.)

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ এবং কবির জন্মোৎসব একই সঙ্গে পালিত হত। ১৯৪০ সালে এই উৎসব হয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে। নাৎসীদের বিপুল আক্রমণে ডেনমার্কের পতন হয়, নরওয়ে অধিকারের জন্যও প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। সেই উৎসবে কবি তাঁর ভাষণে বিশ্বের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, "আজকার দিনে পৃথিবীতে বড় কঠিন সময়, বড় দুঃখের দিন এসেছে। বুদ্ধ জরা, প্রাচীন লোভ, ভয়ঙ্কর রিপু বিনাশের দূত দানবের মূর্তি নিয়ে আজ দেখা দিয়েছে, দুর্গতির অন্ত নেই। তাকেই আজ পৃথিবীর উচ্চ আসনে বসিয়ে মানুষ ঘোষণা করেছে দৈত্যের শাসনকে মানতে হবে। আজ এই মিথ্যাকে প্রচণ্ড গর্জনে ঘোষণা করা হচ্ছে, আজ ইতিহাসে যুদ্ধ সংঘর্ষের মধ্যে সেই আত্মার বিনাশের আয়োজনকেই দেখি। কিন্তু এই জরার লক্ষণ মানুষের জীবনে মরীচিকার মতো আসে সত্যকে নূতন করে উপলব্ধি করার জন্য। ভরসা রাখতে হবে যে, এই দুঃস্বপ্ন থেকে মানুষ আবার জাগবে। এই মিথ্যার আবির্ভাব তার উৎপীড়ন অত্যাচার আপাততঃ নিদারুণ হলেও তার ধ্বংসলীলার অবসান হবে। এই বিনাশের রূপ সত্য নয়।" (আনন্দবাজার ১৫ এপ্রিল, ১৯৪০)

এই জন্মোৎসব উপলক্ষে মার্শাল চিয়াং কাইশেক একটি শুভেচ্ছাবাণীতে লিখেছিলেন, "As the smaller ranges look up to the snowy heights of the sacred peak and as all the rivers tend towards the vast deep, even like that does not the whole world look up to you, respected Gurudeva Tagore, and tend towards you.

"... May you hold up a beacon-light to this benighted and suffering world for ever and ever."

এ ছাড়াও চীনের শিক্ষামন্ত্রী চেন লি-ফু (Chen Li-Fu) এই উপলক্ষে স্বরচিত কবিতায় কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন (ভারতে আত্মীয়তা)

সেপ্টেম্বর (১৯৪০) মাসের শেষদিকে কবি কালিম্পঙে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটু সুস্থ হলে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। কবির এই অসুস্থতার সংবাদে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করে তারবার্তা পাঠান। তাদের মধ্যে মাদাম চিয়াং কাইশেক এবং চীনের কয়েকজন জেনারেলের তারবার্তাও ছিল। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। লণ্ডনের উপর নাৎসী বাহিনী প্রবল বোমাবর্ষণ করছিল। অন্যদিকে চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপ আক্রমণ তীব্রতর হয়। জার্মানি ইতালী ও জাপান এই তিন ফ্যাসিস্ট শক্তির মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চীনের শেচুয়েন (Szechuen) এলাকায় জাপান প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়, ইন্দোচীন কার্যত দখল করে নেয়।

লণ্ডন ও চীনের জনবহুল শহর ও নগর বন্দর এলাকায় বোমাবর্ষণ করে যে নারকীয় হত্যালীলা চলছিল তার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে ১৫ই অক্টোবর প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এই দিবস পালনের জন্য International Peace Campaign এর চীনা শাখার পক্ষ

থেকে জওহরলালের নিকট এক পত্র দেওয়া হয়। জওহরলাল এই আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এক বিবৃতি দেন।

রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যায় পড়ে থাকলেও তিনি সম্ভব হলে দেশের ও বিশ্বের পরিস্থিতির খবর রাখতেন। তখন যুদ্ধ পরিস্থিতি কবির মনের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেজন্য একটু সুস্থ বোধ করেই তিনি ১১ই অক্টোবর এ সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন। ১২ই অক্টোবর প্রায় সব বাংলা ইংরাজি সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে কবি বলেন ঃ

'আমি এখন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। চিকিৎসকগণ আমাকে চিন্তা করিতে কিংবা কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তথাপি আমি কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। চিকিৎসকগণ জানেন না, শারীরিক যন্ত্রণার সহিত আর এক যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে। এ যন্ত্রণা তাঁহারা দমন করিতে অসমর্থ। পাশ্চাত্যের লোকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সভ্যতা ও মনুষ্যমর্যাদা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মূল্য আজ তাহারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাহাদের এই ব্যর্থতা আমার মনে দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আছে। আমি পরিষ্কার বুঝিতেছি, এ ব্যর্থতার কারণ হইতেছে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনায় নৈতিক আদর্শকে অস্বীকার এবং লোকের এই বিশ্বাস যে, সমস্ত জিনিসই নির্ধারিত হয় বাহ্যিক ঘটনা পরম্পরা দ্বারা, যাহা মানুষ বুদ্ধি বা শক্তি প্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই বিশ্বাসের পরিণাম মনুষ্যের পক্ষে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। এই বীভৎস বিশ্বাসের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় মাঞ্চুরিয়ায়। উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, চীনের দরিদ্র ও নিরপরাধ জনসাধারণ যদিও কষ্টভোগ করিয়াছে, তথাপি যাহারা এই কষ্টের জন্য ও অন্যত্র অনুরূপ কষ্টের জন্য দায়ী, তাহারা সকলেও এই আবর্তের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। নীতি লঙ্ঘনের উপর যাহারা তাহাদের শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারাই উহার কবলে পড়িয়াছে। অদৃষ্টের প্রতিশোধ প্রত্যহ উত্তরোত্তর নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে। আমরা চেঙ্গিস খাঁর বাহিনীকে বর্বর বলিয়া থাকি, কিন্তু আজ তথাকথিত সভ্য জাতিরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে মনুষ্যজাতির প্রতি যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, ভয়ঙ্কর মোঙ্গলরাও সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হয় নাই। ... চীনের যে সাহসী ও নিরপরাধ জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টভোগ করিয়াছে, অথচ সে-কষ্ট যাহাদের প্রাপ্য নহে, তাহাদের প্রতি আমাদের হৃদয় গভীরতম সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে হিংসা তাহারা কখনও অন্য কাহারও বিরুদ্ধে প্রদর্শন করে নাই, সেই হিংসার কবলে তাহারা পড়িয়াছে; যে ধ্বংসের গহ্বর তাঁহারা নিজেরা খনন করেন নাই, সেই গহ্বরে তাহাদিগকে টানিয়া নামান হইয়াছে। আমি আশা করি, তাহারা এই অন্যায়কে অতিক্রম করিবে এবং আবার এক মহৎ সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারিবে। মানুষ নৈতিক মূল্যের যে উত্তরাধিকার হারাইয়াছে, হিংসা ও ধ্বংসের এই উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যেও তাহার পুনরুজ্জীবনে আমার বিশ্বাস আমি আঁকড়াইয়া থাকিব। মানুষ মহৎ। আমরা যাহারা মানুষের মহত্ত্বকে সমর্থন করি, তাহার জয়-ক্ষতি ও পরাজয়ের অংশী হইব বটে, কিন্তু

মনুষ্যজাতির মহৎ দারিদ্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক আমাদের কখনও বহিতে হইবে না। আমি জানি যে, এই উন্মাদ পৃথিবীর সর্বত্র এমন কিছু কিছু লোকও আছেন, যাঁহারা আমার সমবিশ্বাসী।"

কবির এই বিবৃতি আমাদের দেশের সংবাদপত্র ত বটেই বিলাতে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান প্রভৃতি পত্রিকায়ও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কঠিন রোগভোগের মধ্যেও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতের উপর এমন অগাধ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

এই বিবৃতি দেওয়ার পরে কবি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্বয়ং অনুসন্ধান করবার জন্য মার্শাল চিয়াং কাইশেক চীনের তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা তাই চি-তাও এর নেতৃত্বে ভারতে একটা 'শুভেচ্ছা মিশন' পাঠান। তাঁরা ১১ই নভেম্বর, ১৯৪০ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং চিয়াংকাইশেকের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র দেন। এই পত্রে চিয়াং লিখেছিলেন, "নৃশংস আক্রমণ এখনও প্রতিহত হয় নাই। জগতে প্রত্যহ বিপুল পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। প্রাচ্য সভ্যতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার ও আমার দেশবাসীর উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উক্ত সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়া আপনি আমার সন্দেহের নিরসন করিবেন বলিয়া আশা করি। আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা ও আপনার সত্বর আরোগ্যের জন্য আন্তরিক কামনা জানিবেন।" (আনন্দবাজার ১২ নভেম্বর, ১৯৪০)

এর পরেই অসুস্থ অবস্থায় কবিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হয়। চীনের শুভেচ্ছা মিশনের দলটি ভারতের নানা স্থান ঘুরে ৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আসেন। আম্রকুঞ্জে অতিথিদের যথারীতি অভ্যর্থনা জানানো হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন বলে অভ্যর্থনা সভায় যেতে পারেন নি। পরে অতিথিরা কবির শয়ন কক্ষে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। কথাপ্রসঙ্গে তাই চি-তাও বলেন, "আমি বাহির হইতে অতিথির ন্যায় এখানে আসি নাই, অন্তরের বলে আমি এই দেশেরও অধিবাসী ...যে সময়ে চীন ও ভারত আপনাদের যথার্থ সত্তাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল, সেই মুহূর্তে চীনদেশে আপনার আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ। ১৯২৪ সালে আপনি যে কেবল ভারতবর্ষের বাণীই চীনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নয়, আপনি আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার মায়াপাশ ছেদন করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি; সেই সময় হইতেই আমাদের সংস্কৃতির নবযুগের সূচনা।" (র. চী.)

তাই চি-তাও সম্বর্ধনার উত্তরে প্রায় একই কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও আলোচনার সময় বলেছিলেন, "আমরা সেইদিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন আপন বীর্যের বলে সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চীন স্বাধীনতার পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে; আপনাদের সেই প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষকে তাহার পথ দেখাইয়া দিবে।" চীনের পুনর্গঠনকে প্রত্যক্ষ করবার

জন্য রবীন্দ্রনাথ আবার চীনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তার উত্তরে তাও বলেন, "চীনের বর্তমান দুর্দিন অতিক্রান্ত হইলে চীন সরকার ও সমগ্র চীন দেশের প্রতিনিধিরূপে আমি বিমানযোগে আপনাকে চীনে লইয়া যাইব, আমার এই আশা যেন পূর্ণ হয়।" রবীন্দ্রনাথও বললেন তিনি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় থাকবেন।

এর থেকে চীন সম্পর্কে এবং চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবির উচ্চ আশা পোষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মিঃ তাই-র হাতে মার্শাল চিয়াঙের পত্রের উত্তরও দিয়েছিলেন। এই উত্তরের মধ্যে চিয়াঙের ইচ্ছা অনুযায়ী ভারত ও চীনের ভবিষ্যৎ মৈত্রী সম্পর্কেও একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। ২২ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কবি লিখেছিলেন ঃ

"You have asked me what path we could take to bring the great civilizations of China and India together on a permanent basis. Apart from the valuable personal contacts we are achieving through exchange of scholars and the fruitful co-operation that is being maintained through our institutions and culture-centres, I believe that China has a special mission to fulfil in our age. It is by harmonising the rational methods of science and scientific organisation with the great tradition of Eastern wisdom and humanity that China can offer leadership to Asia and to the whole world.

"Europe is fast sacrificing its culture and humanity for the sake of ruthless efficiency which kills the human spirit with mechanised brutality, and most unfortunately some imperialistic nations in Asia too are following that suicidal path in the name of 'progress'... China today is the great exception; she is setting a glorious example both to the West and to the East by proving how modern efficiency can be harnessed to the majesty of an undying civilisation. Through further application of this genius for achieving harmony between science and the human spirit, China will help India in her work of national reconstruction. Your country can show us in different fields of national planning, in industrial development, in agricultural progress and in the new building-up of civic existence in your great land how we can escape the danger of fatal cleavage between science and humanity that has proved the doom of the Western as well as the Eastern nations of our day."

এই চিঠির মধ্যে চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবির একটি দৃঢ় আস্থা এবং ভারত ও চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্য জ্ঞান ও মানবিকতার সমন্বয় সাধনের কথা আছে। এবারের পৌষ উৎসবে কবি অসুস্থ ছিলেন বলে যোগ দিতে পারেন নি, তাঁর মৌখিক ভাষণ অমিয় চক্রবর্তী লিখে নেন। এই ভাষণেও কবি প্রায় একই কথা বলেছেন ঃ

"য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই বাহিরে সার্থকতা অন্বেষণ করেছে এবং লোভকে কর্ণধার ক'রে দেশে দেশে বিশেষভাবে এশিয়ায় ও আফ্রিকায়, দস্যুবৃত্তি-দ্বারা ধনসঞ্চয় করেছে। যে বিজ্ঞান যথার্থ আত্মসাধনার সহায় তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ থেকে ভ্রষ্ট ক'রে জগতে মহামারী বিস্তার করেছে। এই দুর্গতির অন্ত কোথায় আমি জানি নে। অপরপক্ষে কোনো কোনো জাতি অপেক্ষাকৃত সহজে তাদের স্বভাবকে অনুসরণ ক'রে বহির্জগতের চিত্তবিক্ষেপ থেকে শান্তিলাভ করে এসেছে। তারা বিবাদ ক'রে, লড়াই ক'রে মানুষের গৌরব সপ্রমাণ করতে চায়নি। বরঞ্চ লড়াই করাকে তারা বর্বরতা বলে জ্ঞান করেছে। চীন, তার প্রধান দৃষ্টান্ত। বহু শতাব্দী ধ'রে আপনাদের সাহিত্য অতুলনীয় শিল্প ও অতিগভীর তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে মনকে সম্পদশালী করে রাখতে পেরেছে। মানুষের চরম সত্য যে তার অন্তরে সঞ্চিত, এই কথাটি যতই তারা জীবনের ব্যবহারে সপ্রমাণ করেছে, ততই তারা মহতী প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। আজ লোভের সঙ্গে বিজ্ঞানবাহন রিপুর সঙ্গে, তার শোচনীয় বিরোধ ঘটল।

"আমাদের বিশ্বাস, এক দিন যখন এই বিরোধের অবসান হবে তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে পুনরায় পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু যারা লোভকে শ্রেয় করেছে তারা জয়লাভ করলেও আত্মপরাভবের বিপত্তি থেকে কোনো দিন রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ করি। এই লোভের শেষ পরিণাম মহতী বিনষ্টি। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের অর্জিত সম্পদের প্রতি লুব্ধ হস্তক্ষেপ—এই অভ্যাস অনার্য অভ্যাস এবং এই অভ্যাস মাদকতার মতো শরীর মনকে অভিভূত করে রাখে। তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা পরম আঘাতেও অসাধ্য। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর শিক্ষা দেশকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককেই মনের ভিতর ধ্যান করতে হবে।"...

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পরস্পর প্রীতির মিলন, ব্যবহারে কল্যাণ ও শান্তিকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করাই মানবের ধর্ম। এটাই ভারত এবং চীনের ঐতিহ্য ও শিক্ষা। এই পৌষ উৎসবের মধ্যেই পড়ে খ্রিস্ট জন্মদিন। সেদিন কবি 'প্রচ্ছন্ন পশু' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যেও যুদ্ধরত হিংসায় উন্মত্ত প্রচ্ছন্ন পশুদের প্রতি শান্তি কামনা করেছেন ঃ

"সংগ্রাম মদিরা পানে আপনা বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো নরক দূত মনুষ্যত্বহারা।
সন্ধানে নিষ্ঠুর যারা উদ্যত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ বলে গণ্য হয়ে আছে,
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার

হায় রে নির্লজ্জ তারা হায় রে মানুষ।
ইতিহাস বিধাতারে ডেকে ডেকে বলি
প্রচ্ছন্ন পশুর শাস্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিরে স্তব্ধ ভস্মস্তূপে।"

কোন দেশের নাম না করেও যুদ্ধের সম্পর্কে কবির যে মনোভাব তা প্রকাশ পেয়েছে নবজাতক, আরোগ্য, শেষ লেখার কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায়। এমন কি 'গল্পসল্প'র গল্পের মধ্যেও আছে যুদ্ধের কথা, চীনের কথা। 'ধ্বংস' গল্পে ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধের কথা আছে। পঁচিশ মাইল তফাত থেকে লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে ক্যামিলের সখের ফুল বাগান আর তাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেল। এই ধ্বংসের কথা বলতেই শেষ পরিচ্ছেদে এসে গেল চীনের কথা। সেখানে আর গল্প নয়, নির্মম অভিজ্ঞতা।

"সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীন দেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহুকালের জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন তপস্যা আর কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবারই কথা, কেননা মার-জখমের কারখানাতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের হাতের ধন, সভ্যতার অল্পকালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিঁড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।"

এরপরে যে কবিতাটি আছে তাতেও পশ্চিমের সভ্যতার দাঁত খিঁচানোর কথা আছে। "তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।" মানুষ লেগেছে তখন মানুষের ধ্বংসে।

'আরও সত্য' গল্পের কবি বলেছেন, চীনকে ঘিরে রূপকথার গল্প। সেখানকার ইয়াং চিকিয়াং নদী, ফুচুং, হ্যাংচাও, চুংকুং কত শহরের কথা, তার চেয়েও বেশি চীনদেশের অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যার কথা। বাংলাদেশের রাজপুত্তুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। এর মধ্যে চীন সম্পর্কে কবির যে একটা দুর্বলতা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশেষে এল কবির জীবিতকালের শেষ জন্মোৎসবের দিন ১৩৪৮-এর নববর্ষ। কবির অশীতি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশ বিদেশ থেকে অনেকেই শুভেচ্ছাজ্ঞাপক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। চীন থেকে মার্শাল চিয়াং কাইশেক, তাই-চি-তাও, ডঃ চেন্ লি-ফু, ডঃ এইচ, এইচ কুঙ প্রমুখ চীনা বন্ধুরাও তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। মার্শাল চিয়াং তাঁর তারবার্তায় লেখেন, "Congratulations for your birthday. At this time while entire eastern hemisphere is shaken by canons and bombs the people of the world feel evermore the greatness of your voice of love, peace, freedom and righteousness. China has been struggling in defence of the civilisation of East Asia and for that I wish all the more to

congratulate you for the longevity of your life the heroic voice of which shall keep sounding like a bell to all over the world the spiritual significance of eastern civilisation."

কবি এই শুভেচ্ছার উত্তর দেন ৯ই মে, ১৯৪১। তিনি এই অভিনন্দনের জন্য মার্শাল চিয়াং এবং চীনের জনগণকে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে লিখেছেন, "The celebration of my birthday at Santiniketan is held on Bengal's New year's Day which fell on April 14th. Hence it is also a time for a review of the past and a forward looking hope for the future. The brave and patient people of China and their fortitude in suffering are constantly in my thoughts and I am happy in the opportunity to send them not only my thanks but also a New Year's greeting also. May their achievements in the coming year be great in all that makes for noble nationhood, and may the labours of their devoted leaders bear right fruit. May the innocent multitudes be spared from dire calamity to build their lives in peace. With this prayer I renew my thanks to you for your gracious message."

কবি তখনো রোগশয্যায়। রোগক্লান্ত কবির চীনের প্রতি এটিই সর্বশেষ শুভেচ্ছাবাণী। এই নববর্ষের দিনে কবি পাঠ করলেন তাঁর ঐতিহাসিক বাণী 'সভ্যতার সংকট।' জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন দিয়ে য়ুরোপের অন্তরের সম্পদকে সভ্যতার দান বলে বিশ্বাস করেছিলেন, জীবন সায়াহ্নে তা একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। এই প্রবন্ধে অন্নবস্ত্র শিক্ষা আরোগ্য থেকে বঞ্চিত দারিদ্র্যজর্জর ভারতবাসীর কথা যেমন মনে রেখেছেন তেমনি স্মরণ করেছেন অসহায় চীনবাসীদের কথা। লিখেছেন, "চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম, উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল।" ইউরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস কী করে হারিয়ে গেল তারই শোচনীয় ইতিহাস কবি এই প্রবন্ধে বর্ণনা করলেন।

তবু কবি মানুষের উপর বিশ্বাস হারান নি। বলেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

এই বিশ্বাসকেই এই দিন রূপ দিলেন আরেকটি গানে :

"এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে
'জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

আট বছর পরে ১৯৪৯ সালে কবির এই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয়েছে চীন দেশে। শোষণমুক্তির মধ্য দিয়ে সেখানে যথার্থ মানব-অভ্যুদয় ঘটেছে। দুঃখের বিষয়, তাকে অভিনন্দিত করার জন্য তখন আর রবীন্দ্রনাথ জীবিত নেই। ৭ই আগস্ট, ১৯৪১ সেই প্রত্যাশার কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

পরিশিষ্ট ক.

চীনে রবীন্দ্র অনুবাদ

প্রকাশ কাল	রচনার নাম	অনুবাদক	প্রকাশস্থান
১৯১৫	বন্দনা গান (গীতাঞ্জলি)	চেন দু-সিউ	নতুন যৌবন
১৯১৬	জাপানে প্রদত্ত ভাষণ	—	প্রাচ্য পত্রিকা
১৯১৭	ছুটি এবং দুর্দিন	থিয়েন চেঙ এবং উ উঙ	মহিলা পত্রিকা
১৯১৮	কবিতাগুচ্ছ (ক্রিসেন্ট মুন)	লিউ পান-নুঙ	
	সমব্যথী ও অপর পারাপারের তীরে (ক্রিসেন্ট মুন)	ঐ	নতুন যৌবন
	ডাকঘর	সুন ঝেই	জ্ঞানদীপ
১৯১৯	সম্পত্তি সমর্পণ	চেঙ শেন	কথা সাহিত্য
	The Realisation of Beauty (সাধনা)	ঝ্যাঙ চুঙ যু	কিশোর চীন
	The Problem of self (সাধনা)	ঝ্যাঙ ওয়ান	ঐ
১৯২০	পাঁচটি কবিতা (গীতাঞ্জলি)	চেঙ চেন-তো	প্রভাত
	The Astronomer জ্যোতির শাস্ত্র (ক্রিসেন্ট মুন)	চিঙ মিঙ য়ুয়ান	জনতা
	Defamation অপযশ (ক্রিসেন্ট মুন)	ঐ	ঐ
	সতেরোটি কবিতা (গার্ডেনার)	ঝ্যাঙ চুঙ যু	কিশোর চীন
	ছটি কবিতা (ঐ)	ঐ	ঐ
	কয়েকটি কবিতা (ঐ)	ঐ	জ্ঞানদীপ
	The End, বিদায় (ক্রিসেন্ট মুন)	চেঙ শেন	কথাসাহিত্য
	কবিতাগুচ্ছ (গীতাঞ্জলি)	চেঙ চেন তো	মানবতা
	শান্তিনিকেতন (গান)	মো-চি এবং ঝেই চিঙ	চেতনা
	কঙ্কাল	ইয়েন শিঙ	প্রাচ্য পত্রিকা
	ছুটি	শি শেন	কথা সাহিত্য
	ঘাটের কথা	ওয়াঙ চিঙ	নবমানব

প্রকাশ কাল	রচনার নাম	অনুবাদক	প্রকাশস্থান
	জয় পরাজয়	মি ঝেই	চেতনা
	জীবিত ও মৃত	ঐ	ঐ
	ছুটি	ঝান যু	প্রভাত দৈনিক
	জয় পরাজয়	ঝেই চিঙ	নব আনন্দ
	The Realisation of Beauty (সাধনা)	শুঙ সান	প্রভাত দৈনিক
১৯২১	The End, বিদায়, When and Why কেন মধুর		কিশোর চীন
	Clouds and Waves	ওয়াঙ	
	মাতৃবৎসল (ক্রিসেন্ট মুন)	যু ছিঙ	কিশোর চীন
	কবিতা বিচিত্রা (ক্রিসেন্ট মুন)	চেঙ চেন তো	কথাসাহিত্য
	আঠারোটি কবিতা (ঐ)	লি শু-ইন	নবমানব
	Stray Birds	ওয়াঙ চিঙ	ঐ
	কবিতা বিচিত্র	চেঙ চেন-তো	কথাসাহিত্য
	নির্বাচিত কবিতা (গার্ডেনার)	ঝা পাই	চেতনা
	The End, বিদায় (ক্রিসেন্ট মুন)	মো সাঙ্গ	প্রভাত দৈনিক
	দুটি কবিতা (গার্ডেনার)	ঝি লিঙ	ঐ
১৯২২	দুটি কবিতা (গার্ডেনার)	শিয়াও চেঙ	চেতনা
	রবীন্দ্র কবিতা (?)	চেঙ চেন-তো	কথা সাহিত্য
	নির্বাচিত কবিতা (গার্ডেনার)	ও পেই চে	জ্ঞানদীপ
	কবিতা (ফ্রুট গেদারিং)	চেঙ চেন-তো	কথা সাহিত্য
	নির্বাচিত কবিতা (গার্ডেনার)	ইয়ে শাও চুন	জ্ঞানদীপ
	Sleep Stealer ঘুমচোরা (ক্রিসেন্ট মুন)	পাই শিয়াঙ	ঐ
	রবীন্দ্র কবিতা (?)	চেন শি	জনতা
	The Recall আকুল আহ্বান (ক্রিসেন্ট মুন)	ইয়ে পেই-চেন	ঐ
	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	চেঙ য়ান চুন	নবমানব
	খাতা	ওয়াঙ চিঙ	ঐ
	কাবুলিওয়ালা	চেঙ য়ান চুন	ঐ
	ত্যাগ	ঐ	প্রাচ্য পত্রিকা
	ছুটি	চুঙ চি	ঐ
	জয়-পরাজয়	ই য়িয়াও	জ্ঞানদীপ
	জীবিত ও মৃত	যু ছুঙ যু আন	ঐ
	কলকাতার পথে		

প্রকাশ কাল	রচনার নাম	অনুবাদক	প্রকাশস্থান
	(মাস্টার মহাশয়?)	শু চি-শান	কথাসাহিত্য
	শেষের রাত্রি	চেঙ হান-চুন	প্রাচ্য পত্রিকা
	এক রাত্রি	হু ঝাঙ-হু আন	জ্ঞানদীপ
	ছুটি	থাঙ্ হ্যা	ঐ
	চিত্রাঙ্গদা	হু পি-ইন	কথাসাহিত্য
	ডাকঘর	চেঙ হান চুন	জ্ঞানদীপ
	ফাল্গুনি	ছুপি ইন (গ্রন্থ)	সাংহাই কমার্শিয়াল প্রেস পুনর্মুদ্রণ, ১৯২৪, ১৯৩২
	Personality	চিঙ মেই চিউ এবং ঝাঙ মো চি (গ্রন্থ)	সাংহাই, পুনর্মুদ্রণ, ১৯২৪
	The Realisation of Beauty	ছিয়েন চি আ-শিয়াঙ	নবমানব
	The Problem of Self	ওয়াঙ চিঙ	ঐ
	The Realisation of Love	ঐ	ঐ
	The Problem of Evil	ছিয়েন চি আ শিয়াঙ	ঐ
১৯২২	কয়েকটি কবিতা (ফ্রুট গেদারিং)	চেঙ চেন-তো	কথাসাহিত্য
	গীতাঞ্জলি (নির্বাচিত)	চেন নান শি	কবিতা
	কয়েকটি কবিতা (গার্ডেনার	মিন	ঐ
	Defamation, অপবাদ (ক্রিসেন্ট মুন)	শু পেই-চে	পরিবার সমালোচনিক
	কয়েকটি কবিতা (গার্ডেনার)	মিন	ঐ
	দুটি কবিতা (ঐ)	থসে মিঙ	জ্ঞানদীপ
	কয়েকটি কবিতা (ঐ)	ফু শিয়াঙ	ঐ
	আটটি কবিতা	শেন চি ওয়েই	দায়িত্ব
	Stray Birds	চেঙ চেন-তো	সাংহাই, পুনর্মুদ্রণ, ১৯২৫, ১৯৩৩, ১৯৪৭
	দুর্দিন	চে শেন	মহিলা পত্রিকা
	স্বামী	মেই চিউ	শিক্ষাবিষয়ক সংকলন
	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন	চিং	প্রাচ্য পত্রিকা
	The Realisation of Life (গ্রন্থ)	চেঙ মেই	সাংহাই
১৯২৩	শতাব্দীর সূর্য অস্তি	ওয়েী চেঙ চিয়েন	চেতনা
	কবিতা বিচিত্রা	চেঙ চেন-তো	কথাসাহিত্য

প্রকাশ কাল	রচনার নাম	অনুবাদক	প্রকাশস্থান
	কবিতা (লাভার্স গিফট্ ক্রসিং)	ঐ	সাহিত্য সাপ্তাহিক
	কবিতা ঐ	ঐ	কথাসাহিত্য
	কবিতা (ক্রিসেন্ট মুন)	ইয়েন শিঙ (সাথ চুন)	কথাসাহিত্য
	গীতাঞ্জলি (নির্বাচিত)	চেঙ চেন-তো	ঐ
	Baby's Way, চাতুরী (ক্রিসেন্ট মুন)	শি চি	ঐ
	কবিতা (গার্ডেনার)	শু পেই-চে	ঐ
	শতাব্দীর সূর্য অস্তি	চেঙ চেন তো	ঐ
	কবিতা (গার্ডেনার)	ঐ	ঐ
	কবিতা (ফ্রুট গেদারিং)	চাও চিঙ শেন	ঐ
	কবিতা (গার্ডেনার)	চেঙ চেন-তো	সাহিত্য সাপ্তাহিক
	কবিতা ঐ	ঐ	ঐ
	শান্তিনিকেতন (গান)	মেচি এবং মেই চিউ	শিক্ষাবিষয়ক সংকলন
	গীতাঞ্জলি (নির্বাচিত)	চাও চিঙ শেন	সবুজ ঢেউ দশদিবসিক পত্র
	The Crescent Moon (গ্রন্থ)	চেঙ-চেন-তো	সাংহাই পুনর্মুদ্রণ ১৯২৪, ১৯৩০, ১৯৩১
	স্বর্গ পরাজয়, জীবিত ও মৃত	মেই	শিক্ষাবিষয়ক সংকলন
	কাবুলিওয়ালা, একটি আশ্চর্য গল্প	ছিয়েন চিয়েঙ হুন	প্রাচ্য পত্রিকা
	সমস্যা পূরণ	খু চুন-চেঙ	জ্ঞানদীপ
	শেষের রাত্রি	চা-ইন	জ্ঞানদীপ
	কাবুলিওয়ালা	চু চেন-শিন	কথাসাহিত্য
	দৃষ্টিদান	চু পাও-শি	ঐ
	শুভদান	চেঙ হান-চুন	ঐ
	প্রতিবেশিনী	পাই শু-চি	ঐ
	সমর ও অন্দর	চ-ইন	ঐ
	পোস্ট মাস্টার	ছিউ চেন	জনতা
	ছোট গল্প সংগ্রহ (গ্রন্থ) (পোস্ট মাস্টার, ফলশ্রুতি, একরাত্রি, অপুষ্ট, ঘাটের কথা, প্রতিবেশিনী)	ওয়াঙ চিঙ	সাংহাই

অষ্টম-নবম খণ্ড : উপন্যাস, ১৯১০, গোরা।
দশম খণ্ড : নাটক—প্রকৃতির প্রতিশোধ, (সন্ন্যাসী), রাজা ও রানী, চিত্রাঙ্গদা, অচলায়তন, রক্তকরবী।

(এই গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদে আছে সু পেই হং এর আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবি। সু পেই হং ১৯৩৯-৪০ সালে শান্তিনিকেতনে কাজ করেছেন এবং কবির ঘনিষ্ঠ হন। এই দশ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন পেই সি চি, চন চেন-ন প্রমুখ চিনের শ্রেষ্ঠ লেখক এবং অনুবাদকগণ।)

	রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ	হুয়াঙ শি-মিন	
	রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কবিতা	শিয়ে পিন-শিন	গণ-দৈনিক
	স্বাধীনতা?	শি চেন	ম্যাকাও-দৈনিক
	মহুয়া	থাঙ চি-যুঙ	বিশ্বসাহিত্য
	বাংলার দৃশ্য	শিয়ে পিন-শিন	নতুন বছর
১৯৬২	ঐ	ঐ	বিশ্বসাহিত্য
১৯৬৩	বন্দী বীর	ঐ	পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৯
	পূরবী	ঐ	ঐ (১৯৭১
	রাষ্ট্রসংগীত	ঐ	ঐ
	মহুয়া	থাঙ চি যুঙ	নির্বাচিত বিদেশী সাহিত্য ৩য় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৯ সংগ্রহ
১৯৬৫	কাবুলিওয়ালা	শিয়ে পিন-শিন	অনুবাদ সাহিত্য
১৯৭৮	কাবুলিওয়ালা, ছুটি	ঐ	বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প (মধ্যখণ্ড) সংগ্রহ
	ছুটি	ঐ	নির্বাচিত বিদেশী ছোটগল্প (শাস্ত্রী)
	মাস্টারমশাই	লি চেই-ফেঙ	দক্ষিণ-হাওয়া
১৯৮০	রবীন্দ্র গীতি কবিতা সংকলন	শিয়ে পিন-শেন চেঙ চেন তো	বিদেশী গীতি-কবিতা সংকলন
	দুই প্রতিবেশি	থাঙ হুঙ যু আন	শরৎপুষ্প
	ছুটি	পি. পি. চুয়াঙ	আনহুই শিশু সাহিত্য

(সূত্রতালিকা : নির্বাচিত তালিকা — শিশির কুমার দাস ও তান ওয়েন)

সংযোজন

২০০১, ২০০২, ২০০৭ সালে প্রকাশিত অনুবাদগুলির জন্য দং ইউ চেন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চীনদেশ' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (রবীন্দ্রচর্চা, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ২২-২৬১, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

পরিশিষ্ট 'খ'

'Talks in China'-র বিষয়

P.C.M. এর সংস্করণ, ১৯২৫		অন্য সংস্করণ
Introduction (অধ্যাপক লিয়াং চি চাওর বক্তৃতা)		The Kinship between China & Indian Culture (Welcome by Prof. Ling chi Chao)
Autobiographical	I.	First Talk at Shanghai
I, II, III,	II.	To students at Hang Chow
To my Hosts	III.	To Students at Nanking.
I, II, III, IV, V	IV.	To The boys & girls at Pei Hei, Peking.
To Students	V.	At a Buddhist Temple, Peking.
I, II, III	VI.	To Scholars at the temple of the Earth, Peking
	VII.	To Students at Tsing hua College, Peking.
To Teachers	VIII.	At the Scholar's Dinner, Peking
I		Mr. Lin's opening speech. Reply to the Scholars.
Leave Taking	IX.	To the English Teacher's Association, Peking
I, II	X.	First Public Talk in Peking.
Civilisation & Progress	XI.	To the Public at the Theatre in Peking.
Satyam	XII.	Farewell speech at Shanghai
	XIII.	To the Japanese Community in China.
Publisher's Note	XIV.	Religious Experience
(P.C.M.)	XV.	Satyam.
	XVI.	To a surprise gathering of students in the National University, Peking.
	XVII.	At Mrs. Benn's, Shanghai
	XVIII.	The National University, Peking. Reply from Dr. Hu Shih.
	XIX.	Civilisation and Progress.

প্রাসঙ্গিক এবং যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি

Talks in China – Rabindranath Tagore.
রবীন্দ্র জীবনী — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১—৪ খণ্ড)
ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ — নেপাল মজুমদার (১—৬ খণ্ড)
Asian Ideas of East and West – Stephan Hay.
Tagore in China – A Chinese Poet's view. (Indian Literature; Jany-June, 1973–Patricia, Oberai)
Tagore in China – Tan Chung. (Statesman July 20. 1986).
The beauty and value of Tagore's thoughts – Golden Book of Tagore – Dr. Lim Bong Kong. P. 124-125
Viswa Bharati Bulletin, 1924. (সংক্ষেপে V. B. Bulletin)
Viswa Bharati Quarterly, 1924.
প্রবাসী, ১৩৩১ কার্তিক
ভূমিলক্ষ্মী—১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৩১ আশ্বিন
ভারত-চীন পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০-৮১ শকাব্দ
Viswa Bharati News, 1947 June V of XV, No. 12 P. 110-11.
Modern Review. 1924. সংক্ষেপে (M.R.)
Glimpses of World History–J. Nehru P-830.
ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮—চীনে মরণের ব্যবসায়.
The Gate of Heavenly Peace–Jonathan Spence.
বিতর্কিত অতিথি — শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েন,
তুমি আমাদের চেনা? — নিত্যপ্রিয় ঘোষ, বিভাব, বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা, ১৩৯০